ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা

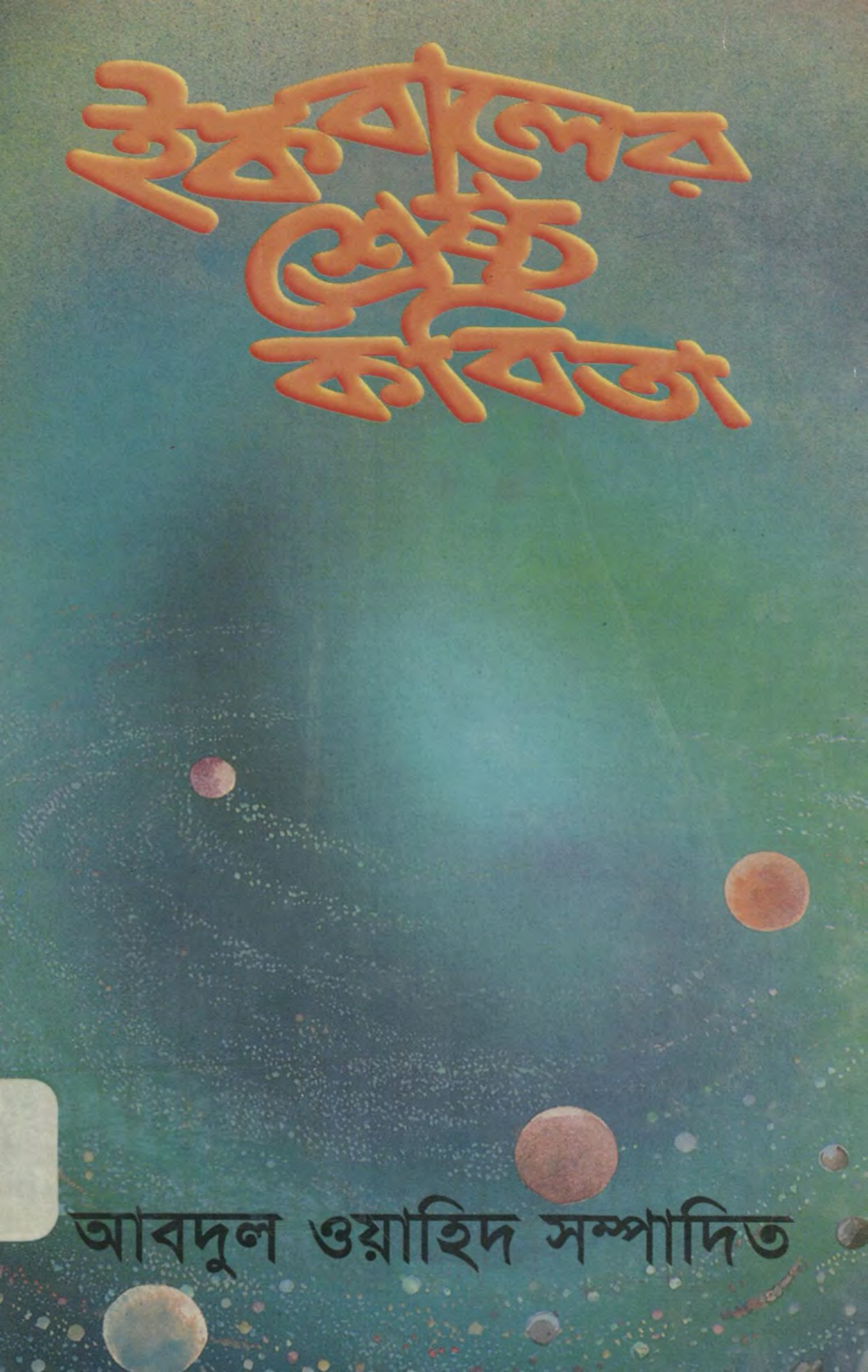

আবদুল ওয়াহিদ সম্পাদিত

بنگالی

ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা

(EXCHANGE)

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
LIBRARY.
Acc. No. 21,215
LAHORE.

ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা

সম্পাদনা কমিটি

এডভোকেট মুজিবুর রহমান [চেয়ারম্যান]

অধ্যাপক শাহেদ আলী

ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

মীর কাসেম আলী

সৈয়দ তোসারফ আলী

আবদুল ওয়াহিদ [সম্পাদক]

ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা

আবদুল ওয়াহিদ সম্পাদিত

আল্লামা ইকবাল সংসদ

ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা
আবদুল ওয়াহিদ সম্পাদিত
প্রকাশক
আল্লামা ইকবাল সংসদ
৩৮০/ বি, মিরপুর রোড
[তৃতীয় তলা]
ধানমন্ডি আ/এ,
ঢাকা
ফোন : ৯৫৫৪২৫৭
প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৯৬
বৈশাখ ১৪০৩
জিলকদ ১৪১৬
আ ই স প্র-২৫
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
জাহিদ হাসান বেনু
লিপিসজ্জা
চৌকস ও ষড়ঋতু কম্পিউটার
মুদ্রণ
বুক প্রমোশন প্রেস
২৮, টয়েনবি সার্কুলার রোড
মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা -১০০০।
মূল্য : ২০০ টাকা

Iqbaler Sresthya Kabita
[Best Selections from Iqbal's Poetry]
Edited by Abdul Wahid
Published by Allama Iqbal Sangsad
380/B, Mirpur Road
[2nd Floor]
Dhanmondi R/A.
Dhaka, Bangladesh
Phone : 9554257
First Edition april 1996
Price : Taka 200 $ 10

উৎসর্গ

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যাঁরা
বুকের তাজা খুন
ঝরিয়েছেন,
ঝরাচ্ছেন
এবং
ঝরাবেন—
তাঁদের পবিত্র
স্মৃতির উদ্দেশ্যে

আমাদের কথা

দার্শনিক-কবি ইকবাল চেয়েছিলেন তাঁর কবিতার ফুলমালিকা সকল দিগন্ত স্পর্শ করুক- তাঁর সৃষ্ট কাব্যের অন্তর্গত বাণী সর্বমানবিকতার হৃদয় দিয়ে এক অবিনাশী গীতিকায় পরিণত হোক। কবির এ স্বপ্ন তাঁর জীবদ্দশায়ই পূরণ হতে আরম্ভ করেছিলো। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কবিতার অনুবাদ তাঁর আকাঙ্ক্ষারই বাস্তবায়ন। এ শতকের গোড়াতেই বাংলাদেশের কবিরাও ইকবালকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। পরাধীনতার জিঞ্জিরে আটক, পিছিয়ে পড়া বাঙালী মুসলমানের নির্জীব হৃদয়ও সেদিন ইকবাল কাব্যের অন্তর্গত সচলতা ও তেজস্ক্রিয়ার বাণীতে কম্পমান হয়ে উঠেছিলো। বাঙালী মুসলমান ইকবাল কাব্যের দর্পণে প্রত্যক্ষ করলো নিজেদের মর্মজ্বালা ও আপন মনের প্রতিচ্ছবি।

মনে রাখা দরকার, ইকবাল কাব্যের অনুবাদে সাহিত্য ও শিল্পগত কারণ ছাড়াও বাঙালী মুসলমান কবিরা এতটা আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন- তার পেছনে একটা রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত প্রেক্ষাপটও বর্তমান ছিল। তখন আযাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং মুসলিম রেনেসাঁর তরঙ্গাভিঘাতে ঘুমন্ত বাঙালী মুসলমান হৃদয়ও জাগরণের বাণীতে মূর্ত হয়ে উঠলো। পরবর্তীকালে রেনেসাঁ আন্দোলনের পটভূমিতে ইকবালের কবিতা ও চিন্তাধারা বাঙালী কবিদের আদর্শের অনুপ্রেরণা ও উৎসে পরিণত হয়।

ইসলামী আদর্শের অমলিন রূপকার এবং স্বদেশ ও স্বজাতির জাগরণের বাণী-বাহক হলেও ইকবাল ছিলেন মূলত মানবতাবাদী কবি। তাঁর কবিতায় আবেদন ও সৃষ্টিশীল বার্তা তাই বিশ্বমানবতার কাছেই। ইকবালের কবিতার এই বিশ্বজনীন আবেদনের জন্য তো বটেই, পাশাপাশি মুসলিম

জাগরণ ও ইসলামী আদর্শের বাণী-বাহক বলেও তাঁর কবিতা ও রচনার আবেদন এদেশের পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী, বিদ্বজ্জন মহলে এবং পাঠক মনেও ব্যাপকতর ও গভীরতম মূর্ছনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এদেশে মহাকবি ইকবালের কবিতা ও চিন্তাধারা জনগণের মাঝে ইতোমধ্যে একটি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে মনে হয়। *'ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা'* ইকবালের প্রেমিকসহ আপামর মানুষের এই বিপুল আগ্রহের সময়োপযোগী প্রত্যুত্তর হিসেবে সাদরে গৃহীত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

'আল্লামা ইকবাল সংসদ' বাংলাভাষাভাষী মানুষের সামনে ইকবালের সমগ্র রচনাবলী তুলে ধরার জন্য ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে। *'ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা'* তারই প্রথম পদক্ষেপ। ইকবালের এই নির্বাচিত কাব্য সংকলন প্রকাশের প্রথম যাত্রায় বিভিন্নজন আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন, উৎসাহিত করেছেন। তাদের প্রতি রইল অকুণ্ঠ মোবারকবাদ। বিশেষ করে স্মরণ করছি, খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও নজরুল গবেষক জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদকে, তিনি অক্লান্ত নিষ্ঠার সাথে এ সংকলনের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। সংকলনে গৃহীত ইকবালের অনূদিত কবিতার উপর একটি মনোজ্ঞ আলোচনা হাজির করে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধে দিয়েছেন। *'ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা'* প্রকাশের মধ্যদিয়ে এদেশের মানুষের সেই মানবতাবাদী মূল্যবোধে নবতর বিকাশ ও উজ্জ্বল চিত্রকল্প রূপময় হয়ে উঠবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আর যে-সব কবির অনুবাদ এখানে স্থান পেয়েছে তাঁরাও হবেন অধিকতর দীপ্যমান।

আল্লামা ইকবাল সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী জেনারেল, সংসদ পত্রিকার সম্পাদক, আমাদের একান্ত স্নেহভাজন মাওলানা মোহাম্মাদ আবদুল ওয়াহিদ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ধৈর্য সহকারে এ সংকলন সম্পাদনায় সফল হয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে জাতি আরো অনেক খেদমত পাবে—এটাই কামনা করি।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
সভাপতি
আল্লামা ইকবাল সংসদ

প্রসঙ্গ কথা

বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে মহাকবি ইকবাল অপরিচিত কোন নাম নয়, তিনি নন কোন অপরিচিত কবি। বিশের দশক থেকেই তাঁর জীবনবাদী কবিতা বাংলায় অনূদিত হয়ে আসছে। এছাড়া দার্শনিক তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ *'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন'* এবং *'প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান'*ও বাংলায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থও বাংলায় অনূদিত হয়েছে। বিশ্ব মানবতাকে ধ্বংসের গভীর আবর্ত থেকে উদ্ধার করার যে আর্তি ইকবালের কবিতায় ফুটে উঠেছে, তার অন্তরঙ্গ সুর বাংলার মানসকে আচ্ছন্ন করেছে। বিশেষ করে, বাংলার মুসলিম মানস তাঁর কবিতার মধ্যে আত্ম-আবিষ্কারের সব আয়োজন প্রত্যক্ষ করেছে। সমগ্র উপমহাদেশের ন্যায় বাংলারও তিনি একজন জনপ্রিয় কবি-দার্শনিক। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় ইকবাল অনূদিত হয়েছেন। ইকবালের জীবন ও কর্মের ওপর রচিত এবং সম্পাদিত হয়েছে অসংখ্য গ্রন্থ। মানবতাবাদী কবি হিসেবে তিনি সমাদৃত হয়েছেন, হচ্ছেন, হবেন–এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকবালের ওপর গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। তাঁর কবিতা, তাঁর গজল, মর্সিয়া এবং গান হতাশাদীর্ণ মানুষের মনে আশা ও আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছে।

ডক্টর আল্লামা স্যার মুহম্মদ ইকবাল ইতিহাসের এক অশান্ত পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিয়ালকোটে প্রাথমিক পর্যায়ের লেখাপড়া শেষ করে বাইশ বছর বয়সে লাহোর চলে আসেন লেখাপড়া করার জন্যে। হতাশাদীর্ণ মিল্লাত, অশান্ত সময়ের করুণ পরিস্থিতি দেখে ইকবালও অনুভূতিপ্রবণ তরুণ হিসেবে হতাশ হয়ে পড়েন। কারণ, তদানীন্তন বিশ্বপরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের শোচনীয় অধঃপতন সম্পর্কে তিনিও ছিলেন সজাগ।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তুর্কী সাম্রাজ্য তখন নামেমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ছিল। পূর্ব ইউরোপ থেকে ইসলাম ধীরে ধীরে নির্বাসিত হচ্ছিল। দক্ষিণ রাশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে একে একে রুশ সম্রাট গ্রাস করছিলো। চীনের মুসলমানরাও নিজেদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলো। বৃটিশ করায়ত্ত করে রেখেছিল মিসরকে। ফ্রান্স ছিলো মরক্কোকে দখল করার ফন্দিতে। ইরানও মুমূর্ষু অবস্থায় দিনযাপন করছিল। ওলন্দাজদের

উৎপীড়নে ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরাও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছিল না। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর থেকে পাক-ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্যেও চরম দুর্দিন নেমে এসেছিল। এমনি পরাজয় ও নিঃসহায় অবস্থার মধ্যে পাক-ভারতীয় মুসলমানদের আশা-ভরসার উৎস ছিলো ওসমানিয়া সাম্রাজ্য। তুর্কীরাই তখন সীমিত পরিসরে কিছুটা নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সেখানেও পাশ্চাত্য হায়েনার লোলুপদৃষ্টি পড়েছিল। মুসলমানদের এই শেষ সম্বল স্বাধীন রাষ্ট্রকেও তারা গ্রাস করার জন্য থাবা বিস্তার করতে থাকে। ওদিকে, বৃটিশ শক্তি তুর্কীর বিরুদ্ধে গ্রীসদের লেলিয়ে দেয়। এতে পাক-ভারতীয় মুসলমান মাত্রেই বৃটিশদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সে সন্ধিক্ষণে যে-সব তরুণ মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন–তাদের পুরোভাগে ছিলেন আধুনিক বিশ্বে ইসলামের সময়োপযোগী ব্যাখ্যাকার, ইসলামী রেনেসাঁস আন্দোলনের অগ্রসেনানী, মানবতার মুক্তিকামী বিদ্রোহী, কলম যুদ্ধের অকুতোভয় সৈনিক মহাকবি ইকবাল। ইকবাল তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতিকে আমৃত্যু কাব্যের চাবুক মেরে জাগ্রত করার প্রয়াস পান। সে সময়ের প্রেক্ষাপটে এমন কোন দিক ছিলো না, যে বিষয়ে তিনি তাঁর মেধাকে ব্যবহার করেননি। কাশ্মীর, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, স্পেন, ইন্দোনেশিয়াসহ প্রতিটি রাষ্ট্রের সমস্যা নিয়েই তিনি গাইড লাইনসম্বলিত দরদমাখা কাব্য রচনা করেন। মুসলিম সমাজ তাঁর কাব্যে ইতিহাস–ঐতিহ্য, হৃৎগৌরবের কথা স্মরণ করে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকেন। তাদের সম্বিৎ ফিরে আসতে থাকে।

আবেদনকুশল ইকবালের কাব্য সার্বিকভাবে সমাদৃত হবার পেছনে কার্যকারণ হিসেবে বলা যায় ঃ শব্দ–সংগীতে, দার্শনিকতায়, চিন্তার মৌলিকতায়, অনুভূতির গভীরতায়, উপমার চমৎকারিত্বে, কাহিনী সৃষ্টির নিপুণতায় এবং ঐতিহ্যের প্রয়োগ কৌশলে তাঁর গোটা কাব্যসম্ভার এক অনবদ্য সৃষ্টি।

ইকবাল নিছক কবি বা দার্শনিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিকও। সবচেয়ে বড় কথা, ইকবাল ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী কবি, ভাবুক ও রাজনীতিক। নর–নারীর ভালবাসা, বসন্তের মলয় সমীরণ, ফুলের সৌন্দর্য, পাখীর গান, প্রেমিক– প্রেমিকার বিরহ–মিলন, জীবনের সুখ–দুঃখ এসবই হচ্ছে কবিতার মামুলী বিষয়বস্তু। সাধারণ কবিরা এসব বিষয় নিয়েই কাব্য-চর্চা করেন, কবিতার পংক্তি গাঁথেন, গানের সুর বাঁধেন।

গতানুগতিকতার এ সোজা পথ ছেড়ে যে কবি-দার্শনিক সম্পূর্ণ এক নতুন পথে গেছেন, তিনিই হলেন মহাকবি আল্লামা ইকবাল। তিনি কাব্যকে করেছেন জাতি গঠনের হাতিয়ার। এ বিশাল ব্যক্তি উর্দূ, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষায় মিল্লাতকে যে সওগাত দিয়ে গেছেন তা সম্পূর্ণ কুরআন, হাদীস, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্যের নির্যাস। ইকবালের রচনা সমগ্রে মিশে আছে ইসলাম।

ইকবাল *আর্ট ফর আর্টস সেক*-এ বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিল্প জীবনের জন্য। আর সে জন্যই তিনি নির্জীব জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে কবিতাকে ব্যবহার করেন। তাঁর পদ্য ও গদ্য যে কোনো রচনার উদ্দেশ্য ছিলো মুসলিম মিল্লাত, মুসলিম জাতির ঐক্য ও সংহতি। তিনি ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে অল ইণ্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সের এক সম্বর্ধনার জবাবে বলেন ঃ

> "আমার কবিতার ব্যাপারে কেউ কেউ ভুল ধারণা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আমাকে প্যান ইসলামিজম আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছেন। আমার লেখায় প্যান ইসলামিস্ট হবার স্বীকারোক্তি আছে বৈ কি!
>
> আমার এ বিশ্বাসও আছে যে, আমাদের জাতি একটি গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায়। মিল্লাতের এবং ইসলামের যে মিশন তা অবশ্যই মানযিলে মাকসুদে পৌঁছতে সক্ষম হবে। তাগুতি শক্তি, শিরক ও বাতিলের চিহ্ন দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে-আর ইসলামী ঝান্ডাই পতপত করে উড়বে একদিন।"

তিনি বিশ্ব মুসলিমকে এক প্লাটফর্মে একত্রিত করার জন্যে আমৃত্যু কলম সৈনিক হিসেবে সংস্কার আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। ইকবালের আশা ছিল, ইসলাম একদিন বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেই। তিনি সৈয়দ সোলায়মান নদভীকে একটা চিঠিতে লেখেন ঃ

> "সে সুপ্রসন্ন সময় অতি নিকটে যখন এ অঞ্চলের মুসলমানগণ শত শত বছরের গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তি লাভ করবে। নিরন্ধ্র অন্ধকারে জ্বলে উঠবে আশার আলো। পৃথিবীর সব শক্তির উপর চ্যালেঞ্জ করে একটি অনন্য আদর্শ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামী আদর্শই বিজয়ী হবে।"

কবিরা যে শুধু যুগস্রষ্টা তা-ই নয়, তাঁরা দ্রষ্টাও। অনাগত যুগের পদধ্বনি শুনতে পান তাঁরা। জাতি যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তখনি কবি আসেন নকীবের বেশে, মুয়াজ্জিনের বেশে-আলোকের আজান দিতে, জাতির ঘুমন্ত আত্মায় আগুন ধরাতে, কণ্ঠে ভাষা দিতে, আর বাহুতে দিতে শক্তি। চোখে দিতে নব নব আশার স্বপ্ন। কবির কাব্যে জাতির স্বাধীনতা-স্বাধিকারের ইঙ্গিত থাকে, ইশারা থাকে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের। নবী-রাসূল যুগে যুগে ধর্মের দিক দিয়ে যে কাজ করে গেছেন, সে কাজই কবি-সাহিত্যিক করতে পারেন ইসলামী তাহজীব-তমদ্দুনের প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে, জাতির স্বপ্নসাধ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়ে। সত্যিকার অর্থে এ ধরনের আদর্শবাদী কবিরাই যুগস্রষ্টা।

বলা বাহুল্য যে, কবিদের কাব্যে ও গানের ঝংকারে যমানার মোড় ফিরে যায়। আল্লামা ইকবাল তেমনি একজন দার্শনিক কবি। তিনি একটা নতুন যুগের স্রষ্টা, একটা নতুন রাষ্ট্রের তিনি রূপকার। পাক-ভারতীয় মুসলমানদের নিদমহলার তিনি মুয়াজ্জিন। তাঁর জ্যোতির্ময়ী বাণী মুসলিম জাহানে এনেছে নতুন জীবন, নতুন জাগরণ। তিনি তাঁর স্বপ্নের রাষ্ট্রের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে এলাহাবাদে মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে ভারতে একটি সুব্যবস্থিত মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনের দাবী জানিয়ে বলেন ঃ

> "অতএব আমি ভারত এবং ইসলাম দুয়েরই শ্রেষ্ঠ স্বার্থে একটি সুব্যবস্থিত মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানাচ্ছি। ভারতের জন্যে এর অর্থ হবে আভ্যন্তরীণ শক্তি সাম্যের ফলে নিরাপত্তা ও শান্তির প্রতিষ্ঠা, ইসলামের জন্যে এতে লভ্য হবে নিজ আইন-কানুন, নিজ শিক্ষা-পদ্ধতি, নিজের সংস্কৃতি সুগঠিত করা এবং সেগুলোকে নিজের মৌলিক ভাবধারা ও বর্তমান কালের চিন্তা-ভাবনার সান্নিধ্যে আনবার সুযোগ।"

ইকবাল সর্বমোট পনেরো হাজার চরণ রচনা করেছেন। এর মধ্যে নয় হাজার চরণ হচ্ছে ফার্সীতে, আর ছয় হাজার চরণ হচ্ছে উর্দূতে। উর্দূ ও ফার্সী এসব কাব্যের সাহায্যে তিনি দর্শনের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন, ধর্মের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন, আদর্শের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য ছিলো কাব্যের সৃষ্টি নয়- দর্শনের, আদর্শের সৃষ্টি। আর এখানেই ইকবাল ও অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যকার প্রভেদ। একজন প্রকৃত কবি সম্পর্কে ইকবালের মতামত দেখুন ঃ

কবির প্রকৃতি নিরন্তর অনুসন্ধিৎসু,
সৃষ্টি করে নিত্য-নতুন আকাঙ্ক্ষা,
করে তার লালন পালন।
কবির মর্যাদা অসীম,
জাতির বক্ষে যেমন দিল,
যে জাতি পায়নি কখনো কাব্যের অপূর্ব প্রেরণা
তা যেন মৃত্তিকার স্তূপ।
কবির হৃদয়জ্বালা
জ্যোতির্ময় করে তোলে একটি জগৎ।
মর্মজ্বালা আর আবেদনহীন কাব্যমালা,
অর্থহীন শোকগাঁথা মাত্র।
কবিতার লক্ষ্য যদি হয় মানুষ গড়ে তোলা,
এই কাব্যই হতে পারে
পয়গম্বরীর উত্তরাধিকার।

ইকবাল খ্যাতিমান কবি, উদারপন্থী সংস্কারক। তাঁর খ্যাতি বিশ্বজোড়া। দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে তাঁর সৃষ্ট কর্মের অন্তর্গত বাণী বিশ্ব মানবের হৃদয়ে জন্ম দিয়েছে আশা- আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন। ইকবালের কাব্যের সার্বজনীন আবেদন মানুষের চিরায়ত স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকেই শুধু জাগ্রত করেনি, দুনিয়ার পিছিয়ে পড়া মানুষের নির্জীব হৃদয়েও প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। ধূলায় পতিত মানুষের হাত ধরে তিনি যেমন তাকে তুলে এনেছেন নীলিমার কাছাকাছি, তেমনি জড় পৃথিবীর হলুদ-বিবর্ণ চোখে এঁকে দিয়েছেন সামুদ্রিক স্বপ্ন। জীবনের জরাগ্রস্ত কোলাহল এবং পংকিলতার মিছিলের ঊর্ধ্বে এক মৃত্যুঞ্জয় পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন মহাকবি ইকবাল। একজন মহৎ মানবতাবাদী কবি হিসেবে যেমন রয়েছে তাঁর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, তেমনি ইসলামের অতি আধুনিক ব্যাখ্যাদাতা হিসেবেও তিনি সমান গৌরবের অধিকারী। হিমালয়ান উপমহাদেশের মুলসমানদের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও তামদ্দুনিক নিরাপত্তাহীনতা, সর্বোপরি জাতির জিল্লত ও অচলায়তনের ক্রান্তিলগ্নেই তাঁর জন্ম। পরাধীনতার শিকলে আটকেপড়া জাতির বুকফাটা ক্রন্দন তাঁকে বিচলিত করেছিল। তিনি কাব্যের অমোঘ চাবুক

নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন হতাশাপীড়িত, ব্যথিত মানুষের জীবনে নতুন অর্থ ও তাৎপর্য আরোপ করতে। বছরের পর বছর ধরে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ জাতি তাঁর উদ্দীপক লেখনীর আঘাতে সম্বিৎ ফিরে পায়। তুরখাম থেকে আরাকান পর্যন্ত তিনি অভিনন্দিত হলেন গণমানুষের কবি হিসেবে। জনতার ভাষায় তিনি কবিতা লিখতেন, জনতার ভাবনা ও বেদনাকে তিনি স্থান দিতেন তাঁর কবিতায়, আর সেই জনতাকে মুক্তির মঞ্জিলে পৌঁছানোর নিরলস ও অব্যর্থ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন আমৃত্যু। কুরআনুল কারীমের বিশাল প্রাঙ্গণ, হাদীস শরীফ এবং ইসলামের ইতিহাস–ঐতিহ্য ছিল ইকবাল কাব্যের সারবান পটভূমি। ইসলামকে তিনি একটি গতিহীন ধর্মের কতকগুলো সূত্রসর্বস্ব ব্যবস্থাপত্র মনে করতেন না। তাঁর কাছে ইসলাম ছিলো এক প্রাণ–প্রাচুর্যপূর্ণ বলিষ্ঠ জীবনের প্রতীক। নিবিষ্ট মনে তিনি বারবার কুরআন অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তাঁর এই প্রত্যয় জন্মেছিল, কুরআনী আদর্শের সুষ্ঠু অনুসরণ ও অনুশীলনই বিপর্যস্ত মুসলিম প্রাণে নয়া জিন্দেগীর হিল্লোল সৃষ্টি করতে পারে।

ইকবালের চিন্তাধারা ও বিষয়বস্তুর নিরিখে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন–

১। কবিত্ব,

২। দর্শন ও

৩। সংস্কার আন্দোলনের গতিচাঞ্চল্য।

অর্থাৎ, ইকবালের অনুভূতি ছিলো কাব্যধর্মী, চিন্তাধারা হলো দার্শনিক, আর মতবাদ হলো সম্পূর্ণ ইসলামী আদর্শভিত্তিক। ইকবাল কাব্যে ইসলামী রূপ ও রস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা মানবীয় উপাদানে পরিপূর্ণ। তাই ইকবাল গোটা বিশ্বের সমঝদারদের কবি, মিল্লাতের চিন্তানায়ক। ইকবাল এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব, কেবল মুসলিম জাহানের জন্যেই নয়, গোটা মানবতার জন্যে তিনি সম্মানিত এক মহান সৃষ্টি।

বিশ্বব্যাপী ইকবাল-চর্চা অব্যাহত রয়েছে। বাংলা, উর্দূ ফার্সী, আরবী, হিন্দী, ইংরেজী, জার্মান, ফ্রেন্সসহ বিভিন্ন ভাষায় ইকবাল অনূদিত হয়েছেন। *'ইকবাল একাডেমী'* ও *'ইকবাল সোসাইটি'* বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইকবাল-চর্চা করে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও ইকবাল-চর্চার সোনালী ঐতিহ্য ছিল। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ইকবাল-চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি *'ইকবাল একাডেমীর'* বিলুপ্তি

ঘটে। ইকবাল–এর স্মৃতি মুছে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। ১৯৮৬ সালে আবার ইকবাল-চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়া হয় নতুনভাবে। প্রতিষ্ঠিত হয় '*আল্লামা ইকবাল সংসদ*'। 'আল্লামা ইকবাল লাইব্রেরী'তে বিভিন্ন ভাষার বই জমা করা হচ্ছে। আত্মপ্রকাশ করছে '*আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা*'। বিচিত্র যুগ–জিজ্ঞাসার আলোকে সংসদ এ পর্যন্ত '*আল্লামা ইকবাল*' শিরোনামে ৫টি সিরিজ সংকলন প্রকাশ করেছে। এ যাবৎ সংসদ প্রায় ছয় হাজার পৃষ্ঠা প্রকাশনা জাতির সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। ইকবালের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন করে আসছে। ১৯৯১ সালে স্পেনের কর্ডোভায় আন্তর্জাতিক ইকবাল মহাসম্মেলনে সংসদ আমন্ত্রিত হয়ে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে দেশের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মান বয়ে আনে। দেশের কবি, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীদের সংসদ একত্রিত করার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এদেশে এক সময় ইকবাল-চর্চা অব্যাহতগতিতে এগিয়ে যায়। সমকালীন কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীরা ইকবাল-চর্চায় নিজেদের ব্যাপৃত রাখেন। ইকবালের কবিতা অনুবাদ হতে থাকে। ইকবাল ছিলেন সাহিত্যাঙ্গনের মধ্যমণি। একাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে ইকবাল-চর্চা থমকে দাঁড়ায়। *আল্লামা ইকবাল সংসদ* প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অচলায়তন ভেঙে যায়। ইকবাল-চর্চার নতুন উদ্যোগে বেশ সাড়া জাগে। ইকবালের কবিতা সমগ্র প্রকাশের দাবি ওঠে ইকবাল প্রেমিকদের কাছ থেকে। যেখানে ইকবালের জীবন-দর্শন সম্পর্কেই অনবহিত, সেখানে কাব্যসমগ্র প্রকাশের যৌক্তিকতা আমাদের বিবেচনায় ছিলো না। আমরা ইকবালের জীবন-দর্শন ও কর্মের ওপর সব চাইতে বেশি গুরুত্বারোপ করতে থাকি। সফলও হই।

পরবর্তীতে দুই বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের অনুবাদের সমন্বয়ে '*ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা*' প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সংগ্রহ করা হয় অনূদিত কবিতাগুলো। বিভিন্ন স্মরণিকা-সংকলন এবং পত্র–পত্রিকা থেকে কালামে ইকবাল সংগ্রহ করতে থাকি। বিরাট পাণ্ডুলিপি তৈরী হয়। বিভিন্ন অসুবিধার দরুন এত দিন সংকলন প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। কবিতার অনেক অনুবাদকই এখন জীবিত নেই। এপার এবং ওপার বাংলার অনেকের কাছ থেকেই আমরা অনুমতি নিতে পারিনি। সে জন্যে সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

বলা দরকার যে, ইকবালের প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ পৃথক পৃথকভাবে বিন্যস্ত করার দরুন একজন অনুবাদকের একাধিক কবিতাও সংকলনভুক্ত করতে হয়। এক্ষত্রেও আমরা অনন্যো-পায়। ইকবালের সমুদয় কবিতাই যে শ্রেষ্ঠ–তা বলাই বাহুল্য। ক্ষুদ্র হোক বা বৃহৎ কোন কাব্যই উদ্দেশ্যবিহীন রচিত হয়নি। আবেদনকুশল কবি খামোখা কোন কবিতা রচনা করেননি। এ জন্য শ্রেষ্ঠ কবিতা সম্পাদনায় বিপাকে পড়তে হয়। আমরা মোটামুটিভাবে কাব্য সমগ্রের ভূমিকা স্বরূপ এ পর্যায়ে পাঠকদেরকে কিছু কবিতা নিবেদন করছি মাত্র।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, অনূদিত কবিতাগুলো আমরা হুবহু রেখেছি। মূল কাব্যের সাথে মিলিয়ে প্রত্যাখ্যান করিনি। মূলত এদেশে কবিতাটি একবার অনূদিত, তা-ই বারবার অনুবাদ করতে দেখা গেছে, যে গ্রন্থটি একবার অনূদিত হয়েছে, সে গ্রন্থটিই আবার কেউ অনুবাদ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই চেষ্টা চলছে নতুন আঙ্গিকে ইকবালের নির্ভেজাল অনুবাদের। বলা আবশ্যক যে, এ সংকলনে নতুন অনুবাদ তেমন একটা স্থান পায়নি। পুরনো অনুবাদই বেশির ভাগ স্থান পেয়েছে। ওদিকে, *'ইকবালের রচনা সমগ্র'* প্রকাশের কাজও অব্যাহতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এ সংকলনকে রচনা সমগ্রের ভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য ইকবাল প্রেমিকদের প্রতি অনুরোধ থাকলো।

বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ অনুগ্রহ করে এই সংকলনের ভূমিকা লিখে দিয়ে সংকলনের মান নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করেছেন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং জাগরণের কবি ফররুখ আহমদের ওপর যে-সব কাজ তিনি করেছেন– সে সুবাদেই তিনি ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকা লেখার জন্য মনোনীত হয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে ঋণী।

অগ্রজ প্রতিম কবি মতিউর রহমান মল্লিক, ইকবাল গবেষক ফাহমিদ-উর-রহমান এবং কবি শাহিদ মুবীনসহ অনেকেই আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমরা সবার নাম উল্লেখ না করেই কৃতজ্ঞতা জানাই। ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংযোজন হবে বলে আমরা আশাবাদী।

আবদুল ওয়াহিদ

সম্পাদক

বাঙ্গে দারা

১।	মুনাজাত—গোলাম মোস্তফা	৫৫
২।	মদনিয়াৎ-ই-ইসলাম-গোলাম মোস্তফা	৫৫
৩।	তারানা-ই-মিল্লি-গোলাম মোস্তফা	৫৬
৪।	বালাদ-ই-ইসলাম-গোলাম মোস্তফা	৫৭—৫৮
৫।	ওয়াথনিয়াৎ—গোলাম মোস্তফা	৫৯—৬০
৬।	শামা ও শায়ের-গোলাম মোস্তফা	৬০—৬৬
৭।	পুত্র জ'ওয়াবদের প্রতি—আবুল হোসেন	৬৬—৬৭
৮।	কোন যুবকের প্রতি-আবুল হোসেন	৬৭
৯।	মোল্লা ও বেহেশত-আবুল হোসেন	৬৮
১০।	খোদার দুনিয়া—আবুল হোসেন	৬৮
১১।	প্যারির মসজিদ—আবুল হোসেন	৬৯
১২।	য়ুরোপ ও সিরিয়া -আবুল হোসেন	৬৯
১৩।	তোমরা ও আমরা—আবুল হোসেন	৬৯—৭০
১৪।	হিমালয়- বেনযীর আহমদ	৭০—৭১
১৫।	বেদনার চিত্র-মনির উদ্‌দীন ইউসুফ	৭১—৭৬
১৬।	বেদনার দর্শন-মনির উদ্‌দীন ইউসুফ	৭৭—৭৮
১৭।	মেরাজ রজনী-মনির উদ্‌দীন ইউসুফ	৭৯
১৮।	খিজিরের প্রত্যুত্তর-মনির উদ্‌দীন ইউসুফ	৮০
১৯।	ছোটদের জাতীয় সঙ্গীত—মনির উদ্‌দীন ইউসুফ	৮০—৮১
২০।	সৌন্দর্যের মর্মকথা—আব্দুস সাত্তার	৮১
২১।	একটি সন্ধ্যা—আব্দুস সাত্তার	৮২
২২।	ইউরোপীয় সংস্কৃতি—মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্	৮৩
২৩।	ইউরোপীয় সভ্যতা—মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্	৮৩—৮৫
২৪।	নতুন চাঁদ—মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্	৮৫—৮৬
২৫।	তুলুয়ে ইসলাম —রূহুল আমীন খান	৮৬—৯১
২৬।	চন্দ্র —মীজানুর রহমান	৯১—৯২
২৭।	শিশির ও তারকা—মীজানুর রহমান	৯২—৯৩
২৮।	নয়া শেওয়ালা-ফজলুর রহমান	৯৩—৯৪
২৯।	নালায়ে এতীম-আবুয যোহা নুর আহমদ	৯৪—১০৩
৩০।	ইকবালের কবিতা—মতিউর রহমান মল্লিক	১০৪—১০৫
৩১।	গজল —সত্য গঙ্গোপাধ্যায়	১০৫—১১০
৩২।	শিশুর প্রার্থনা—সত্য গঙ্গোপাধ্যায়	১১১
৩৩।	আফতাব—সত্য গঙ্গোপাধ্যায়	১১১—১১২
৩৪।	একটি প্রার্থনা—সত্য গঙ্গোপাধ্যায়	১১২—১১৩
৩৫।	কবি—সত্য গঙ্গোপাধ্যায়	১১৩—১১৪
৩৬।	দুধের বাছা—সত্য গঙ্গোপাধ্যায়	১১৪
৩৭।	শুকতারা—সত্য গঙ্গোপাধ্যায়	১১৫
৩৮।	চাঁদ ও তারা—সত্য গঙ্গোপাধ্যায়	১১৫
৩৯।	সাকী—সত্য গঙ্গোপাধ্যায়	১১৬
৪০।	শেক্সপিয়র—সত্য গঙ্গোপাধ্যায়	১১৬—১১৭
৪১।	জীবন—সত্য গঙ্গোপাধ্যায়	১১৭—১১৮

৪২। ইকবালের ব্যঙ্গ কবিতা—সত্য গঙ্গোপাধ্যায় ১১৮—১২০
৪৩। ভারত সঙ্গীত-সত্য গঙ্গোপাধ্যায় ১২১

শেকোয়া

১। শেকোয়া—আশরাফ আলী খান ১২৪—১৩৩

জওয়াবে শেকোয়া

১। জবাব-ই-শিকওয়া—গোলাম মোস্তফা ১৩৬—১৪৫

বালে জিবরিল

১। প্রার্থনা—আব্দুল কাদির ১৪৮—১৪৯
২। খোদার ফরমান—ফররুখ আহমদ ১৪৯
৩। আদমের প্রতি পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন—ফররুখ আহমদ ১৫০—১৫১
৪। জিবরাইল ও শয়তান—ফররুখ আহমদ ১৫১—১৫২
৫। শাহীন—ফররুখ আহমদ ১৫৩—১৫৪
৬। কণিকা—ফররুখ আহমদ ১৫৫—১৫৮
৭। ফেরেশতাদের গীত—তালিম হোসেন ১৫৯
৮। পাঞ্জাবের কৃষকের প্রতি—আবুল হোসেন ১৬০
৯। কর্ডোভার মসজিদ—মনির উদ্দীন ইউসুফ ১৬১—১৬৫
১০। গজল—মনির উদ্দীন ইউসুফ ১৬৫—১৬৬
১১। জীবন—মনির উদ্দীন ইউসুফ ১৬৭—১৬৯
১২। আজান—মনির উদ্দীন ইউসুফ ১৭০
১৩। সুলতান টিপুর শেষ উপদেশ—মনির উদ্দীন ইউসুফ ১৭০
১৪। বাল্-ই-জিব্রীল—বেগম সুফিয়া কামাল ১৭১
১৫। বালে জিবরিল—মোহাম্মদ সুলতান ১৭২
১৬। জিবরীল ও ইবলীস—সৈয়দ আবদুল মান্নান ১৭৩
১৭। কালাম-ই-ইকবাল—মুফাখখারুল ইসলাম ১৭৫—১৭৬
১৮। খোদার সমীপে লেনিন—সত্য গঙ্গোপাধ্যায় ১৭৭—১৭৮
১৯। মোল্লা ও স্বর্গ—সত্য গঙ্গোপাধ্যায় ১৭৮
২০। মুসোলিনী—সত্য গঙ্গোপাধ্যায় ১৭৯
২১। নেপোলিয়নের সমাধিতে—সত্য গঙ্গোপাধ্যায় ১৭৯
২২। আজান— আ. ফ. ম. আব্দুল হক ফরিদী ১৮০
২৩। যমীন ও আসমান— আ. ফ. ম. আব্দুল হক ফরিদী ১৮০
২৪। নবীন বিশ্ব-আ. ফ. ম. আব্দুল হক ফরিদী ১৮০
২৫। প্রেম ও কামনা—আবুল কালাম মুস্তফা ১৮১—৮২
২৬। গজল—আল মুজাহিদী ১৮৩
২৭। খোশহাল খানের ওসিয়ত—হাস্‌নাইন ইমতিয়াজ ১৮৪

যরবে কলীম

১। মরদে মুসলমান—গোলাম মোস্তফা ১৮৭
২। কয়লা ও হীরক—গোলাম মোস্তফা ১৮৭—১৮৮
৩। বু'আলী কলন্দর—ফররুখ আহমদ ১৮৯—১৯০
৪। জামানা—ফররুখ আহমদ ১৯১
৫। নমাজ—মনির উদ্দীন ইউসুফ ১৯২
৬। হে মুহম্মদ (সঃ)—এর আত্মা—মনির উদ্দীন ১৯২
৭। সমর্পণ ও নিয়তি-সৈয়দ আব্দুল মান্নান ১৯৩

৮।	নিষিদ্ধ সংগীত— সৈয়দ আব্দুল মান্নান	১৯৩
৯।	ইনকিলাব—সত্য গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৪
১০।	গণতন্ত্র—সত্য গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৪
১১।	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—সত্য গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৪
১২।	পশ্চিমী রাষ্ট্র—সত্য গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৪
১৩।	কয়েকটি কবিতা—নূরুদ্দীন আহমদ	১৯৫—১৯৮
১৪।	আশার ঝিলিক—নেয়ামাল বাসির	১৯৯
১৫।	তিনটি কবিতা—নেয়ামাল বাসির	১৯৯—২০০
১৬।	যরবে কলীম—ফারুক মাহমুদ	২০১
১৫।	লা—ইলাহা ইল্লাল্লাহ—আবদুল মান্নান তালিব	২০২
১৭।	ইজতিহাদ—আবদুল মান্নান তালিব	২০২
১৮।	জিহাদ—আবদুল মান্নান তালিব	২০৩
১৯।	অহী—আবদুল মান্নান তালিব	২০৪
২০।	কবর—আবদুল মান্নান তালিব	২০৪
২১।	তওহীদ তত্ত্ব—আবদুল মান্নান তালিব	২০৫
২২।	ইলহাম ও আজাদী—আবদুল মান্নান তালিব	২০৫
২৩।	মক্কা ও জেনেভা—আবদুল মান্নান তালিব	২০৬
২৪।	মৃত্যু—আবদুল মান্নান তালিব	২০৬
২৫।	রাষ্ট্র—আবদুল মান্নান তালিব	২০৭
২৬।	ছাত্র—আবদুল মান্নান তালিব	২০৭
২৭।	পরীক্ষা—আবদুল মান্নান তালিব	২০৭
২৮।	শিক্ষক—আবদুল মান্নান তালিব	২০৮
২৯।	দীন ও শিক্ষা—আবদুল মান্নান তালিব	২০৮—২০৯
৩০।	ফিরিংগী পুরুষ—আবদুল মান্নান তালিব	২০৯
৩১।	একটি প্রশ্ন—আবদুল মান্নান তালিব	২০৯
৩২।	পরদা—আবদুল মান্নান তালিব	২০৯—২১১
৩৩।	নারীর সংরক্ষণ—আবদুল মান্নান তালিব	২১১
৩৪।	নারী ও শিক্ষা—আবদুল মান্নান তালিব	২১১
৩৫।	নারী সত্তা—আবদুল মান্নান তালিব	২১২
৩৬।	ধর্ম ও শিল্প—আবদুল মান্নান তালিব	২১২—১১৩
৩৭।	সাহিত্য—আবদুল মান্নান তালিব	২১৩
৩৮।	থিয়েটার—আবদুল মান্নান তালিব	২১৩
৩৯।	শিল্পীদের প্রতি—আবদুল মান্নান তালিব	২১৪
৪০।	সংগীত—আবদুল মান্নান তালিব	২১৪
৪১।	শিল্পের সৃষ্টি—আবদুল মান্নান তালিব	২১৫
৪২।	চারুকলা—আবদুল মান্নান তালিব	২১৫—২১৬
৪৩।	হালাল সংগতী—আবদুল মান্নান তালিব	২১৬
৪৪।	হারাম সংগীত—আবদুল মান্নান তালিব	২১৭
৪৫।	কবি—আবদুল মান্নান তালিব	২১৭
৪৬।	অনারব কবিতা—আবদুল মান্নান তালিব	২১৭—২১৮
৪৭।	সংগীত—আবদুল মান্নান তালিব	২১৮
৪৮।	বিপ্লব—আবদুল মান্নান তালিব	২১৮
৪৯।	গণতন্ত্র—আবদুল মান্নান তালিব	২১৮

আসরারে খূদী

১। পূর্বাণী—ফররুখ আহমদ ২২১—২২৩
২। আস্‌রারে খূদী—সৈয়দ আলী আহসান ২২৪—২৪৫
৩। আস্‌রারে খোদী—সৈয়দ আবদুল মান্নান ২৪৬—২৫৩
৪। নবী প্রেম—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ২৫৩
৫। কালামে ইকবাল—মোফাখখারুল ইসলাম ২৫৪
৬। তিনটি কবিতা—আ. ফ. ম. আব্দুল হক ফরিদী ২৫৫—২৫৬
৭। সাকী— ওহীদুল আলম ২৫৭
৮। আসরার–ই–খুদী—আঃ কাঃ শঃ নূর মোহাম্মদ ২৫৮

রমূযে বেখূদী

১। খুদী ও মিল্লাত—গোলাম মোস্তফা ২৬১—২৬২
২। রমূযে বেখূদী থেকে—আ.ফ.ম. আব্দুল হক ফরিদী ২৬৩—২৬৬
৩। পর্দানশীল মুসলিম নারীদের প্রতি ভাষণ—ঐ ২৬৭
৪। রমুযে বেখুদী—আ. ন. ম. বজলুর রশীদ ২৬৮—২৭০

পায়ামে মাশরিক

১। জু–ই–আব—গোলাম মোস্তফা ২৭৩
২। উট চলার গান—গোলাম মোস্তফা ২৭৪—২৭৫
৩। রুমীর প্রতি—ফররুখ আহমদ ২৭৬—২৭৯
৪। গজল—সৈয়দ আলী আশরাফ ২৭৯
৫। পায়ামে মাশরিক থেকে—অধ্যাপক সিরাজুল হক ২৮০—২৮২
৬। আল্লাহর রাজত্ব—মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী ২৮৩
৭। প্রেম—মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী ২৮৩

যবূরে আযম

১। ঈশ্বর—অমিয় চক্রবর্তী ২৮৬
২। মানব—অমিয় চক্রবর্তী ২৮৬
৩। শেখ মজাদিদ—এর সমাধিতে ঐ ২৮৬
৪। যবুর–ই–আযম—আবদুর রশীদ খান ২৮৭—২৯১
৫। যবুরে আযম—আব্দুর রশীদ খান ২৯১—২৯২

জাভিদ নামা

১। সত্তার পরীক্ষা—তালিম হোসেন ২৯৫—২৯৬
২। নয়টি সুধী বচন—তালিম হোসেন ২৯৬—২৯৭
৩। ইকবালের প্রার্থনা—মহীউদ্দীন ২৯৮—৩০৭
৪। নর্তকীর আত্মগ্লানি—মহীউদ্দীন ৩০৭—৩০৮
৫।. জরোষ্টারের প্রতি আরিম্যানের লোভ প্রদর্শন—মহীউদ্দীন ৩০৯—৩১০
৬। শাশ্বতের গান—শঙ্খ ঘোষ ৩১১—৩২৮
৭। কবি ইকবালের শেষ কবিতা—শ্রী মনিন্দ্র দত্ত ৩২৮
৮। জাবিদনামা—আমিনুল ইসলাম ৩২৯

আরমুগানে হেজায

১। ইব্‌লীসের পরামর্শ সভা—মনির উদ্‌দীন ইউসুফ ৩৩২—৩৩৬
২। সহগামীদের খেদমতে—গোলাম সামদানী কোরায়শী ৩৩৭—৩৫০
৩। রুবাই—সত্য গঙ্গোপাধ্যায় ৩৫০
৪। আদি তুমি–অন্ত তুমি—আহসান হাবীব ৩৫১—৩৫২

ভূমিকা

প্রায় পৌনে দু'শো ইকবালের কবিতার অনুবাদ নিয়ে ৪৪ জন বাঙালী মুসলিম ও হিন্দু কবির অনূদিত *'আল্লামা ইকবাল সংসদ'* প্রকাশিত *'ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা'*র সংকলনটি আমার কাছে একটি অভূতপূর্ব কাজ বলে মনে হয়েছে। আল্লামা ইকবাল সংসদ, আমার ব্যক্তিগত ধারণা, একটি জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছে। কারণ, শতকরা ৯০ জন মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে যেমন ইসলামকে জানার প্রয়োজন আছে, তেমনি ইসলামকে জানার জন্য ইকবালকেও জানার প্রয়োজন আছে। আমার বলতে দ্বিধা নেই, গোটা বিশ্বে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের মধ্যে ইসলামকে নিয়ে ইকবাল যত চিন্তা-ভাবনা করেছেন তা আর কেউ করেছেন বলে আমি জানি না। মানব-জীবনের সমস্যা সমাধানে ইসলামের ভূমিকা যে শ্রেষ্ঠ, ইকবাল সারা জীবনের সাধনা, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা কবিতা, প্রবন্ধ ও বক্তৃতা–অভিভাষণের মাধ্যমে সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চেতনা ও অনুভূতি জুড়ে ইসলাম কত গভীরভাবে যে সম্পৃক্ত ছিল– সেটা তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহ পাঠ করলেই বোঝা সম্ভব। তাঁর এই উপলব্ধি তিনি অনন্যসাধারণ কাব্য–ভাষা দিয়ে চিত্তাকর্ষক করার চেষ্টা করেছেন। সে জন্যেই ইকবালের কবিতা শুধু দার্শনিক চিন্তার উপস্থাপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা উঁচুমানের কাব্যে উত্তীর্ণ হয়েছে।

অমিয় চক্রবর্তী ইকবালের উপর লেখা দু'টি প্রবন্ধে ইকবালের কাব্য-সৌন্দর্য সম্বন্ধে বলেছেন :

১. মিলের চুমকি বসানো, অনুপ্রাস বহুল চকমকি ছন্দের জোড়া-জোড়া পদ রচনার মাঝখানে গীতিকাব্য-রসের পরিপূর্ণ আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর তেমনি মধুর। *(যুগ সংকটের কবি ইকবাল)*

২. কবি ইকবালের কাব্যকানন বিচরণ করলে সৌরভীকুঞ্জ দেখতে পাব। খর-রৌদ্র ধূলিতে শ্যামলচ্ছায়া মেলে আছে; অনন্য মনোহর বীথি আহবান করে নিয়ে যায় গভীর ভাবনার নির্দেশে। বাক্যের ভঙ্গি রসের উচ্ছল মাধুর্য এবং দিগন্ত দৃষ্টিময় ব্যঞ্জনা তাঁর বহু কবিতায় উপকর্ষের যে ভাষা পেয়েছে তা উর্দু বা পারসিক ধ্বনিকে অতিক্রম করে সর্বমানবের চিত্তহারী।

(ইকবাল কাব্যের নতুন প্রসঙ্গ)

কিন্তু ইকবালের কবিতার বাংলা অনুবাদে সেই রস-মাধুর্য বা রূপ-মাধুর্য আমরা কি পাব ? অনুবাদ কি কখনো মূল কবিতার রূপ-সৌন্দর্য এবং অন্তর-রূপ সৌন্দর্যকে যথাযথভাবে উপহার দিতে পারে ? বর্তমান কাব্য সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ইকবালের কবিতার অনুবাদসমূহ কি তা পেরেছে ?

আধেয় নয়, আধার দিয়েই কবিতার সৌন্দর্য নিরূপিত হয়। কাব্যের বিষয় যা হোক যদি তা ছন্দ, শব্দ, উপমায় সুষমাময় করে না তোলা যায়– সে কাব্য চিত্তগ্রাহী, মনোগ্রাহী বা অনুভূতিগ্রাহী হয় না। গভীর দার্শনিকতা থাকলেও তা হয় নিরস গদ্যের উপস্থাপন। সেটা হয় বালুকণামিশ্রিত সন্দেশের মত– এই সবচেয়ে উপভোগ্য মিষ্টির মধ্যে যদি কাঁকরকণা থাকে মানুষ তা মুখে নিয়ে ফেলে দেবে তা আর দ্বিতীয়বার মুখে দেবে না। কচি ষাঁড়ের গোশত পরম উপাদেয় হলেও অপক্ক বাবুর্চি বা রাঁধুনী তা রান্না করে, যদি তা পরিমিত তেল, নুন, মসল্লা দিয়ে রান্না না করা হয়, তাহলে তা রুচিকর হবে না। অত্যন্ত লোভনীয় খাদ্য হয়েও তা বর্জিত খাদ্য হিসাবে গণ্য হবে। মূল কবিতার বহু অনুবাদ তাই আকর্ষণীয় না হয়ে বিকর্ষণীয় হয় এবং এইভাবে অসামান্য বিদেশী কবি বা বিভাষার কবি হয়ে যান সামান্য কবি। আমি বাংলা ভাষায় কোন কোন অনুবাদকের অপগুণসমৃদ্ধ গ্যেটের অনুবাদ পড়তে গিয়ে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে অযোগ্য অনুবাদের দ্বারা অনূদিত ওমর ও হাফিজের কবিতার অনুবাদ পড়তে গিয়ে। কিন্তু কারও কারও অনুবাদ পড়তে গিয়ে আমি পরম আনন্দ অনুভব করেছি, যেমন– নজরুল ইসলাম, কান্তিচন্দ্র ঘোষ ও নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ পড়ে; নজরুলের হুইটম্যান ও হাফিজের অনুবাদ পড়ে, বুদ্ধদেব বসুর *'ল্য ফ্ল্যার দ্যু মাল'*-এর অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথের এলিয়টের অনুবাদ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের হাইনের অনুবাদ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ইয়েটস ও নোগুচির অনুবাদ, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের ব্রাউনিং-এর অনুবাদ পড়ে।

অনুবাদ যখন মৌলিক কবিতার মত স্বতস্ফূর্ত হয়ে ওঠে তখনই অনুবাদ সার্থক হয়। যে জন্যে ফিটজিরাল্ডের ওমর অনুবাদ ইউরোপকে চমকিত এবং উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল। আমি জানি, বোদলেয়ারের "ল্য ফ্ল্যার দ্যু মাল" (ক্লেদজ কুসুম) শুধু অনুবাদের মাহাত্ম্যে বহু বাঙালী কবিকে বোদলেয়ারধর্মী করে তুলেছিল, বাংলাদেশের বহু আধুনিক কবির প্রাথমিক যুগের কাব্যে তার অনুসরণ ও

অনুকরণ মেধাবী পাঠকের দৃষ্টি এড়ায়নি। ইকবাল কি সেইভাবে কোন বাঙালী কবির অনুবাদে তেমন প্রভাব বিস্তারকারী সৌন্দর্যের অভিঘাত নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে?

সেটা সব সময় হয়েছে তা বলব না। তবে আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, আমি যখন দৌলতপুর কলেজের ইন্টারমিডিয়েট সায়ান্সের ছাত্র তখন আমাদের বাংলা টেক্সট বুকে আশরাফ আলী খানের *'শেকোয়া'র* অনুবাদ পড়েছিলাম এবং তার খানিকটা অংশ এখনও আমার মুখস্থ আছে। ইকবাল বলেছেন–

মূর্খ নাদান হ'ল প্রধান রত্ন মানিক ঢের তাদের
এদিক মোরা সর্বহারা, কাদায় পড়ে রইল শের ;
কাফের তরে গড়লে তুমি এই জগতের স্বর্গপুর,
শোনাও মোদের ভূয়ো কথা মরণ পরে আসবে হুর।

এই অনুবাদ আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। আমি যদি তখন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-কৃত একই কবিতাংশের এই অনুবাদ পড়তাম ঃ

নিন্দা ত নয়; ধনরত্নে পরিপূর্ণ তারি ভান্ডার ;
সভার মাঝে বলতে পারে বাক্য দু'টি শক্তি নাই যার।
বিধর্মী পায় হুর ও দৌলত সংসার মাঝে, সহ্যের এবার ;
আর বেচারা মুসলিম তরে শুধুই হুরের এক অঙ্গীকার।

এখানে ইকবালের মূল কবিতা উদ্ধৃত করা যেতে পারে এবং দেখানো যায় যে, আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদে কত পার্থক্য। ইকবাল লিখছেন–

"ইয়েহ্ শিকায়ত্ নহী হাঁয় উন্‌কে খযানে ম'মুর,
নহী মহ্‌ফিল মে জিনহেঁ বাত ভী করনে কা শ'উর।
কহর ও ইয়ে হায় কে কাফির কো মিলে হুর ও কসুর,
আওর মুসলমাঁ কো ফকত ওআদাএ হুর।।

শহীদুল্লাহ্‌র অনুবাদ কাব্যচাতুর্যহীন আক্ষরিক পদ্যানুবাদ। সে জন্যে তাতে রসমাধুর্যের বিকাশ ঘটেনি। কিন্তু আশরাফ আলী খানের অনুবাদ আত্মস্থ ভাবের কাব্যানুবাদ, যাতে কবিত্ব শক্তির পরিচয় আছে বলেই তা মূল কবির কাব্যশক্তির পরিচয়কে চিহ্নিত করেছে।

উল্লেখযোগ্য, বর্তমান সংকলনে আশরাফ আলী খানের সেই চমৎকার অনুবাদটিও স্থান পেয়েছে। কিন্তু *'শেকোয়া'র* আর একটি অনুবাদ যেটি

মোহাম্মদ সুলতান করেছিলেন এ সংকলনে সেটি স্থান পায়নি। হয়ত সংকলন সম্পাদক এই কবিতার বা কাব্যের একটি সংকলনে দু'কবির একই অনুবাদ দেয়া সঠিক নয় বলেই এটা করেননি। অবশ্য *বাল-ই-জিবরীল* থেকে মোহাম্মদ সুলতান যে আংশিক অনুবাদ করেছিলেন– এখানে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত হয়েছে এবং এ অনুবাদ পড়ে ভাবতেই হবে যে, সুলতান-এর *'শেকোয়া'র* অনুবাদ পড়ে নজরুল বলেছিলেন :

"অনুবাদের দিক দিয়ে এমন সার্থক অনুবাদ আর দেখেছি বলে মনে হয় না।...কবি সুলতানের অনুবাদ পড়ে বিস্মিত হলাম, অরিজিন্যাল ভাবকে এতটুকু অতিক্রম না করে এর অপরিমাণ সাবলীল সহজ গতি-ভঙ্গি .দেখে। পশ্চিমের বোরকা পরা মেয়েকে শাড়ীর অবগুণ্ঠনে যেন আরও বেশী মানিয়েছে।"

সে কথা অগ্রজের স্নেহ-স্পর্শে মধুর হলেও তা খুব বেশী অত্যুক্তি নয়। বাল-ই-জিবরীল-এর অংশবিশেষের সুলতানকৃত এই অনুবাদে–

তুমি সুগভীর অসীম সিন্ধু
আমি যে বিন্দু তটিনী ধারা,
তোমার অত-লে কর মোরে লীন
নহে কর কূল-বাঁধন হারা।
মুকুতা অলস হই যদি আমি
দুলাও তোমার কণ্ঠহারে,
শূন্য শুক্তি হই যদি তবে
মণিময় তুমি করগো তারে।

যে ভাব ও ছন্দ-মধুর সে-কথা বলা বাহুল্য।

এই অনুবাদ ইকবালকে শুধু দার্শনিক নয় যথার্থ কবি হিসাবে আমাদের উপলব্ধির স্বীকৃতি আদায় করে নেন।

উল্লেখ্য, এ দেশের কয়েকজন বিখ্যাত কবিও ইকবাল অনুবাদে এগিয়ে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে আছেন– গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, বেনজীর আহমদ, মহীউদ্দীন, আহসান হাবীব, সৈয়দ আলী আহসান, আবুল হোসেন, আব্দুর রশীদ খান, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, মোফাখখারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আশরাফ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ এবং আবদুস সাত্তার প্রমুখ।

বলা বাহুল্য, কবি হিসাবে বিখ্যাত না হলেও তিনজন অনুবাদক কবি যে ইকবালের কবিতার সার্থক অনুবাদ (আমার ব্যক্তিগত অভিমত) করেছিলেন

তাতে সন্দেহ নেই। এঁরা হলেন মনিরউদ্‌দীন ইউসুফ, সৈয়দ আবদুল মান্নান এবং রূহুল আমীন খান। নিঃসন্দেহে ফররুখ আহমদ ইকবাল অনুবাদে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন এবং তাঁর কৃত কিছু অনুবাদ যে অন্য আর কারও পক্ষে করা সম্ভব ছিল না– সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে, গোলাম মোস্তফার *'শেকওয়া'* ও *'জবাব-ই-শেকওয়া'র* অনুবাদ হৃদয়গ্রাহ্য হয়েছে বলে আমার ধারণা। কারণ, এই ছন্দশিক্ষিত কবির অনুবাদে ধ্বনির অনুরণন কর্ণপীড়াদায়ক অনুবাদে পরিণত হয়নি। *'জাবিদ নামা'* থেকে *'খিতাব-ব-জাবিদ'* (জাবিদের প্রতি উপদেশ) নামক গোলাম মোস্তফার গদ্য অনুবাদটিও একটি চমৎকার অনুবাদ বলে আমার ধারণা। দুঃখের বিষয়, বর্তমান সংকলনে এই অনুবাদটি গৃহীত হয়নি। আমি মনিরউদ্‌দীন ইউসুফের ইকবাল অনুবাদকেও নিরস আক্ষরিক অনুবাদ বলব না। *'বাঙ্গ-ই-দারা'র* কিছু কবিতা মনিরউদ্‌দীন ইউসুফ এমন আন্তরিকতা দিয়ে অনুবাদ করেছেন যা যে কোন মৌলিক কবির কবিতার মত আমার কাছে আনন্দদায়ক বলে মনে হয়েছে। বিশেষ করে, মনিরউদ্‌দীন ইউসুফের মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত অনুবাদসমূহ ধ্বনি-মাধুর্যে নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় ও তৃপ্তিদায়ক হয়ে উঠেছে। আনন্দের কথা যে, তাঁর এইসব অনুবাদের অনেকগুলো এই সংকলনকে সমৃদ্ধ করেছে। এখানে *'আসরার-ই-খূদীর'* অনুবাদক সৈয়দ আবদুল মান্নানেরও উল্লেখ করতে হয়।

'আসরার-ই-খূদী'র আংশিক অনুবাদ ফররুখ আহমদ ও সৈয়দ আলী আহসানও করেছিলেন। কিন্তু, সৈয়দ আবদুল মান্নান গোটা *'আসরার-ই-খূদী'* অনুবাদ করেছেন গদ্য ভাষায়। ফররুখ আহমদ ও সৈয়দ আলী আহসানের মত মৌলিক কবি না হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইকবালকে এমনভাবে আত্মস্থ করেছিলেন এবং সম্ভবত ফারসী ভাষায় তাঁর এমন দখল ছিল যে, তাঁর গদ্য কবিতার ভঙ্গিতে এই অনুবাদ ইকবালের চিন্তার মাহাত্ম্য তো বটেই, তাঁর কবিত্ব শক্তিকেও আমাদের বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

ফলত, বর্তমান সংকলন যে অত্যন্ত সময় ও যুগোপযোগী– তাতে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে এক দল ক্ষুদ্রমনা, বিভ্রান্ত রাজনৈতিক মতাদর্শে পরিচালিত লোকের কারণে এবং ইকবালকে হীন উদ্দেশ্যে নির্বাসিত করার ষড়যন্ত্রের জবাবে ইকবালকে পুনঃ প্রতিষ্ঠাকরণে এই সংকলন যে গভীর অবদান রাখবে, তাতে সন্দেহ নেই। সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার আগে আমার ধারণা, ইকবালের জীবন ও তাঁর কর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

জীবন, কর্ম ও রাজনৈতিক জীবন

ইকবালের প্রকৃত নাম শেখ মুহম্মদ ইকবাল। তিনি ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ২১ শে ফেব্রুয়ারী পাঞ্জাবের সিয়ালকোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম শেখ নূর মোহাম্মদ এবং আম্মার নাম ইমাম বি'বি। তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর শেখ আতা মুহাম্মদ। তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষক ছিলেন মীর হাসান। আর তিনি

প্রথম জীবনে কবিতা লিখে তা সংশোধনের জন্য পাঠাতেন তদানীন্তন বিখ্যাত উর্দূ কবি দাগের নিকট। ইকবাল ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে প্রত্যেক বছর পরীক্ষায় প্রথম হতেন।

শিক্ষা

১৮৮৭-সিয়ালকোটস্থ স্কচ মিশন স্কুল থেকে প্রাথমিক পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। ১৮৯১-এ উক্ত স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন। স্কচ মিশন স্কুল কলেজে পরিণত হয়। ইকবাল সেখানেই পড়াশোনা করেন। ১৮৯৫-এ তিনি এফ. এ. পাস করেন। ১৮৯৭-এ লাহোর কলেজ থেকে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় পাস করেন।

১৮৯৮-এ লাহোর *'লঞ্জ কলেজ'*-এ আইন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু আইনের মূলনীতি বিষয়ে অকৃতকার্য হন। দু'বছর পর পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন।

১৮৯৯-এ দর্শন শাস্ত্রে ইকবাল এম. এ. পাস করেন। এই সময়ে তিনি তাঁর শিক্ষক স্যার টি ডব্লিউ আর্নল্ডের সাহচর্য্যও লাভ করেন।

১৯০৫-এ উচ্চতম শিক্ষা লাভের জন্য তিনি ইউরোপ যান। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯০৫-এর নভেম্বরে লিংকন ইন ইউনিভার্সিটি লন্ডনে *'বার এট ল'* শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯০৮-এ দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৭-এ তিনি জার্মানীর মিউনিক শহরে এসে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে The Development of Metaphysics in Persia -A Contribution to the History of Muslim Philosophy -এর উপর থিসিস রচনা করে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। বলা বাহুল্য, ইতোপূর্বে প্রফেসর ম্যাকগ্রেডের অধীনে এই থিসিসের উপর গবেষণা করে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। পুনরায় লন্ডনে আসেন এবং ১৯০৮-এ ইংল্যান্ডের Lincolns Inn থেকে ব্যারিস্টারী পাস করেন।

কর্মজীবন

১৮৯৯-এ এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইকবাল লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অল্পদিন পরে ১৯০১-এ তিনি সরকারী কলেজে ইংরেজী ও দর্শন শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ১৮৯৯-এ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়াধীন ওরিয়েন্টাল কলেজের, ম্যাকলোড পাঞ্জাব, এরাবিক রীডারও নিযুক্ত হন। ১৯০৩-এ লাহোর সরকারী কলেজে স্থায়ী এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৩-এ বিশ্ববিদ্যালয় ওরিয়েন্টাল কলেজ লাহোরে গবেষণা, সম্পাদনা, অধ্যাপনা ও আরবী গ্রন্থ প্রকাশনা তত্ত্বাবধান কার্যে নিয়োজিত হন এবং *আঞ্জুমানে মুসলমানে কাশ্মীরী* লাহোর-এর সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।

১৯০৯-এ তিনি সরকারী কলেজ লাহোরে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং এক বছর (১৯১০-এ পর্যন্ত) সেখানে অধ্যাপনায় কর্মরত থাকেন। ১৯০৮-এ *অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের* বৃটিশ কমিটির কর্মপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ৬ মাস লন্ডনে আরবীর অধ্যাপনা করেন। লাহোরের চীফ কোর্টে আইন ব্যবসায়ের জন্য আবেদন করেন। ইকবাল ১৯১১-এ *পাঞ্জাব প্রভিন্সিয়াল এডুকেশন কনফারেন্সের* সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯২০-এ হন *আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের* জেনারেল সেক্রেটারী। সেপ্টেম্বর-১৯২৪ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। ১৯২৩-এ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার কর্তৃক '*স্যার*' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২০-এ আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৬-এ তিন বছরের জন্য লাহোর থেকে প্রাদেশিক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩২ সালে *অল ইন্ডিয়া মুসলমান কনফারেন্সের* সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৩-এ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক *'ডিলিট'* সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৩৪-এ দুরারোগ্য রোগের শিকার হয়ে পড়েন। স্বাস্থ্যের অবনতি হেতু তিনি আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন। আলী গড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক *'ডিলিট'* সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৩৫ সালে পুনর্বার *পাঞ্জাব মুসলিম লীগের* সভাপতি নির্বাচিত হন। ভূপালের নবাব স্যার সাইয়্যেদ হামিদুল্লাহ খান কর্তৃক ইকবালকে ৫০০ টাকা (বর্তমানের বাংলাদেশের টাকায় লক্ষাধিক টাকা) দান করা হয়। ১৯৩৭-এ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এবং ১৯৩৮-এ উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাঁকে 'ডিলিট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ইস্তফা

১৯০৮-এ সরকারী কলেজ লাহোর থেকে ইকবাল অধ্যাপনা পদে ইস্তফা প্রদান করেন। ১৯০৮-এ অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সেক্রেটারী পদ থেকে ইস্তফা দেন। ১৯৩০-এ আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের জেনারেল কাউন্সিল ও কলেজ কমিটি থেকে ইস্তফা দেন।

রাজনৈতিক কার্যকলাপ

১৯০৮-এ অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের বৃটিশ কমিটির কর্মপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আঞ্জুমানে কাশ্মীরী মুসলমানানে লাহোর-এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। উক্ত সংস্থার পক্ষ থেকে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি হিসাবে ঢাকার নবাব সলিমুল্লার সম্মানে মানপত্র পাঠ করেন। ১৯১১-এ পাঞ্জাবে প্রভিন্সিয়াল এডুকেশন কনফারেন্সের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯১৯-এর ৩০ শে ডিসেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর মৈত্রী

শক্তি কর্তৃক তুর্কীদের সাথে প্রতিশোধমূলক অবরোধের প্রতিবাদে লাহোর মুচি দরোজায় অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দেন ও প্রস্তাব পেশ করেন। ১৯২৬-এ পাঞ্জাবের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যপ্রার্থী হন।

১৯২৭-এর ৫ই মার্চ পাঞ্জাব আইন সভায় ১৯২৭-২৮ সালের বাজেট উপলক্ষে ভাষণ দেন। ১০ই মার্চ সরকারের শিক্ষা বিভাগের বাজেট হ্রাসের সমালোচনা করে ভাষণ দেন। ১লা মে-লাহোরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সম্মেলনে সরকারের যুক্ত নির্বাচন আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৮ ই জুলাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সমালোচনা করে পাঞ্জাব আইন সভায় ; ১৯ শে জুলাই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা সরকারী চাকরি সম্পর্কে পাঞ্জাব সভায়, ৯ ই নভেম্বর আইন কমিশনের সমালোচনা করে ভাষণ দেন।

১৯২৮-এর ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ভূমি রাজস্বের উপর আয়কর উসুল করার প্রস্তাবের উপর পাঞ্জাব আইন সভায় ভাষণ দেন। ২৪ শে জুন অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সেক্রেটারীর পদ থেকে ইস্তফা দেন। ২৫ শে ডিসেম্বর মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে স্যার মুহম্মদ শফীর নেতৃত্বে কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ২৯ শে ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলনে ভাষণ দেন এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র কার্যক্রম গ্রহণ করার পরামর্শ দেন।

১৯৩০-এর ২রা মে প্রথম নির্বাচনের দাবীতে অনুষ্ঠিত লাহোর মুচি দরোজার এক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। ২৩ শে নভেম্বর বরকত আলী ইসলামিয়া হলে মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি সম্মেলন আহবান করে উত্তর ভারতের মুসলমানদের একটি বিশেষ সম্মেলন আহবানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। ২৯ শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন।

অভিভাষণে তিনি বলেন–

I would like to see Punjab, North-west frontier of province, Sind and Baluchistan amalgamated into a single state. Self government within the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated North-west Indian Muslim State, appears to me to the final destiny of the Muslim, at least of North-west of India.

১৯৩০-এর ৩০শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দেন।"উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি স্বতন্ত্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক ধারণা পেশ করেন। ১৯৩২-এর ১লা জানুয়ারী জেরুসালেমে অনুষ্ঠিত ইসলামী লীগ সম্মেলন সম্পর্কে সিভিল ও মিলিটারী গেজেটের প্রতিনিধি তাঁর সাক্ষাৎ গ্রহণ করেন। ১লা জানুয়ারী বিশ্ব সম্মেলন সম্পর্কে বিবৃতি দেন। ফেব্রুয়ারীতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩২- ১২ই জুন বি.এ. শ্রেণীর পাঠ্য তালিকা থেকে ইসলামের

ইতিহাস খারিজ করার প্রতিবাদে মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভায় সভাপতিত্ব করেন। ২৯শে জুন অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্সের ব্যবস্থাপনা কমিটির বৈঠক স্থগিত হওয়া সম্পর্কে বিবৃতি দেন। ৬ই জুলাই দ্বিতীয়বার বিবৃতি দেন। ২৫শে জুলাই শিখদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে, ৪ঠা আগস্ট স্যার যোগেন্দ্র সিং কর্তৃক প্রস্তাবিত শিখ মুসলিম সমস্যা আলোচনামূলক প্রস্তাব সম্পর্কে, ১০ই আগস্ট শিখ মুসলিম সমস্যা সম্পর্কে মতবিনিময় সম্পর্কিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্সের কার্যকরী কমিটির প্রস্তাবের ব্যবস্থামূলক বিবৃতি দেন। ২৪শে আগস্ট সরকারের সাম্প্রদায়িকতামূলক ফয়সালা সম্পর্কে, বিবৃতি দেন। ৮ই অক্টোবর জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দের লখনৌ সম্মেলন সম্পর্কে এবং ২৭ই অক্টোবর লখনৌ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে বিবৃতি দেন। ১৭ই নভেম্বর তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। ১৫ই নভেম্বর বৃটিশ কমন সভায় ভাষণ দেন। ১৯৩৩-এর ২৬ শে ফেব্রুয়ারী গোল টেবিল বৈঠকের ফলে গঠিতব্য বিধান সম্পর্কে, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ইউরোপের পরিস্থিতি সম্পর্কে, ৪ঠা মার্চ শ্বেতপত্র সম্পাদিত সাংবিধানিক প্রস্তাব সম্পর্কে, ১৬ই মে তুর্কিস্তানে বিদ্রোহ সম্পর্কে, ৭ই জুন কাশ্মীর রাজ্যে দাঙ্গা সম্পর্কে, ২০শে জুন অল ইন্ডিয়া কাশ্মীর কমিটির সভাপতিত্ব থেকে ইস্তফা দান সম্পর্কে, ১৪ই জুলাই পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িকতামূলক সরকারী ফয়সালা সম্পর্কে, ৩রা আগস্ট কাশ্মীরে প্রশাসন সংস্কার সম্পর্কে বিবৃতি দেন। ২রা অক্টোবর কাশ্মীর আন্দোলনের সভাপতিত্ব গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতিমূলক বিবৃতি দান করেন।

১৯৩৪-এর ১লা জুন দিল্লী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *মুনাদি* পত্রিকায় পাটনার নির্বাচন সম্পর্কে এবং ১৯শে জুন সাম্প্রদায়িকতামূলক ফয়সালা সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিবৃতি দেন।

১৯০৫-এ কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী পত্রিকা মডার্ন রিভিউতে প্রকাশিত জওহরলাল নেহরু রচিত কাদিয়ানী মতবাদ সম্পর্কিত পত্রের জবাব দেন।

ইকবাল জীবনে নারী (বিবাহ)

১. ১৮৯৩-এ ১৬ বছর বয়সে ইকবাল গুজরাটের সিভিল সার্জন খান বাহাদুর আতা মুহম্মদের ১৯ বছর বয়স্কা কন্যা করিম বিঁকে বিয়ে করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর কন্যা মেরাজ বি' ও পুত্র আফতাব ইকবালের জন্ম হয়। ১৯১৯ সালে এই স্ত্রীর থেকে তিনি পৃথক হন। ১৯৪৭-এ করিম বি' ইন্তেকাল করেন।

২. ১৯০৯-এ লাহোরের মুচি দরজাবাসী এক কাশ্মীরী পরিবারের সরদার বেগমের সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। ১৯১৩-এ এই স্ত্রীকে তিনি গৃহে

আনেন। ১৯২৪-এ সরদার বেগমের গর্ভে ইকবাল পুত্র জাবিদ ইকবাল জন্মগ্রহণ করেন।

৩. ১৯১২-এ তে লুধিয়ানাবাসী নওলাক্ষা পরিবারের কন্যা মোখতার বি'বির সাথে ইকবালের তৃতীয় বিবাহ হয়। ১৯২৪-এর অক্টোবরে সন্তান প্রসবকালে তাঁর এই স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

৪. ১৯০৭-এ প্রবাস জীবনে আতিয়া ফয়জী নামে এক শিক্ষিতা বিদূষী মহিলার সাথে ইকবালের পরিচয় হয়। এর কাছে ইকবাল ইংরেজীতে জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত কিছু পত্র লেখেন। দিল্লী থেকে দানী পাবলিশিং হাউজ "আতিয়া ফয়জীর নামে ইকবাল পত্রাবলী" নামে ১৯৪৭ সালে উক্ত পত্রাবলীর একটি সংকলন প্রকাশ করে ।

পিতৃ-মাতৃবিয়োগ

১৯১০-এ ইকবালের আম্মা এবং ১৯৩০-এ তাঁর আব্বা ইন্তিকাল করেন।

ইকবালের রচনা পরিচয়

ইকবালকে উর্দূ ভাষার কবি বলা হয়। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি উর্দূ ও ফার্সী ভাষার কবি। আমরা ইকবালকে মোট ১১টি কাব্যগ্রন্থ লিখতে দেখছি। এর মধ্যে ফারসী আটটি এবং উর্দূ তিনটি। তাঁর ফারসী কাব্যগুলি যথাক্রমে *আসরার-ই-খূদী* (১৯১৫), *রমূযে বেখূদী* (১৯১৮), *পায়ামে মাশরিক* (১৯২৩), *যবূরে আযম* (১৯২৭), *জাবিদ নামা* (১৯৩২) *পস চেহ বায়াদ কর্দ* (১৯৩৬) এবং *আরমুগানে হেজায* (১৯৩৮) প্রকাশিত হয়।

তাঁর উর্দূ ভাষায় লিখিত কাব্য বাঙ্গ-ই-দারা (১৯২৪), *বাল-ই-জিবরীল*- (১৯৩৫) এবং *যরব-ই-কলীম* ১৯৩৬-এ প্রকাশিত হয়। লক্ষ্য করবার বিষয়, তিনি বাল্যে, কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে উর্দূ কবিতা লিখলেও তাঁর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ ফারসীতে লেখা *'আসরার-ই-খূদী'* (১৯১৫) এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *"রমূয-ই-বেখূদী"* ১৯১৮-এ প্রকাশিত হয়।

ইকবালের প্রথম দিককার রচিত কবিতা ১৯২৪-এ প্রকাশিত তাঁর *বাঙ্গ-ই-দারা* কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর কাব্যগ্রন্থ পরিচায়কদের মতে, এর সমস্ত কবিতাকে কাব্যানুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে আছে তাঁর ১৯০৫-এ ইউরোপে যাওয়ার আগে রচিত কবিতা। যেমন- *'হিমালা'* (হিমালয়), *'তসভীর-ই-দর্দ'* (ব্যথার ছবি),'নয়া শিওয়ালা' (নব শিবালয়), *'ভারতীয় বালক-বালিকাদের জাতীয় সঙ্গীত'* এবং *'তারানা-ই-হিন্দ'* (ভারত-সঙ্গীত)। দ্বিতীয় ভাগের কবিতা তাঁর ১৯০৫ থেকে ১৯০৮-এ ইউরোপে থাকাকালীন লেখা। তাঁর এই ইউরোপ থাকাকালীন কবিতার সংখ্যা কম। কিন্তু তখন তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন হতে দেখা যায়। তখন তিনি স্বাদেশিকতাবাদী নন, তিনি আন্তর্জাতীয়তাবাদী অথবা বলা যেতে পারে সংকীর্ণ

অর্থে জাতীয়তাবাদী নন, আন্তর্জাতিক মুসলিম বিশ্বের মুসলিম জাতীয়াতাবাদী। তাঁর মধ্যে তখন *খুদী* তত্ত্বের উন্মেষ ঘটছে। তাঁর এই সময়ের চিত্তাকর্ষক কবিতাগুলো হল 'মুহব্বত' (প্রেম), *'হকীকত-ই-হুসন'* (সৌন্দর্যতত্ত্ব), *'তুলাবায়ে আলীগড় কলেজ কে নাম'* (আলীগড় কলেজের ছাত্রদের প্রতি), *'স্বামী রামতীর্থ'*, 'সিকিলিয়া' (সিসিলি)।

এই কাব্যের তৃতীয় ভাগে মুসলিম জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত কবিতার সংকলন দেখা যায়। ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর তিনি এইসব কবিতা লেখেন। এই কবিতা লেখার সময়কাল ১৯০৮ থেকে ১৯২৪। এর প্রথম কবিতা *'বিলাদ-ই-ইসলামিয়া'*। এই কবিতায় তিনি বাগদাদ, দিল্লী, কর্ডোভা, কনস্ট্যান্টিনোপল এবং মদীনার গান গেয়েছেন। এই বিভাগেই তাঁর বিখ্যাত কাব্য *'শিকওয়া'* ও *'জবাব-ই-শিকওয়া'* সংকলিত হয়েছে। তাঁর আরো দু'টি দীর্ঘ কবিতা *"খিযির রাহ"* এবং *"তুলু-ই-ইসলাম"* অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীতও এই বিভাগের অন্তর্গত। এই ভাগে তাঁর আর যে-সব কবিতা সংকলিত হয়েছে সেগুলো হল *'ফলাসফি-ই-গম'* (দুঃখতত্ত্ব), ও *'অতনিয়ত'* (স্বদেশ পূজা,) *'রাত আওর শাইর'* (রাত্রি ও কবি), *'নওঈদ-ই-সুবহ্'* (প্রভাতের সুসংবাদ), 'গুলাম কাদির-রাহিলা', 'স্বর্গীয়া জননীর স্মরণে', 'মুসলমান' এবং 'নব্য শিক্ষা'।"

প্রকৃতপক্ষে ইকবালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *"আসরারে-ই-খুদী"* ১৯১৫-তে এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *"রমূয-ই-বেখুদী"* ১৯১৮-তে প্রকাশিত হয়। ১৯২৩-এ প্রকাশিত হয় ইকবালের আর একটি ফারসী কাব্য *'পায়াম-ই-মাশরিক।* *পায়াম-ই-মাশরিক* কয়েকটি খন্ডে বিভক্ত। এগুলো হল–

১. *লালা-ই-তুর* (সিনাই পর্বতের লাল ফুল), এতে আছে একশ' তেষট্টিটি রুবাই।

২. *আফকার* (চিন্তাসমূহ)-এ খন্ডে আছে- *"তসখির-ই-ফিৎরত*-(প্রকৃতি জয়) *'ফসল-ই-বাহার'* (বসন্তঋতু), *'সরূদ-ই-আন্জুম'* (নক্ষত্রদের গান), *'কিরম-ই-কিতাবী'* (গ্রন্থকীট), *'হুদী'* (উষ্ট্রচালকদের গীত), 'কাশ্মীর' ও 'গনি কাশ্মীর'।

৩. *'মায়-ই-বাকী'* (শাশ্বত মদিরা)-এতে ফারসী কবিদের অনুকরণে লেখা উঁচুমানের অনেক গজল আছে।

৪. *'নক্শ-ই-ফিরঙ্গ'* (ইউরোপ চিত্র),-এতে ইউরোপের সমস্যা তাঁর কয়েকজন দার্শনিক ও কবি শোপেন হাওয়ার, হেগেল, বার্গসঁ', নিটশে, গ্যেটে, আইনস্টাইন, কাল মার্কস-এর উপর লেখা কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৫. *খুরদা* (লাল মদিরা)–এতে বিবিধ বিষয়ে কয়েকটি ছোট ছোট কবিতা আছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৯২৪-এ উর্দূতে লেখা *'বাঙ্গ-ই- দারা'* প্রকাশিত হয় এবং ১৯২৭-এ প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ ফারসীতে রচিত *"যবূরে আযম"*(পারস্য স্তোত্র)।

"যবুর-ই-আযম" দু'টি ভাগে বিভক্ত ১. *গুলশান-ই-রায-ই জাদীদ* (নব রহস্য পুষ্পোদ্যান) এবং *বন্দেগী নামা* (দাসত্ব পূজা); হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের নাম যবূর। পারস্যের ভাবধারা এই গ্রন্থের প্রধান উপাদান। *"যবূর-ই-আযম"* নামকরণই এর কারণ। পারস্যের কবি মাহমুদ শাবিস্তারী সূফী মতবাদ সম্বন্ধে *"গুলশান-ই-রায"* (রহস্যের পুষ্পোদ্যান) নামে একটি কাব্য লেখেন। এ থেকে ইকবাল তাঁর 'গুলশান-ই-রায-ই জাদীদ' বা নব রহস্য পুষ্পোদ্যানের নামকরণ করেন। উল্লেখ্য, জনৈক সূফী শাবিস্তারীকে ন'টি প্রশ্ন করেছিলেন। ইকবাল বর্তমান যুগের আদর্শ থেকে তাঁর কাব্যে এর উত্তর দিয়েছেন। আর *'বন্দেগী নামা'য়* দাস জাতির শিল্প ও ধর্মের পরিচয় দেয়া হয়েছে।

১৯৩২-এ প্রকাশিত হয় ইকবালের *"জাবিদ নামা"*। এটিও ফারসীতে রচিত। কনিষ্ঠ পুত্র জাবিদের নামে ইকবাল এর নাম করেন। এই কাব্যের উপর দান্তের প্রভাব আছে। উল্লেখ্য, রসূল (সাঃ)-এর *মি'রাজ*-এর ঘটনা দান্তেকে *'ডিভাইন কমেডি'* লেখায় অনুপ্রেরণা দান করে। ইকবাল তাঁর *জাবিদ নামায়* বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। মি'রাজে রসূল (সাঃ)-এর সঙ্গী ছিলেন জিব্‌রাইল (আঃ), আর ইকবালের উর্ধ্বলোকের ভ্রমণসঙ্গী মাওলানা জালালউদ্দীন রুমী।

১৯৩৫-এ তাঁর উর্দূতে লেখা কাব্যগ্রন্থ *'বাল-ই-জিবরীল'* প্রকাশিত হয়। এর প্রথম খন্ডে ৬১টি গযল এবং কতকগুলো রুবাই আছে। বলা বাহুল্য, এর ২য় খন্ডের বেশ কিছু কবিতা ইকবাল স্পেনে ভ্রমণের সময় লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে খোদার সম্মুখে লেনিন, জাবিদের প্রতি, মসজিদ-ই-কর্ডোভা (কর্ডোভার মসজিদ), ফিরিশতুঁ কা গীত (ফেরেশতাদের গান), ফরমান-ই-খুদা (আল্লাহর ফরমান), আল আরদু লিল্লাহ্ (জমির মালিক আল্লাহ), রুহে আরযী আদম কা ইস্তিকবাল কারতি হায় (পৃথিবীর আত্মা কর্তৃক আদমের অভ্যর্থনা), জিব্রিল ও ইবলিস, সাকীনামা, মুল্লা ও স্বর্গ, আজান, নেপোলিয়ান কে মাজার পর নেপোলিয়নের মাজারে), শাহীন (শ্যেন পক্ষী), বাগী মুরীদ (বিদ্রোহী মুরীদ), রাজনীতি ও ধর্ম, জনৈক যুবকের প্রতি, দর্শন ও ধর্ম , পাঞ্জাবের যুবকদের প্রতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কবিতা আছে।

১৯৩৬-এ তাঁর উর্দূ গ্রন্থ *'যরব-ই-কলীম'* এবং ফারসীতে লেখা কাব্য 'পস্ চে বায়াদ কর্দ (অতঃপর কিংকর্তব্য) প্রকাশিত হয়। *'যরব-ই-কলীম'* (মুসার যষ্ঠির আঘাত)-এর নামান্তর "বর্তমান যুগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা"। এর প্রথম ভাগে ইসলাম ও মুসলমান, দ্বিতীয় ভাগে শিশু পালন, তৃতীয় ভাগে নারী

জাতি, চতুর্থ ভাগে রাজনীতি এবং পঞ্চম ভাগে প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের রাজনীতি সম্বন্ধে কবিতাগুলো সংকলিত হয়েছে। শেষে *মিহরাব গুল্ আফগানের চিন্তাধারা* নামে কুড়িটি ক্ষুদ্রাকৃতির কবিতা মুদ্রিত হয়েছে।

এ বছর "পস্ চে বায়াদ কর্দ" নামে ফারসীতে লেখা কাব্যটিও প্রকাশিত হয়। আফগানিস্তান ভ্রমণের সময় ইকবাল যে-সব কবিতা লেখেন তা *'মুসাফির'* নামে এতে সংকলিত হয়েছে।

"পস চেহ বায়াদ কর্দ" কাব্যগ্রন্থের বিশিষ্ট কবিতাগুলোর মধ্যে আছে হযরত মুসার বিজ্ঞতা, ফিরআউনের বিজ্ঞতা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ফকর (বৈরাগ্য), স্বাধীন মানুষ এবং শরীয়তের রহস্য। মুসাফির অংশে এইসব কবিতা আছে- সীমান্তের লেখকদের প্রতি সম্ভাষণ, শহীদ বাদশাদের সম্মুখে, বাবুর, হাকিম সনাঈ, সুলতান মাহমুদ ও আহমদ শাহ্ বাবরের সমাধি দর্শন, বাদশাহ্ যহীর শাহের প্রতি সম্ভাষণ।

১৯৩৮ -এর ২১ শে এপ্রিল মহাকবি ইকবাল ইন্তিকাল করেন। এ বছরই তাঁর ফারসীতে এবং উর্দূতে লেখা কাব্যগ্রন্থ *'আরমুগান-ই-হিজায'* (হিজাযের উপহার) প্রকাশিত হয়। এতে আছে ইকবালের জীবন সায়াহ্নের শেষ বাণীসমূহ। এতে যে-সব কবিতা ফারসী অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাতে আছে রসূলের প্রতি, মুসলিম জাতির প্রতি, মানব জাতির প্রতি এবং পথের বন্ধুগণের প্রতি। আর উর্দু অংশে আছে *'ইবলিস কী মাজলিস-ই-শূরা'* (ইবলিসের পরামর্শ সভা), বৃদ্ধ বালুচের পুত্রের প্রতি উপদেশ, চিত্র ও চিত্রকর, প্রেতলোক, নারকীয় প্রার্থনা, আকাশবাণী প্রভৃতি। ইকবালের মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে উর্দূ ভাষায় রচিত তাঁর কাব্যগ্রন্থ *কুল্লিয়াতে ইকবাল* উর্দূ এবং ফারসী ভাষায় রচিত কাব্যসমগ্র *'কুল্লিয়াতে ইকবাল'* প্রকাশিত হয়।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, ইকবাল কেবলমাত্র কবিতা বা কাব্য লেখকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অতি উচ্চমানের চিন্তাশীল প্রবন্ধ লেখকও। তাঁর উদ্দেশ্যধর্মী জীবনে তিনি কি করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের উদ্দশ্য ও আদর্শ কি— এসব কিছু তাঁর প্রবন্ধ, বক্তৃতা, অভিভাষণ ও পত্রাবলীতে ফুটে উঠেছে। তারও একটি পরিসংখ্যান দেয়া হল।

প্রবন্ধ

১. ইলমুল ইকতিসাদ (অর্থ বিজ্ঞান) ১৯০৩
২. The Development of Metaphysics in Persia-১৯০৯
৩. Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thoght in Islam-১৯৩০
৪. Reconstruction of Religious Thought in Islam-১৯৩৪
৫. ফালসাফায়ে আজম—১৯৩৬
(পারস্যে প্রজ্ঞান চর্চার বিকাশ গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ)
৬. হরফে ইকবাল (রাজনৈতিক ভাষণ ও বিবৃতি সংকলন)—১৯৪৫

৭. মাকালাতে ইকবাল–১৯৬৩
৮. কাওমী যিন্দিগী আওর মিল্লাতে বয়যা পর এক এমরানী নযর–১৯৭০
৯. শাযতরাতে ইকবাল–১৯৭৩
১০. আফকারে ইকবাল–(স্মৃতি সংকলন) ১৯৯০

পত্রাবলী
১. শাদে ইকবাল–১৯৪২
২. ইকবাল নামা–১৯৪৫
৩. আতিয়া ফয়জীকে লেখা ইকবালের পত্রাবলী (ইংরেজী)–১৯৪৭
৪. মাকাতীবে ইকবাল–১৯৫৪
৫. মকতুবাতে ইকবাল–১৯৫৭
৬. আনওয়ারে ইকবাল–১৯৬৭
৭. লেটারস এ্যাণ্ড রাইটিংস অব ইকবাল–১৯৬৭
৮. মাকাতীবে ইকবাল বনামে গেরামী–১৯৬৭
৯. নাওয়াদেরে ইকবাল-বনামে মহারাজা কৃষ্ণ প্রসাদ–১৯৭৬
১০. রূহে মাকাতীবে ইকবাল–১৯৭৭
১১. কায়েদে আযমের নামে ইকবালের পত্রাবলী (ইংরেজী) ?

ইকবালের সমগ্র জীবন ও জীবনকর্মের দিকে তাকালে মনে হবে– একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তিনি তীরের মত ছুটে চলেছেন। তিনি জগতে একটা নতুন চিন্তার জন্ম দিতে যাচ্ছেন এবং তার জন্য গ্রহণ করছেন এক যুদ্ধযাত্রার গমনাপেক্ষায় নিরত সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি। তাঁর মাতৃভাষা উর্দূ ছাড়াও, তিনি ফারসী, আরবী, ইংরেজী ও জার্মানী ভাষায় এমন জ্ঞান অর্জন করেছিলেন যা দিয়ে শুধু আলাপ করা নয়, গ্রন্থ রচনা করা যায়। অধ্যাপনা করা, কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টি করা অসম্ভব হয় না। এছাড়াও তিনি ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র গভীরে নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন। সাহিত্য ও কাব্যের তো কথাই নেই। মার্কস যেমন জগৎকে বদলাতে চেয়েছিলেন, ইকবালও তাঁর চিন্তা-দর্শন দিয়ে জগতের সংকট দূর করতে চিন্তার এক নতুন ধারা সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। কান্ট, হেগেল, নীটশে, বার্গসঁকে গভীরভাবে পাঠ করা ইকবাল এবং পাশ্চাত্যের রাজনীতির অন্তস্থলে অণুবীক্ষণ দৃষ্টি দিয়ে দেখা ইকবাল বুঝেছিলেন যে, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের দর্শন ও আদর্শ দিয়ে গণতন্ত্রবাদীরা এবং কম্যুনিস্টরা সমাজ পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে, তা সমস্যা দূরীকরণের পরিবর্তে নতুন সমস্যার জন্ম দিতে যাচ্ছে। যা

প্রকৃত রোগ দূরীকরণের ওষুধ নয়, বরং তা এক ধরনের ড্রাগ যা আপাতঃদৃষ্টিতে ওষুধ মনে হলেও তা মানুষকে সুস্থ করতে পারে না বরং রোগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দর্শনে মানব হিতৈষণার গুণগত আদর্শ একেবারে তা নয়, কিন্তু ইকবাল তাঁর মধ্যে দুষ্ট নেশার ওষুধের অস্তিত্ব দেখেছিলেন যা মানুষকে যতটা সুখী করে তার চেয়ে বেশী করে অসুখী। মানুষের জীবনে তা শক্তি ও গতি আনলেও, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে আসক্তি আনলেও, সেই সঙ্গে আনে পররাজ্য গ্রাসের স্বার্থানুভূতি আর বৃদ্ধি করে মানবিক প্রবৃত্তির বদলে পাশবিক প্রবৃত্তি। সে আদর্শ স্বাধীনতা দেয়, কিন্তু সে স্বাধীনতা যতটা মানবতাবাদী মানুষের তার চেয়ে বেশী পাশবতাবাদী মানুষের। সে কথা বলতে ইকবাল তাই দ্বিধা করলেন না। ইকবাল বলেছেন–

ইম্পিরিয়ালিজমের দেহটা প্রকাণ্ড হৃদয়টা অন্ধকার

'জমহুরিয়াত' বা গণতন্ত্র কবিতায় ইকবাল তাই বললেন–

ডেমোক্রেসী হল সেই রাষ্ট্রবিধান যাতে মানুষ গোনা হয়,
ওজন করা হয় না। (অনুবাদ ঃ অমিয় চক্রবর্তী)

কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিবাদ ও কর্মবাদকে তিনি অস্বীকার করেননি। তিনি তাঁর খূদী দর্শনের উৎস হিসেবে ঐ দর্শনকে গ্রহণ করেছিলেন, যদিও তিনি জানতেন এর মূলমন্ত্রকে ইউরোপ ইসলামের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছে। সুতরাং মানবতাবাদী গণতন্ত্রবাদের ছদ্মবেশী চেহারাকে ফেলে তিনি পূর্ণ সত্য হিসাবে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। জগৎকে তিনি বোঝাতে চাইলেন তারা যা আবিষ্কার করেছে তা ভুল নয় বরং তা সুন্দরের বিকৃত অনুকরণ ও বিভ্রান্ত বাস্তবায়ন। এই চিন্তার গভীরতার জন্যই ইকবালের কবিতা শুধু মুসলমান সমাজের নয়, গোটা বিশ্বের মানব সমাজের জন্য হ'য়ে উঠেছে নতুন চিন্তার দিক্‌দর্শন। কেননা তিনি যে সংকট ও সমস্যার কথা চিন্তা করেছিলেন তা একা মুসলিম সমাজের নয়, বিশ্ব সমাজের সমস্যা। সে জন্যেই ইকবালকে যাঁরা সাম্প্রদায়িক কবি হিসেবে পরিচয় করাতে চান– ইকবালের মেধার উপলব্ধি তাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতার বাইরে। সে-জন্যেই বোধ হয় ইকবাল বলেছিলেন–

প্রয়োজন নেই আমার আজকের মানুষের কর্ণের।
আমি বাণী
অনাগত যুগের কবির।
হৃদয়ঙ্গম করে না আমার বাণীর গূঢ় অর্থ
আমার নিজের যুগ,
ইউসুফ আমার এই বাজারের জন্য নয়।

(অনু : সৈয়দ আবদুল মান্নান)

এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ইকবালের *শিকওয়ার* কথা মনে আসবে। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের বার্ষিক সম্মেলনে ইকবাল *"শিকওয়া"* আবৃত্তি করেন। কিন্তু ইসলাম উপলব্ধিতে অগভীর ও অসম্পূর্ণ এবং কাব্যবোধ সম্বন্ধে অজ্ঞ মুসলিমরা ইকবালকে আল্লাহ-বিদ্রোহী বলে মনে করেন। *'শিকওয়া'য়* তিনি ব্যঙ্গার্থে আল্লাহর প্রতি যে অভিযোগ করেছেন, সে যে তাঁর গভীর মুসলিম-প্রীতিরই অভিব্যক্তি— তাতে কে সন্দেহ করবে ? এই কবিতাতে মুসলমানের দারুণ দুর্দশার জন্যে যে ভালোবাসার হাহাকার প্রজ্বলিত হয়েছিল—সেটা যারা বোঝেনি তাদের কাব্যবোধ যে নিম্নস্তরের '*আসরার-ই খূদী'তে* কাব্য ভাষায় ইকবাল তাঁর উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু বিরোধিতা ও সমালোচনা কখনও নিস্ফল হয় না এবং সমালোচনারই ফল ইকবালের আর একটি উৎকৃষ্ট কাব্য *"জবাব-ই-শিকওয়া"*, যার অনুবাদ করেছেন গোলাম মোস্তফা, মনিরউদ্দীন ইউসুফ এবং অংশবিশেষের অনুবাদ করেছেন কবি ফররুখ আহমদ । বর্তমান সংকলনে আমরা অনুবাদের মাধ্যমে যার সৌন্দর্য ও ভাব-মাহাত্ম্য আহরণ করতে সক্ষম হব।

বস্তুত *'আসরার-ই-খূদী'* আমার মতে ইকবালের শ্রেষ্ঠ রচনা, তাঁর মাস্টার পীস, তাঁর ম্যাগনাম ঔপাস। ফেরদৌসীর যেমন শাহনামা, রুমীর যেমন মসনবী, মধুসূদনের যেমন 'মেঘনাদবধ কাব্য', রবীন্দ্রনাথের যেমন "বলাকা" নজরুলের যেমন "বিদ্রোহী", হাফিজের যেমন "দিওয়ান", মিল্টনের যেমন "প্যারাডাইস লস্ট", হুইটম্যানের যেমন "সাঙ্গ অফ মাইসেলফ" ইকবালের তেমনি 'আসরার-ই-খূদী'। আমি ফারসী জানি না বলে এর প্রকৃত ছন্দ-ধ্বনি-মাধুর্য, এর শব্দ গ্রন্থনার কারিগরি দক্ষতা, এর অলংকার কারুকার্য সম্পর্কে আমার পক্ষে মন্তব্য করা কঠিন। কিন্তু এর অতুলনীয় যুক্তিমিশ্রিত ভাবাবেগের সৌন্দর্যে আপ্লুত না হয়ে পারা যায় না।

যে দর্শন পৃথিবীকে উপহার দিয়ে তিনি গড়ে তুললেন তাঁর এক দল ভক্ত অনুসারী, যারা তাঁর কাব্যকে একটি সুন্দরতম সিরাজের লাল গোলাপের অন্ধ ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করবে— তাদের তিনি এমন একটি গভীর চিন্তাকে কাব্য মালায় গেঁথেছেন বিশ্ব সাহিত্যে যার তুলনা খুব বেশী নেই। ইকবাল লিখছেন—

আইনের কারায় হবে সে বন্দী,
যে চায় ইংগিতে চালাতে
ওই দূর আকাশের সূর্য
আর অগণিত তারকারাজি।
বাতাস তখনই হয়ে ওঠে সুরভি
যখন সে বন্দী হয় ফুলের বুকে,
সুরভী হয়ে ওঠে কস্তুরী
যখন সে হয় বন্দী
কস্তুরী মৃগের নাভিমূলে।

আসলে আইনকে অর্থাৎ কোরআনী আইনকে মানার জন্যে তিনি মানবজাতিকে আহবান করেছিলেন। প্রকৃত স্বাধীনতা যে আইন ভঙ্গে নেই, আইন মান্যে আছে– ইকবাল মানুষকে সে কথাই বলতে চেয়েছিলেন। ইকবাল বলছেন–

তুমিও, হে মানুষ,
কর্তব্যের বোঝা বইতে
কোর না অস্বীকার ;
তবেই পাবে লাভ করতে সেই স্বর্গপুর
যেখানে আল্লাহর নৈকট্য।
আইনের বিধান মেনে চলো,
হে অমনোযোগী আত্মা !
বাধ্যতার পরিণামই স্বাধীনতা।
অলস ও উচ্ছৃঙ্খল মানুষ হয়ে ওঠে কর্মী।
এই আইনের বিধান মেনে;
আর অবাধ্যতায় তার অন্তরের
আগুন হয়ে যায় ছাই।

এটা হল পাশ্চাত্য দর্শন মন্থনকারী ইকবালের চিন্তার সারাৎসার। তিনি বুঝিয়ে দিলেন অনিয়ন্ত্রিত আগুন ধ্বংস করে, নিয়ন্ত্রিত আগুন দেয় অন্ধকার বিলুপ্তকারী আলো। আর একেই কী চমৎকারভাবে তিনি কাব্য-ভাষায় যুক্তির পুষ্পে বিকশিত করলেন। বললেন–

"বাতাস তখনই হয়ে ওঠে সুরভী, যখন সে বন্দী হয় ফুলের বুকে"।

এই কাব্য পাঠ করার পরই আমি এস, ওয়াজেদ আলীর নিম্নোক্ত স্ব-বিরোধী বক্তব্যকে উপলব্ধিহীন এবং চিন্তাহীন বক্তব্য বলে ধরে নিয়েছি। যদিও ইকবাল ভক্ত এস, ওয়াজেদ আলী ইকবালকে ছোট করার জন্যে এই উক্তি করেননি, তবু তাঁর উক্তি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাব্য-পাঠক রসিকের নয়। ওয়াজেদ আলী বলেছিলেন, "ইকবাল মহাকবি ছিলেন বটে, কিন্তু এক হিসাবে তাঁকে কবি বলা ভুল। কবির কাজ সাধারণত হচ্ছে কাব্যের চর্চা, আর তাই করে তিনি আমাদের আনন্দ এবং শিক্ষা দান করেন। রবীন্দ্রনাথ হলেন এই ধরনের কবি। কিন্তু ইকবাল কাব্যের সাহায্যে দর্শনের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য ছিল, কাব্যের সৃষ্টি নয়, দর্শনের আদর্শের সৃষ্টি।"

(একবাল : এস, ওয়াজেদ আলী –এস ওয়াজেদ আলী' বাংলা একাডেমী)

কথাটা যদি ইকবালের জন্যে সত্যি হয় তাহলে কথাটা গ্যেটে, দান্তে এবং মিল্টনের জন্য সত্য হবে এবং হয়ত বা রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও। এঁরা মানব সমাজের শিক্ষক এবং এঁরা মানুষকে কোন আদর্শের শিক্ষা দেননি– একথা

যথার্থ নয়। বরং গোলাম মোস্তফা তাঁর *"দার্শনিক কবি ইকবাল"* প্রবন্ধে কোলরিজ ও ল্যাণ্ডরের উদ্ধৃতি দিয়ে ঐ কথার জবাব দিয়েছিলেন। কোলরিজ বলেছিলেন :

"No man was ever yet a great poet without being, at the same time, a profound philosopher".

এবং ল্যান্ডোর বলেছিলেন–

"We may write little thing well and accumulate one upon another, but never will any be justly called a great poet, unless he has treated a great subject worthily. He may be the poet of the lover and the idler, he may be the poet of green fields and gay society, but who ever is this can be no more."

আসরার-ই-খূদীতে এই কাজটি অতি যোগ্যতার এবং দক্ষতার সাথে করতে পেরেছিলেন বলে ইকবাল বড় দার্শনিক কবি, বড় কবি। আনন্দের কথা বর্তমান সংকলনে সৈয়দ আবদুল মান্নান ছাড়াও দু'জন বিখ্যাত কবি ফররুখ আহমদ এবং সৈয়দ আলী আহসান কৃত *'আসরার-ই-খূদী'র* অনুবাদের অংশবিশেষ এখানে মুদ্রিত হয়েছে। তাঁদের সেই অনুবাদ নিশ্চয়ই কাব্যবোধ ও কাব্য-রসিকদের ইকবাল কাব্য পাঠে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করবে।

বলা অপ্রাসঙ্গিক নয়, *'শেকোয়া'* প্রকাশিত হওয়ার পর ইকবালের যে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল, *বিদ্রোহী* লেখার পর সেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল নজরুল ইসলামকে। তাঁকেও *"বিদ্রোহী"* লেখার কারণ ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ফরাসী কবি বোদলেয়ারের কথা মনে পড়ে। তিনি *"শয়তান স্তোত্র"* নামে একটি কবিতা লেখাতে সাধারণ পাঠকের কাছে *'শয়তান'* নামে পরিচিত হন। তিনি যে পরম খ্রীস্টান ছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর অন্তরঙ্গ ডায়েরী পড়ে সেটা বোঝা যায়।

আসলে ধার্মিকের পোশাকে ধর্মের ছদ্মরূপ ধরে যারা অত্যাচার করে মানুষ নির্বিকারভাবে সেই মিথ্যাকে অদ্ভুত সরলতায় তার প্রশ্রয় দেয় ; অন্তর্দৃষ্টির অভাবে তার অন্তরীক্ষের কপটতা বোঝা সম্ভব হয় না। অথচ সেই মিথ্যার যারা মুখোশ উন্মোচন করতে যান মানুষ তার অন্তর্দৃষ্টির উপলব্ধির মেধার অভাবের কারণে তাঁদের শত্রু ঠাওরায়। এইভাবে হাফেজ, রুমী ও খৈয়ামও এক সময় মানুষের শত্রুতে পরিণত হন। বলা বাহুল্য, কোন মানুষ যখন তার নিজস্ব উপলব্ধির দৃষ্টিভঙ্গিতে নব-চেতনার দর্শন সৃষ্টি করেন তখন ক্ষুদ্র দৃষ্টির মানুষের চোখে বিতর্কিত হয়ে পড়েন। বিশ্ব মুসলিমের অধঃপতন, আর্থিক দুর্বলতা, শিল্প-সংস্কৃতি, শিক্ষা ও বিজ্ঞানে পশ্চাৎপদতায় ব্যথিত ইকবাল সমাজের দুর্দশা দূর করার জন্যে অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে যে গুরুভার কর্তব্য পালনে অগ্রসর হয়েছিলেন– সেই চিন্তার পথ-পরিক্রমায় খূদীর দর্শন দিয়ে আত্মোন্নতি এবং

আত্মশক্তিতে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করা তিনি আবশ্যক বলে ভেবেছিলেন। বলা বাহুল্য, "*শেকোয়া*" ও "*জবাব-ই-শিকওয়া*"র তিনি সমস্যার ছবি এঁকেছেন আর "*আসরার-ই-খূদী*" ও "*রমূযে বেখূদী*"তে তিনি তার সমাধান দিতে চেয়েছেন। কারণ, ডুবন্ত মানুষের কান্নাটা সহৃদয়তা প্রকাশ, কিন্তু সমস্যার সমাধান তাকে পানি থেকে উদ্ধারের ক্ষমতা। সেই যোগ্যতা অর্জনের জন্যে আত্মশক্তির উদ্বোধন। মানুষ তার চেতন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হলে মানুষ অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। খূদী দর্শনের শিক্ষা দিয়ে ইকবাল সেই ডুবন্ত সমাজকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন।

আমরা দেখেছি, ইকবাল চাদর আবৃত সূফীদের সমালোচনা করেছেন, সামাজিক সমস্যার সংগে সংগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্গে না দাঁড়িয়ে, তা থেকে পালিয়ে বৈরাগী সূফী হওয়ার সাধনাকে ইকবাল এক ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তি ভেবেছিলেন। পারিবারিক বা সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে মানুষ আল্লাহ-নিমগ্ন হলে মানুষের মধ্যে বাস্তবতাকে অস্বীকার করার প্রবণতা বাড়ে। এতে মানুষের কর্মশক্তি দুর্বলতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যদিকে যেখানে আল্লাহ নিষ্ক্রিয়-সেখানে মানুষের স্পর্ধা সীমাহীন হয়, মানুষের স্বাধীনতা সেখানে পাশবিকতার স্বরূপ লাভ করে, সে জন্যে মানুষের আত্মশক্তিকে স্বীকার করে এবং আল্লাহ্র শক্তিকে অস্বীকার না করে ইকবাল তাঁর চিন্তাদর্শে একটা ভারসাম্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন। ইকবাল নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে পংক্তির পর পংক্তি তৈরী করেন যুক্তির প্রাচীর। মনে হয় একদল যুক্তির দলবদ্ধ সৈনিক একটি বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে মার্চ করে এগিয়ে চলেছে। কবিতা যুক্তি নয়, কিন্তু ইকবালের হাতে কবিতা যুক্তি হয়ে উঠেছে। নিজের ধারণাকে তিনি ধুম্রকুণ্ডলিতে আচ্ছন্ন করতে চাননি; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধ ধারণাকে যুক্তি দিয়ে পরাজিত করতে দ্বিধা করেননি। তিনি নীটশে, কান্ট, হেগেল, বার্গসঁ' বা মার্কস ডারউইনের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ আধুনিক পাশ্চাত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি দেখা সত্ত্বেও সেটা ঐ সব দর্শনের আপাতঃ বিজয় বলে ভেবেছিলেন, তিনি তাঁর প্রজ্ঞা দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন যে, এতে শেষ রক্ষার কোন দাওয়াই নেই। তাঁর এই বিশ্লেষিত চিন্তার সঙ্গে ইসলামী দর্শনের সাযুজ্য পেয়েছিলেন বলেই আল্ কুরআনুল করীমে তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল। এটাকে অনেক প্রগতিবাদীরা রক্ষণশীলতা বা সাম্প্রদায়িকতায় উত্তীর্ণ হওয়া বলে সমালোচনা করলেও ইকবাল তাতে ভ্রূক্ষেপ করেননি। কারণ, এটা ছিল ইকবালের বহুচিন্তা ও বিচিত্র-বিবিধ দর্শনের বিজ্ঞানধর্মী বিশ্লেষণের দান। এ ধরনের বাস্তব উপলব্ধি ঘটলে তিনি তাঁর চিন্তার দিক পরিবর্তন করতে পারেন না।

বলা বাহুল্য, খুদী দর্শন বা আত্মশক্তি বর্ধনের যে দর্শনের কথা তিনি মুসলমানের বৈশিষ্ট্য বলে ভেবেছিলেন-সেটা একা মুসলমানের নয়, সেটা মানুষ মাত্রেরই দর্শন। এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন যে, ইসলামের যে বাণী সে শুধু মুসলমান

সমাজ উন্নতির বা তার সমস্যা সমাধানের বাণী নয়, সে বাণী মানব সমাজের কল্যাণের বাণী। ইসলাম যে সাম্য, মৈত্রী বা মানব মুক্তি বা সংস্কার মুক্তির কথা বলেছে মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই। সেই ইসলামকে অনুসরণ করার অর্থ সংকীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা নয় তা মানব কল্যাণের আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। ইকবাল সে জন্যেই নির্দ্বিধায় পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি।

তিনি ব্যক্তিত্ববাদের কথা বলেছেন, আবার ব্যক্তিত্ব বিলুপ্তির কথাও বলেছেন। কিন্তু তাঁর এই ব্যক্তিত্ব বিলুপ্তি ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য। কারণ, সমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থেকে বৈরাগী হয়ে ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করা যায় না। ব্যক্তিত্ব বিকাশেও সামাজিক সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। সমাজ বিচ্ছিন্ন থেকে ব্যক্তি বিকশিত হতে পারে না। কারণ, ব্যক্তিশক্তি মহাশক্তি হয়েও সীমিত শক্তি। সমাজই ব্যক্তিকে পূর্ণতা দান করে। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে জীবন ও সমাজ সংকটকে দূর করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ইকবাল এটাকে জীবন-সমস্যা দূরীকরণের একমাত্র দিক বলে ভাবতে পারেননি, তিনি ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ দৈহিক অনুভূতি মানুষকে শরীর-কেন্দ্রিক ভোগের দিকে আকর্ষণ করে এবং তার পাপকর্ম লোভকে প্রশ্রয় দেয়। এবং সে জন্যই ঐ দর্শনে মানবিকতার কথা উল্লেখিত হলেও তা শেষ পর্যন্ত এমন মানবিকতায় পর্যবসিত হয়। দেখা যায়, সেখানে ধীরে ধীরে মানবিকতার ছদ্মবেশে পাশবিকতা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। এটা হলে সে যে একসময় বিপদে পড়বে– ইকবাল সে কথা বলতে দ্বিধা করেননি। এটা প্রায় ভবিষ্যদ্বাণীর মত কাজ করেছে। ইউরোপের শোষণকামী মনোভাব তার প্রমাণ, তার বিলাসিতা, তার নগ্ন উদ্ধত জীবন তার প্রমাণ ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তার প্রমাণ। ইকবাল স্বাদেশিক জাতীয়তাবাদকে দোষারোপ করেছেন। ইউরোপীয় আদর্শ ও এই জাতীয়তাবাদ বিশ্ব সমাজকল্যাণে যে আঘাত হেনেছে এটা ছিল তাঁর ধারণা। অবশ্য এখানে একটা প্রশ্ন জাগবে যে, তিনি যে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের গান গেয়েছেন তাও কিনা এক ধরনের জাতীয়তাবাদ নয় ? তাঁর পাকিস্তান ধারণা কি তাঁর জাতীয়তাবাদ-বিরুদ্ধ ধারণাকে কিছুটা বিতর্কিত করে তোলে না? ইকবালের কাব্যে এর ব্যাখ্যা নেই ; এখানে তিনি কালের ইতিহাসের শিকার না হয়ে পারেন নি। মানবতার ও শান্তির জন্যে লড়তে গিয়েই তাঁকে এই বাস্তব সত্যের পক্ষ গ্রহণ করতে হয়েছিল। আসলে বঞ্চিতের পক্ষে লড়তে গিয়ে তাঁকে উপমহাদেশের বঞ্চিতের পক্ষ নিতে হয়েছিল। এতে মানবতার পক্ষ নিয়েছেন বলেই আমাদের ধারণা। সাথে সাথে অবশ্য এই প্রশ্ন জাগবে যে, জাতীয়তাবাদের ধারণা শুধু আত্মগর্বিত জাতিত্ব থেকে জন্মায় না– বঞ্চনা, উপেক্ষা ও অবহেলা থেকেও জন্মায়; জন্মায় নিপীড়নের ও অত্যাচার থেকে মুক্তি কামনা থেকেও। এ ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ নিন্দনীয় কি-না সে প্রশ্ন

আসবেই। কিন্তু মনে রাখা দরকার, ইকবাল এই জাতীয়তাবাদকেই ঘৃণা করেননি। তিনি ঘৃণা করেছিলেন হিংসাধর্মী, জিঘাংসাধর্মী, শোষণ ও প্রভুত্বকামী জাতীয়তাবাদকে, যে জাতীয়তাবাদ ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধকে ধ্বংস করে সেই জাতীয়তাবাদকে। অন্যদিকে তাঁর পাকিস্তান ধারণার মূলে ছিল ইসলামের পুনর্জাগরণ ও পুনঃ প্রতিষ্ঠাকরণের মনোভাব। ইসলামের পুনর্বিকাশের জন্যে তিনি একটি ক্ষেত্রের প্রয়োজনবোধ করেছিলেন। সেই ক্ষেত্রটি ভারতের অন্তর্গত হিসাবে থাকলে তার স্বাধীন পথে বিকশিত হওয়ার তিনি সম্ভাবনা দেখেননি।

ইকবালের কাব্যে একটি বিষয় স্পষ্ট। তাঁর কবিতায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যত ভাবনাই থাকুক, তিনি তাকে অস্পষ্টতা বা কপটতা দিয়ে আচ্ছন্ন করতে চাননি। ইসলাম ও মুসলমান, শিক্ষা ও জ্ঞান, ধর্ম ও রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি, নারী ও পুরুষ সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট মতামতকে খাপে ঢেকে তিনি প্রকাশ করতে চাননি। অবসকিউরিটি বা অন্ধকারাচ্ছন্নতা তাঁর কবিতাকে হৃদয়ঙ্গম করতে কোন প্রাচীর সৃষ্টি করেনি। তিনি এমন রূপকের আশ্রয় নেননি, যার তালা খুলতে মল্লিনাথের প্রয়োজন হয়। তাঁর কবিতার দুর্বোধ্যতা তাঁর বাক্যে, ভাষায়-শব্দে বা উপমায় নেই, তাঁর কাব্যের দুর্বোধ্যতা তাঁর ভাবের গভীরতায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দর্শন ও ধর্ম-দর্শনকে তিনি এমন গভীরভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করেছিলেন যে, যন্ত্রপিষ্ট ইক্ষুরসের মত তিনি তা সহজে ব্যবহার করতে পেরেছেন। সে জন্যেই গভীরতম কথাকে সহজতম ভাষায় ব্যক্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে– যেটা অনেক বড় কবিদের একটা বড় লক্ষণ। সেই জন্যে সম্ভবত শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ আমার কাছে সুন্দর বাংলা কবিতা বলে মনে হলেও মনে হয়েছে আমি বোধ হয় সুধীন দত্ত অনূদিত মালার্মে বা বুদ্ধদেব বসু অনূদিত বোদলেয়ার পড়ছি। আমার মনে হয় অতিরিক্ত তৎসম শব্দ ব্যবহৃত ইকবালের কবিতার অনুবাদ ইকবাল চরিত্রের অকপট স্পষ্টতাকে খানিকটা আড়াল করেছে। অবশ্য *'শাশ্বতের গান'* নামে শঙ্খ ঘোষ যে কবিতাটির অনুবাদ করেছেন তার ভাব-গাম্ভীর্যের জন্যে অক্ষরবৃত্তের এই ছন্দকেই শঙ্খ ঘোষ উপযুক্ত বলে ভেবেছেন। তবে যদি ফররুখের অক্ষরবৃত্তে অনূদিত ইকবালের কবিতাগুলো পাশাপাশি রেখে পড়া যায় তা হলে পাঠকচিত্তে সহজপ্রবিষ্ট স্বতস্ফূর্ত ভাষার সঙ্গে শঙ্খ ঘোষের অনুবাদের পার্থক্য কোথায় তা বোঝা সহজ হবে।

প্রয়োজন বলেই এখানে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করছি। ইকবালের কবিতায় আত্মকেন্দ্রিক বা আত্মচিন্তার চেয়ে, ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনার ভাবানুভূতির চেয়ে, সামাজিক বা বিশ্বজাগতিক সমস্যার ভাবনার বেশী করে প্রকাশ ঘটেছে। এবং আমার ধারণা, জীবনের অন্ধকার দিকের চিত্রের চেয়ে আলোর চিত্রকে তিনি বেশী করে এঁকেছেন। এলিয়টের কথাটা এই প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, এলিয়ট বলেছিলেন ঃ বোদলেয়ারের কবিতায় দান্তের নরক

আছে, স্বর্গ নেই। ইকবালের কবিতা সম্পর্কে তেমনি বলা যায় ঃ তাঁর কবিতায় দান্তের স্বর্গ আছে, নরক নেই। তাঁর কবিতায় বীর রস, করুণ রস যতটা আছে ততটা নেই আদিরস বা বীভৎসরস। তাঁর কাব্যে বেদনা আছে, কিন্তু সে বেদনা ব্যক্তির বেদনা নয় তা জাতীয় বেদনা অথবা তা বোধদীপ্ত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির জাতীয় চেতনার বেদনা।

ইকবালের কাব্যে দুষ্ট জীবনের অন্ধ-প্রবৃত্তি একেবারে অস্বীকৃত তা নয়। যে শয়তান ফাউস্টে, প্যারাডাইস লস্টে, বোদলেয়ারের শয়তান স্তোত্রে, নজরুলের 'ধূমকেতু'তে আমরা দেখেছি, সেই শয়তানকে আমরা ইকবাল কাব্যেও লক্ষ্য করেছি। জীবন রহস্যের মূল দ্বন্দ্বে আছে মানবিকতা ও পাশবিকতা। একদিকে আদম, অন্যদিকে ইবলিস। ইকবালের *"জিব্রাইল ও শয়তান"* (ফররুখ আহমদ অনূদিত) *বালে-ই-জিব্রীল*-এ *ইবলিস* (মনিরউদ্‌দীন ইউসুফ অনূদিত) এবং *আরমুগানে হিজাযে* প্রকাশিত *'ইবলিসের পরামর্শ সভা'* (ইবলিস কি মজসি-ই-শূরা (মনিরউদ্‌দীন ইউসুফ অনূদিত) জীবন-রহস্যের অন্তস্থলের বিষয়টিকে ইকবালের চোখ থেকে দূরে রাখেনি। তবে ইকবালের গুরু জালালউদ্দীন রুমী *"মসনভী"*-তে যেভাবে শয়তানী রূপকে এঁকেছেন, ইকবালের কবিতায় শয়তান সে-ভাবে চিত্রিত হতে পারেনি। কিন্তু যখন আমরা ইকবালের *"জিব্রাইল ও শয়তান'* কবিতায় শয়তানকে বলতে শুনি–

"আমার বিদ্রোহী আত্মা জ্বালিয়াছে অনির্বাণ বহ্নিশিখা আদমের বুকে
আমার বিদ্রোহে মুক্ত বুদ্ধি মননের বস্ত্রে ধূলিমুষ্টি চলেছে সম্মুখে।
সত্য অসত্যের দ্বন্দ্বে দ্রষ্টা তুমি দূরবর্তী দূরপ্রান্তে আছো দিবা যামী
প্রমত্ত ঝঞ্ঝার বুকে কে জাগে সংগ্রামী চিত্ত জিব্রাইল! তুমি কিম্বা আমি ?
খিজির সহায়হারা, অসহায় ইলিয়াস সে ঝড়ের প্রমত্ত গতিতে ;
আমার ঝঞ্ঝার পথ সমুদ্রে সমুদ্রে আর তরঙ্গিত নদীতে নদীতে।
তবু তুমি এই প্রশ্ন শুধায়ো আল্লাহ্‌র কাছে পাবে তার যখন দিদার,
মানুষের ইতিহাস উজ্জ্বল হয়েছে আজ অফুরান প্রাণরক্তে কার ?
সর্বশক্তিমান যিনি বিকীর্ণ কাঁটার মত বক্ষে তার জানি যে অম্লান,
চিরন্তন কাল শুধু তোমরা গুঞ্জরি যাও ঃ সুমহান প্রভু সুমহান!

(অনু ঃ ফররুখ আহমদ)

তখন আমরা মানতে বাধ্য হই, সৃষ্টিতত্ত্বের-গূঢ় রহস্য ইকবালের প্রজ্ঞা দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সেই জন্যেই আমরা পূর্বের সেই কথাটির পুনরাবৃত্তি করি যে, ইকবাল শুধু বিশেষ দেশ, কাল, জাতি, সম্প্রদায় ও ধর্মের কবি নন, তিনি চিরকালের, সর্ব-মানবের কবি। তিনি সেই মেধার জগতের কবি-চিন্তা যেখানে সার্বজনীন।

আর একটি প্রসঙ্গ। প্রত্যেক বড় কবি জীবন-সম্পৃক্ত বিচিত্র বিষয়কে বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন। সেখানে থাকে প্রকৃতি, সেখানে থাকে প্রেম, নারী, মানুষ, ব্যক্তি সমস্যা ও জাতীয় সমস্যা।

ইকবাল কাব্যে যতটা ধর্ম, জাতি ও মানবিক সমস্যা স্থান পেয়েছে-ততটা প্রকৃতি ও ব্যক্তি-প্রেম স্থান পায়নি। সে জন্যে নারী তাঁর কবিতায় আসেনি প্রবল বিষয় হয়ে। তবে নারী সম্পর্কিত তাঁর কিছু বক্তব্য তাঁর *"যরবে কলীম"* কাব্যগ্রন্থে দেখতে পাই। যার অনুবাদ করেছেন জনাব আবদুল মান্নান তালিব। সেই কবিতায় বোঝা যায় বোদলেয়ার প্রমুখ কবিদের মত তিনি নারী বিদ্বেষী না হলেও নজরুলের মত নারীর প্রশস্তিতে উচ্ছ্বসিত ছিলেন না। নারীর ব্যাপারে তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিকোণ ইসলামী বিষয় ও আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের নারী স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। সে জন্যে তিনি সমালোচিত হয়েছেন। কিন্তু সে সমালোচনা তিনি গ্রাহ্য করেননি। তাঁর মতে, যে শিক্ষার প্রভাবে নারী তার নারিত্ব হারায়-মৃত্যুবলে তাকে মানুষরা। একটিমাত্র পংক্তিতেই ইকবাল নারীকে কোন্ চোখে দেখতেন তা বোঝা যায়। যখন তিনি বলেন-

"নারির অস্তিত্বেই রঙ্গীন বিশ্ব জাহানের ছবি "

(অনু : আবদুল মান্নান তালিব)

বর্তমান সংকলনে যাঁদের অনুবাদ গৃহীত হয়েছে-তাঁরা হলেন যথাক্রমে- ১. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ২. কবি গোলাম মোস্তফা, ৩. মোহাম্মদ সুলতান, ৪. আশরাফ আলী খান, ৫. অমিয় চক্রবর্তী, ৬. মীজানুর রহমান, ৭. বে-নজীর আহমদ, ৮. মহীউদ্দীন, ৯. আবদুল কাদির, ১০. সুফিয়া কামাল, ১১. আবুয যোহা নূর আহমদ, ১২. ওহীদুল আলম, ১৩. নূরউদ্দীন আহমদ, ১৪. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, ১৫. তালিম হোসেন, ১৬. আহসান হাবীব, ১৭. ফররুখ আহমদ, ১৮. আবুল হোসেন, ১৯. সৈয়দ আলী আহসান, ২০. মুফাখখারুল ইসলাম, ২১. আবদুর রশীদ খান, ২২. মনির উদ্‌দীন ইউসুফ, ২৩. সৈয়দ আবদুল মান্নান, ২৪. সৈয়দ আলী আশরাফ, ২৫. আবদুস সাত্তার, ২৬. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্ ২৭. ফারুক মাহমুদ, ২৮. গোলাম সামদানী কোরেশী, ২৯. আবুল কালাম মোস্তফা, ৩০. নিয়ামাল বাসির, ৩১. আ, ফ, ম, আবদুল হক ফরিদী, ৩২. রুহুল আমীন খান, ৩৩. আ, কা, শ, নূর মোহাম্মদ, ৩৪. শঙ্খ ঘোষ, ৩৫. সত্য গঙ্গোপাধ্যায়, ৩৬. আবদুল মান্নান তালিব, ৩৭. আমীনুল ইসলাম, ৩৮. ফযলুর রহমান, ৩৯. শ্রী মনীন্দ্র দত্ত, ৪০. আল মুজাহিদী, ৪১. হাসনাইন ইমতিয়াজ ৪২. অধ্যাপক সিরাজুল হক, ৪৩. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী এবং ৪৪. মতিউর রহমান মল্লিক।

যাঁদের অনুবাদ বেশী করে সংকলিত হয়েছে –এঁদের মধ্যে আছেন–

১। গোলাম মোস্তফা, ২। ফররুখ আহমদ, ৩। মনির উদ্‌দীন ইউসুফ, ৪। শঙ্খ ঘোষ, ৫। সত্য গঙ্গোপাধ্যায়, ৬। আবদুল মান্নান তালিব।

এঁদের পরে যাঁদের অনুবাদ সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম এঁরা হলেন–

১. মীযানুর রহমান, ২. মহীউদ্দীন, ৩. নূরউদ্দীন আহমদ, ৪. আবুল হোসেন, ৫. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ ৬. ফারুক মাহমুদ, ৭. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী।

এই ১৩ জন কবি ছাড়া বাকী ৩১ জন কবির দু'টি একটি অনুবাদ ছাপা হয়েছে। উল্লেখ্য, দু'একটি কবিতা সংখ্যায় একটি দু'টি হলেও দৈর্ঘ্যে ও আকারে তা বেশ বড়। যেমন আশরাফ আলী খানের *'শেকোয়া'* এবং সৈয়দ আলী আহসান কৃত *'আসরার-ই-খূদী'র* অনুবাদ, কবি মহিউদ্দীন কৃত *'ইকবালের প্রার্থনা'* বা শঙ্খ ঘোষ কৃত অনুবাদ *'শাশ্বতের গান'* অথবা আবুয যোহা নূর আহমদ অনূদিত *নালায়ে এতীম*। অন্যদিকে আবদুল মান্নান তালিব-এর *'যরবে কলীম'*-এর যে-সব অনুবাদ ছাপা হয়েছে তা সংখ্যায় বেশী হলেও আকৃতিতে ক্ষুদ্র। অবশ্যই গুণগত মানে তা ক্ষুদ্র নয়।

ভূমিকার প্রথমদিকে এঁদের অনুবাদ সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য রেখেছি, কিন্তু সংগত কারণেই এবং বক্তব্য বিশদ করার অবকাশ না থাকায়– সকলের অনুবাদ সম্পর্কে এখানে আরও কিছু বেশী আলাচনা করা সম্ভব হল না। গ্রন্থ-অন্তর্গত অনুবাদসমূহ দেখলেই বোঝা যাবে, এখানে যাঁদের অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে যেমন আছেন খ্যাতিমান কবি, তেমনি আছেন প্রধানত গবেষক এবং সৌখিন অনুবাদক। যাঁরা ইকবালের ভক্ত কিন্তু যথার্থ কাব্য প্রতিভার বা নিপুণ কাব্য স্রষ্টার অধিকারী নন। তাঁদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমকে আমরা তাই বলে একেবারে অবজ্ঞা করতে পারব না। কেননা তাঁদের অনুবাদে ইকবালের কবিতার কাব্য-সৌন্দর্য হয়ত নেই, কিন্তু আছে অসাধারণ বাণীর মৌলিকতার সৌন্দর্য, এমনকি অনেকের দুর্বল অনুবাদেও ইকবালের চিন্তার মহিমা এবং অলংকার সৌন্দর্য শূন্যতার নিরসতা দান করেনি। ইকবালের দর্শন ও চিন্তার গভীরতা সেইসব অনুবাদেও ইকবালের মনীষা উজ্জ্বল রত্নের মত দীপ্তি ছড়াচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে আমি আশরাফ আলী খান, গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ সুলতান, ফররুখ আহমদ, মনির উদ্‌দীন ইউসুফ ও সৈয়দ আবদুল মান্নানের অনুবাদের সার্থকতার কথা বলেছিলাম। আমার ধারণা, এ সংকলনের অন্তর্গত কবি মহিউদ্দিন, সৈয়দ আলী আহসান, শঙ্খ ঘোষ, সত্য গঙ্গোপাধ্যায় এবং আবুল হোসেনের অনুবাদও প্রসাদগুণসম্পন্ন হয়েছে। এই অনুবাদকদের কবিতায় ইকবালের ভাব-গাম্ভীর্য যে ব্যাহত হয়নি– সেটা অনস্বীকার্য। বর্তমান সংকলনটিতে ইকবালের যে-সব কবিতার অনুবাদ ছাপা হয়েছে ইকবালের সমগ্র চিন্তা, ভাব ও ভাবনা তার মধ্যে যে প্রতিফলিত হয়েছে– সেটা সুস্পষ্ট।

ইকবালের সমস্ত কবিতা এর অন্তর্গত হতে পারেনি। কিন্তু যা হয়েছে তা সামান্য নয় তা প্রায় সম্পূর্ণ ইকবাল মানসেরই একটি পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। হয়ত এই অনুবাদ মূল উর্দূ ও ফারসী কবিতার রূপ-মাহাত্ম্যের অনুরূপ সৌন্দর্যে বিকশিত হয়নি, তবু ইকবাল মানসের এবং তাঁর ভাবাদর্শের স্বরূপকে যে অনেকখানি তুলে ধরতে সমর্থ হবে– সেটা বিশ্বাস্য বললে অত্যুক্তি হবে না।

কাব্য-অনুবাদ কখনও মৌলিক কবিতার মত হয় না। মূল কবিতার ভাবানুকরণে সেটা একটা ভিন্ন কবিতা অথবা অন্যের ভাব নিয়ে নিজেই একটি মৌলিক কবিতায় পরিণত হয়।

কাব্য-অনুবাদে যেটা সবচেয়ে কঠিন জিনিস, সেটা কবিতার ছন্দ। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথকৃত ইংরেজী অনুবাদও তাঁর বাংলা কবিতার অনুরূপ নয়। বাংলা গীতাঞ্জলি পদ্যছন্দে রচিত, ইংরেজী কবিতা গদ্যছন্দে। এ জন্য প্রায়ই দেখা যায়, বাংলাতে বিদেশী কবিতার যে-সব অনুবাদ হয়েছে তার অধিকাংশই পদ্যছন্দের পরিবর্তে গদ্যছন্দে করা হয়েছে। একটিমাত্র উল্টো উদাহরণ আছে, সেটা হল *হুইটম্যানের Oh pioneer* শীর্ষক *Proseverse* কবিতাকে নজরুল পদ্যছন্দে রূপান্তরিত করেছিলেন। নজরুল ইসলামের আর একটি দুঃসাহসিক কাজ হাফিজের দিওয়ানের মূল ছন্দের হুবহু অনুকরণে হাফিজের কয়েকটি *দিওয়ানের* চিত্তাকর্ষক অনুবাদ। অসাধারণ কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন বলে নজরুলের পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছিল। অন্যথায়, যে-কোন প্রথম শ্রেণীর কবিরাও ঐ ছন্দানুকরণে ঐ কবিতার অনুবাদ করতে গেলে তার কাব্যরসকে অকৃত্রিম রাখা সম্ভব হতো না। এই কাব্যরস ব্যাহত হবে বলে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিকে গদ্যছন্দে অনুবাদ করাকে সময়োপযোগী বা স্থানোপযোগী বলে চিন্তা করেছিলেন। অথবা রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, ইউরোপে গদ্যধর্মী কবিতার যে যুগ শুরু হয়েছিল, সেখানে তার গীতল ছন্দের গীতাঞ্জলি পাঠকচিত্তে অকৃত্রিম আবেদন সৃষ্টি করবে না।

আমরা দেখেছি, মনির উদ্‌দীন ইউসুফ ফেরদৌসীর *শাহনামার* গদ্যধর্মী ভাষায় যে অনুবাদ করেছেন, সেখানে তিনি একটি গতিশীলতা সৃষ্টি করতে পেরেছেন। মৌলিক কবিতার মতই সেখানে দেখা গেছে এক ধরনের স্বতস্ফূর্ততা। এ জন্যই তা পড়তে গেলে পাঠকচিত্তে কবিতা পাঠ যে আবেগের সৃষ্টি কামনা করে, আমরা সেখানে সেই আবেগের উদ্দীপনা সৃষ্টি হতে দেখি। সেখানে শুধু মস্তিষ্ক নেই- আছে হৃদয়। কিন্তু মনির উদ্‌দীন ইউসুফ তাঁর কাব্যপ্রতিভার ব্যবহার করতে গিয়ে ইকবালের পদ্যছন্দের কবিতাকে পদ্যছন্দেই অনুবাদ করেছেন।

প্রথমে *বাংলা একাডেমী* এবং পরে *ইসলামিক ফাউন্ডেশন* থেকে প্রকাশিত *'ইকবালের কাব্য সঞ্চয়নে'* ইকবালের চারটি কাব্যগ্রন্থের নির্বাচিত বেশ কিছু কবিতা অনূদিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে *'বাঙ্গ-ই-দারা'র* ১৯টি, '*বাল-ই-*

জিব্রীল'-এর ১৩টি, *'যরবে কলীম*'-এর ২৫টি কবিতা এবং *'আরমুগান-ই-হিজায*'-এর একটি কবিতা '*ইবলিস কী মাজলিস-ই-শূরা*'।

এই কাব্য সঞ্চয়নের সমস্ত কবিতাই অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্তে অনূদিত। বলা বাহুল্য, এই অনূদিত কবিতাও মনির উদ্‌দীন ইউসুফ অনেকটা স্বতস্ফূর্ততার মধ্যে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। এবং তিনি যে ইকবালের চিন্তাদর্শন থেকে পাঠকের উপলব্ধিতে সহজে প্রবিষ্ট হতে সক্ষম হয়েছিলেন তা তাঁর এই অনুবাদে বোঝা যায় ঃ

পশ্চিমের গণতন্ত্র সে তো সেই সুরের ব্যঞ্জনা
যে সুরে জাগিয়া ওঠে সীজারের অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা।
জুলুম দানব নাচে গণতন্ত্র যবনিকা ধরি,
আহা তুমি ভাব তারে স্বাধীনতা স্বপ্নের সুন্দরী !
প্রজাতন্ত্র পরিষদ সংস্কার দাবী-দাওয়া আর ;
ঘুমের আরক রটে পাশ্চাত্যের রসায়নাগার।
জাতিসংঘ জ্বালাময়ী পরস্পরবিরোধী ভাষণ
পুঁজিবাদীদের সেও সুবর্ণ সংগ্রাম সনাতন।
বর্ণ-গন্ধ-মরীচিকা-এরে তুমি ভেবেছ কানন,
অবোধ এ খাঁচাটিকে ভাবিয়াছ নীড়ের মতন।

(রাজত্ব, জবাব-ই-খিজির)

এটা বাংলা অক্ষরবৃত্তে অনূদিত। কিন্তু ইকবালের বক্তব্যটি মূল ভাষায় যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে, এখানে তার চেয়ে কম আকর্ষণীয় হয়েছে মনে করা কঠিন হবে। (অবশ্য এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, কোন অনূদিত কবিতাই মূল কবিতার অনুরূপ হয় না- কি ছন্দে কিংবা ভাবে।) এইভাবে ইকবালের *প্রদীপ* ও *কবি* (শমা ও শায়ের), *পথের দিশারী* (খিজির-ই-রাহ), *খিজিরের প্রত্যুত্তর* (জওয়াব-ই-খিজির), *লেনিন*, *জিব্রীল* ও *ইবলিস* আবেদনধর্মী হয়ে উঠেছে। তবুও মনির উদ্‌দীন ইউসুফকৃত *'জিব্রীল ও ইবলিস*'-এর অনুবাদ আর ফররুখ আহমদকৃত *'জিব্রীল* ও *শয়তান*'-এর অনুবাদ পাশাপাশি রেখে পড়লে ফররুখের উত্তমতর অনুবাদ দেখে মনে হয় মূল কবিতা নিঃসন্দেহে অধিকতর সুন্দর। অর্থাৎ, এইসব অনুবাদের আকর্ষণীয় মাধুর্য সত্ত্বেও অমিয় চক্রবর্তী কথিত 'মিলের চুমকি বসানো, অনুপ্রাসবহুল চকমকি ছন্দের জোড়া-জোড়া পদরচনার মাঝখানে গীতিকাব্যরসের কাব্যসৌন্দর্য এইসব অনুবাদে শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে অনুপস্থিত থেকে গেছে। সেই অধরা সৌন্দর্যকে রূপদান অসম্ভব বলেই হয়ত অমিয় চক্রবর্তী নিজে তাঁর প্রবন্ধে উদ্ধৃত ইকবাল কাব্যের আংশিক অনুবাদ করেছেন এই ধরনের গদ্যে–

রাষ্ট্রশক্তি মুক্ত হল চর্চের হাত থেকে
য়ুরোপীয় পলিটিকস সেই দানব যার শিকল কেটেছে ;
কিন্তু অন্যের সম্পত্তি যখন দানবের চোখে পড়ে,
চর্চের দূতেরা চলে যুদ্ধ বাহিনীর আগে আগে

(দিন সিয়াসৎ ঃ রাষ্ট্রনীতি)

গোলাম মোস্তফাও ইকবালের বেশ কিছু কবিতার অনুবাদ করেছেন। *'শিকওয়া'* ও *'জবাব-ই-শিকওয়া'* ছাড়াও প্রায় একুশটির মত কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন। তিনিও অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও গদ্যছন্দে ইকবালকে অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনূদিত ইকবালের *'হুদী'* (উট চলার গান) ইকবালের মূল কবিতার ছন্দে অনূদিত বলে তিনি উক্তি করেছেন। অনুবাদটি এমনি–

ওরে পথিক উট আমার–
তাতার হরিণ ক্ষিপ্রতার,
তুই দিরহাম তুই দিনার–
কম-বেশি হয় হোক না তার
জীবন্ত দান তুই খোদার–
জোর কদমে চল রে ফের।
দূর নহে পথ-মঞ্জিলের।
দিলরুবা তুই রূপ মধুর
তোর তরে মোর প্রাণ-বিধুর
পাগলকরা তুই যে হুর
লায়লা-সে তোর ঈর্ষাতুর
মাঠের মেয়ে পায় নূপুর !
জোর কদমে চল রে ফের।
দূর নহে পথ-মঞ্জিলের।

এই অনুবাদকে ব্যর্থতা বলা নিশ্চয়ই উচিত হবে না। পূর্বেই বলেছি, গোলাম মোস্তফার মাত্রাবৃত্তে অনূদিত *'শিকওয়া'* ও *'জবাব-ই-শিকওয়া'* আশরাফ আলী খান ও মোহাম্মদ সুলতানের অনুবাদের মত অনেকটা পাঠকচিত্তহারী। তবুও গোলাম মোস্তফা কৃত *'খিতাব-ব-জাবিদ'* (জাবিদের প্রতি উপদেশ)-এর প্রোজভার্সে বা গদ্য ছন্দে অনুবাদ আমার কাছে বেশী ভাবোদ্দীপক বলে মনে হয়েছে। আমরা যখন *'খিতাব--জাবিদ'* থেকে গোলাম মোস্তফার এই অনুবাদ পড়ি–

যে সিজদার দরুন যমীন কেঁপে উঠেছিল এক দিন
যে সিজদার উদ্দেশ্যেই চন্দ্রসূর্য এখনও ঘুরে মরছে,
পাথর যদি সেই সিজদার ভাব ধারণ করত
পরোয়ানার মত সে হয়ে উঠত প্রেম-দিওয়ানা।

তখন মনে না হয়ে পারে না যে, এই গদ্যছন্দের অনুবাদ ইকবালের কবিতাকে আরও বেশী আধুনিক মনের কাছে এনে দিয়েছে এবং আধুনিক মনস্পর্শী হয়ে উঠেছে। এটা বোঝা যায় তখন, যখন দেখি ফররুখের মত মৌলিক প্রতিভা যখন *'আসরার-ই-খুদী'র* অংশবিশেষের এই অনুবাদ করেন–

সুরভিত হয় বায়ু বন্দী হলে কুসুমের বুকে
সুরভিত হয় মেশক বদ্ধ হয়ে নাভিমূলে কস্তুরী মৃগের,
আকাশে সিতারা চলে প্রাকৃতিক বিধানের নিচে নতমুখে
জেগে ওঠে তৃণদল মেনে পন্থা ক্রমবর্ধনের।

তখন মনে হয় কবি বলে যাঁর কোন পরিচয় নেই সেই সৈয়দ আবদুল মান্নানের গদ্য ছন্দের এই অংশের এই অনুবাদ বুঝি আন্তরিকতায় এবং ভাব প্রকাশে আরও বেশি গতিময়–

বাতাস তখনি হয়ে ওঠে সুরভি,
যখন সে বন্দী হয় ফুলের বুকে।
সুরভি হয়ে ওঠে কস্তুরী,
যখন সে হয় বন্দী
কস্তুরী-মৃগের নাভি-মূলে।
আকাশের তারা চলে তার গন্তব্যপথে
মাথা নত করে প্রকৃতির নিয়মের কাছে।
তৃণও জেগে ওঠে মাথা তুলে
সেও মানে ক্রমবর্ধনের নিয়ম

হয়ত এই জন্য হুইটম্যানের Song of Myself-এর অনুবাদ সৈয়দ আলী আহসান গদ্যছন্দে করেছিলেন নজরুলের মত পদ্যছন্দে অনুবাদ করতে চাননি। উদ্দীপ্তকরণের ব্যর্থতার আশংকায় *'আসরার-ই-খুদী'র* অনুবাদ করেছেন তাঁর নিজস্ব গদ্যছন্দের কবিতার চাতুর্য ব্যবহার করে। হুইটম্যানের মূল ছন্দটা ছিল কাব্যিক গদ্যে রচিত। তাঁর ভাবের স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ গদ্যেই বেশি মানিয়েছে বলে আলী আহসান তাকে অন্যভাবে প্রকাশ করার চিন্তাও করেননি।

উল্লেখ্য, অনুবাদক ধ্যানে, চিন্তায়, মেজাজে ও মানসিকতায় যতই মূল কবির চরিত্রধর্মী হবেন– ততই তাঁর অনুবাদ সার্থকতায় উজ্জ্বল হবে। এদিক থেকে ফররুখই খুব বেশী ইকবালের কাছের মানসিকতার মানুষ। আর এ জন্য তাঁর

অনুবাদও সেই আবেগবলিষ্ঠতায় সবাইকে ছাড়িয়ে উঠেছে। এবং সূচনা খণ্ডের *'আসরার-ই-খূদী'র* তিনি যে অনুবাদ করেছেন, তিনি ব্যতীত সে রকম অনুবাদ করার ক্ষমতা বাংলা কাব্যে তাঁর সমকালে আর কারও ছিল না– নির্দ্বিধায় সে কথা উচ্চারণ করা যায়। ভাষার অন্তরের ভাষা সৃষ্টির মেধা ছিল বলে তিনি আমাদের ইকবালের নিম্নোক্ত অনুবাদ উপহার দিতে পেরেছিলেন–

যদিও কণিকা আমি তবু জানি খরপ্রভা সূর্য সে আমারি,
সহস্র উষার দীপ্তি সংগোপন মোর বক্ষ মাঝে,
জামশীদের পাত্র হতে উজ্জ্বল আমার ধূলি জানে সজ্জা তার
জন্ম যে নেয়নি আলো ধূলিরুক্ষ ধরিত্রীর বুকে।
শিকার করেছে মোর চিন্তাধারা সেই হরিণীকে।

-('আসরার-ই-খূদী' সূচনা খণ্ড ঃ ইকবালের কবিতা)

অথবা

পুষ্পের কোমল পানে নৃত্য করিয়াছ তুমি বংশপরম্পরা,
কোমল শিশিরে ওষ্ঠ সিঞ্চন করেছ তুমি ওগো রক্ত ধারা,
জ্বলন্ত বালুর পারে ছুঁড়ে ফেল আজ আপনারে।
ডুবে যাও, ডুবে যাও জমজমের পুণ্য উৎস ধারে।

(আকাঙ্খা ঃ ইকবালের কবিতা)

সাপ, বৃশ্চিক আর পশুদল-কারো তকদির নয় এমন,
দাস জানি যারা তাদের ভাগ্যে রয়েছে মৃত্যু চিরন্তন।
ইস্রাফিলের আওয়াজ ওদের পারে না তো দিতে ফেরায়ে প্রাণ,
জীবনেও ওরা মরার শামিল, বোঝা বয়ে যায় অপরিমাণ।

(আলমে বরযাখ ঃ ইকবালের কবিতা)

এবং

পাশ্চাত্যের শক্তি সে নয় রোবাব অথবা বেহালাতে
নাই সে শক্তি পর্দাবিহীন নারীর নৃত্য জলসাতে ;
নাই সে শক্তি পুষ্পমুখী ও যাদুকরীদের মায়াজালে,
নাই অভিনব কেশ-কর্তনে, নগ্ন উরুর তালে তালে,
নাই সে শক্তি নাস্তিকতা ও ধর্মহীন মতামতে
নাই সে শক্তি লাতিন হরফে-প্রাচীন লিপির শরাফতে,
জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প থেকে সে পেয়েছে বিশ্বে বিপুল বল,
এ আগুন থেকে চিরাগ সে তার হল রওশন সমুজ্জ্বল।

(পাশ্চাত্যের শক্তি ঃ ইকবালের কবিতা)

এবং

আমার কথা জানে না কেউ জানে না ঐ জ্যোতির্বিদ,
জানে না তার তীরের ফলক কোথায় শিকার কোন ঠিকানা।।
নয় প্রতিচীর সন্ধ্যা রঙিন, রক্তনদী ঐ দূরে
ভোরের পানে দেখ চেয়ে আজও কালের শেষ সীমানা।।

(জামানা ঃ ইকবালের কবিতা)

এসব কবিতা পড়তে পড়তে কখনও মনে হয় না, কোন অনূদিত কবিতা পড়ছি। মৌলিক কবিতার মতই অথবা ফররুখের নিজের কবিতার মতই এগুলো সঙ্গীতরণিত ধ্বনিতে অপরূপ।

এখানে একজনের ইকবালের বাংলা অনুবাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এঁর নাম সত্য গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি ছোট-বড় পঞ্চাশটির বেশী ইকবালের কবিতার অনুবাদ করেছেন। উর্দূ-ফার্সীতে ওয়াকিবহাল এই কবির ইকবালের কিছু অনুবাদ আকর্ষণীয়। তিনি ইকবালের কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতারও চমৎকার অনুবাদ করেছেন। কোন কোন জায়গায় ছন্দপতন ঘটলেও তাঁর অনুবাদের ছন্দে আধুনিকতার স্পর্শ আছে। যদিও আমার মনে না হ'য়ে পারেনি যে, তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত এবং তাদের ছন্দাবেগে আন্দোলিত। তিনি তাঁর অনুবাদে মাঝে মাঝে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করাতে তার স্বাদ ও মেজাজে এক ভিন্নতর রূপ প্রকাশ পেয়েছে। ইকবালের প্রথম উন্মেষের লেখা কবিতাগুলো তাঁকে বেশী উদ্বোধিত করেছে বলে মনে হয়। কিন্তু যে প্রীতির আকর্ষণে তিনি ইকবালের কবিতার অনুবাদ করেছিলেন, পরে সেই শ্রদ্ধাকে তিনি অটুট রাখতে পারেননি। তাঁর গ্রন্থটির ইকবালের বিরাট পরিচিতিমূলক ভূমিকা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা দোষে দৃষ্ট। ইকবালের *'শিশুর প্রার্থনা'* বা *'একটি প্রার্থনা'র* যিনি অনুবাদ করেছেন, তিনি ইকবালকে কিভাবে সাম্প্রদায়িক ভাবতে পারলেন– সেটা আমার কাছে বোধগম্য নয়। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সাথে তুলনা করে চরিত্রগতভাবে তিনি যে ইকবালকে ক্ষুদ্র করার চেষ্টা করেছেন তা বাস্তবিকই দুঃখজনক। তাঁর *'শিশুর প্রার্থনা'* অনুবাদের কয়েকটি পংক্তি এমনি-

প্রার্থনা হয়ে আসিতেছে মুখে যাহা কিছু আমি চাই,
হে খোদা, আমার জিন্দেগী হোক শমাসম রোশনাই।
*　　*　　*　　*
দরিদ্র যারা, মোর কাজ হোক তাহাদের হিমায়ৎ,
দরদীর সনে বিজ্ঞের সনে হোক না মুহব্বৎ।
যা কিছু খারাপ, আল্লা, তা থেকে রেখো গো বাঁচিয়ে মোরে,
যে পথ পুণ্য সেই পথে মোরে নিওগো চালনা ক'রে।

'একটি প্রার্থনা' কবিতা ইকবালের নির্জনতাপ্রিয় প্রকৃতিপ্রেমিক মনটিকে সুপরিচিত ইকবালকে ভিন্নরূপে দেখিয়েছে। এই কবিতা পড়লে ইকবালকে চিরকালের একজন জনপ্রিয় গীতি কবি না ভেবে পারা যায় না।

ইকবাল লিখছেন–

দুনিয়ার যত মহফিল পরে, হে খোদা, তিক্ত আমি,
কিংবা আনন্দ মজলিসে বল প্রাণই যদি যায় থামি।
কলরব থেকে পলায়িত আমি প্রাণ মোর চায় এবে
এমন শান্তি যার কাছে হয় বচনো বিলোপকামী।
শান্তির তরে মরছি আমি গো, বাসনা আমার এই ;
পাহাড়ের কোলে ছোট্ট সে এক কুটির পাই গো আমি।
চিন্তার ভার মুক্ত আমার যবে দিন নিরালায়,
প্রাণ হতে যত দুঃখের কাঁটা হবে গো বহির্গামী।
সরোদের মতো হবে উত্তম বিহঙ্গ কলতান,
ঝর্ণাধারার কলরোলে সেথা আসে সঙ্গীত নামি।

পুরনো দু'একটি শব্দ ব্যবহারের দুর্বলতা ছাড়াও এ অনুবাদ প্রাণোচ্ছল বললে বেশি প্রশংসা করা হবে না।

পরবর্তীকালের ব্যক্তিত্ববাদী ইকবাল নিজেকে ছাড়িয়ে উপরে উঠেছিলেন, জাতির বেদনায় নির্জনতা উপাধানে তাঁর অবসর কাটানোর সময় ছিল না। জাতির দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আত্মবিশ্বাস ও শক্তিবাদের সমর্থক। ছোট্ট কুটির করে পাহাড়ের কোলে ঝর্ণার কলরোল আর বিহঙ্গের কলতান শুনে জীবন কাটানোর অলস মানসিকতাকে হৃদয়ে পোষণ করার মানুষ আর তিনি ছিলেন না। তখন তিনি জানতে পেরেছেন–

দুর্বার তরঙ্গ এক বয়ে গেল তীরতীব্র বেগে,
বলে গেল ; আমি আছি, যে মুহূর্তে আমি গতিমান,
যখনই হারাই গতি সে মুহূর্তে আমি আর নাই।

জানতে পেরেছেন–

ব্যক্তির প্রাণ সমাজ সঙ্গ আর কিছুতেই নয়।
সিন্ধুবক্ষে বাঁটে তরঙ্গ আর কিছুতেই নয়।

অথবা

কর উন্নত সত্তা এমন যেন তকদির লেখার আগে
শুধান আল্লাহ বান্দাকে ঃ বল কি বাসনা তোর হৃদয়ে জাগে।

(ফররুখের অনুবাদ থেকে)

বলা বাহুল্য, ইকবালের কাব্যচিন্তার সবচেয়ে বড় অবদান মানুষের প্রচেষ্টা-পরিশ্রমকে অগ্রাধিকার দেয়া। যে কবি জগতের নিগৃহীত মানুষের মুক্তির গান গেয়েছেন, তিনি কখনও সাম্প্রদায়িক কবি হতে পারেন না। পাশ্চাত্য চিন্তার সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব ছিল, কিন্তু তাঁর ভেতর সত্তার ঘুমন্ত মানুষটিকে যে পাশ্চাত্য শক্তিবাদ জাগিয়ে তুলেছিল এবং তাঁর নিজের ধর্ম-সংস্কৃতির দিকে ফিরে তাকাবার এবং তার অন্তস্থলে প্রবেশের অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করেছিল- ইকবাল তা অস্বীকার করেননি।

বাংলা কবিতায় ইকবালের অনুবাদসমূহ যে ইকবালকে অনুধাবন ও উপলব্ধি করার আমাদের যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছে- সেটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। এইসব অনুবাদের সবটা ফিটজিরাল্ডের অনূদিত *রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়ামের* মত গোটা ইউরোপ হৃদয়কে আলোড়িত করার মত হয়ত নয়, কিন্তু সেটা তাঁর কাব্যের অনুবাদ দুর্বলতার জন্য ততটা নয়- যতটা তাঁর চিন্তার দুরূহতার জন্য। চিন্তার ক্ষেত্রে ইকবালের খুদী দর্শন মানব সভ্যতার অগ্রগতির পথে একটি নতুন দ্বার উন্মোচন।

ইকবাল সাহিত্য জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মেধার এক অনিঃশেষিত রত্নাগার। চৈতন্য জাগ্রতকারী এক বলবর্ধক সুরা-যার অবিরাম সংগ্রাম রুগ্নতা, অসুস্থতা, তন্দ্রালুতা এবং নিদ্রামগ্নতার বিরুদ্ধে। যে-সব বিশ্বচিন্তা মানুষকে তার চিরকালের সংকটমোচনে নব মুক্তির পথ দেখিয়েছে, সেই ঋদ্ধ চিন্তার অতলস্পর্শী গভীরতা দিয়ে এবং দিগন্তবিস্তৃত প্রসারতা দিয়ে তাঁর কাব্যসমুদ্র রূপ ধারণ করেছে এবং তাঁকে বসিয়েছে পৃথিবীর মহাকবিদের মাণিক্যখচিত উচ্চাসনে। উর্দূ ও ফারসী ভাষায় যাঁরা তাঁর কাব্য পাঠ করেছেন, তাঁরা সেই আনন্দ অমৃত পান করে জীবনকে ধন্য করেছেন; এবং আমার ধারণা যাঁরা এই অনূদিত কাব্য সংকলন পাঠ করবেন তাঁরা এক মহাজ্ঞানী মহাসাধকের কাব্যসমুদ্রে অবগাহন করার সৌভাগ্য লাভ করবেন। হয়ত এখানে ইকবালকে ভিন্ন পোশাকে দেখা যাবে ; কিন্তু আমরা জানি, পোশাকের ভিন্নতার জন্যে সুন্দরের সৌন্দর্যের যেহেতু হানি হয় না, সেহেতু পোশাক পরিবর্তনে তাঁর আত্মিক সৌন্দর্যও নিঃশেষিত হয় না। বাংলা ভাষার নিজস্ব সৌন্দর্য যে ইকবালকে সামান্যে নামিয়ে আনেনি- আমাদের যাঁদের চোখ আছে তাঁরা সেটা উপলব্ধি করতে সমর্থ হবেন। আমার ধারণা, এই সংকলন বাংলাদেশের কবিতার ক্ষেত্রেও একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। আধুনিক কবিতায় যে নেতিবাচক চিন্তাধারা অনুপ্রবেশ করে তার পেশীকে পৌরুষহীন করে তুলেছে ইকবাল কাব্য-চর্চার ব্যায়াম তাকে পৌরুষ-পেশীতে পরিবর্তিত করতে পারে। তাতে বাংলা কবিতার যে উপকার হবে- তাতে আমি সন্দেহ পোষণ করি না।

ঢাকা
১৫.১.৯৬

শাহাবুদ্দীন আহমদ
১৯৫/১/এ, শান্তিবাগ
ঢাকা- ১২১০

বাঙ্গে দারা

بانگ درا

মুনাজাত

গোলাম মোস্তফা

জাগ্রত আলো অন্তরে দাও হে খুদা, মুসলিমের।
আত্মা তাদের কাঁপিয়া উঠুক, চঞ্চল হোক ফের।।
ফারাণ–গিরির প্রতি ধূলিকণা হোক পূনঃ রওশন।
জাগাইয়া দাও আবার তাদের আগ্রহ জীবনের।।
অন্ধের চোখে ফের তুমি করো নূতন দৃষ্টিদান।
আমি যা দেখেছি তুলে ধরো তাহা আঁখিকোণে তাহাদের।।
স্তব্ধ হৃদয়ে জাগাও তাদের হাশরের কোলাহল।
শূন্য পালকি ভরে দাও প্রেমে আশেক ও মাশুকের।।
পথহারা এই হরিণেরে দেখাও তুমি কাবার পথ।
শহরবাসীর অন্তরে দাও প্রেম সে ময়দানের।।
পথিকদিগের চরণে আবার চলার ছন্দ দাও।
গতির আগুনে পুড়ে যাক যত বিঘ্ন কন্টকের।।
সু–বাইয়া সম গগনচুম্বী লক্ষ্য তাদের হোক।
কূল–ঘেরা নদী আযাদী লভুক মুক্ত–সমুদ্রের।।
আঁধার যুগের বুকে এঁকে দাও প্রেম–কলঙ্ক–দাগ।
লজ্জায় যেন মুখ ঢেকে রয় চাঁদ সে আসমানের।।
আমি বুল্‌বুল্‌ কাঁদি বসে এই ফুলঝরা বাগিচায়।
হে দাতা, তাছির হয় যেন কিছু আমার ক্রন্দনের।।

মদনিয়াৎ-ই-ইসলাম

(ইসলামী তমদ্দুন)

গোলাম মোস্তফা

শুনবে কি ভাই মুসলমানের জিন্দিগী কী রূপ?
সংগ্রাম আর উন্মাদনার রূপ সে অপরূপ।
সূর্য তাহার এক আকাশে হয় ত ডুবে যায়
আরেক আকাশ রাঙা করে ফের সে হেসে চায়।
শুধুই কেবল যুগ-যমানাই মিছাল হবে তার–

বিচিত্র সে নিত্য নূতন দৃশ্য চমৎকার।
বর্তমানের দৈন্যে তাহার নাইক শরম ভয়
অতীত্ যুগের খুশ-খেয়ালেও মশ্‌গুল সে নয়।
চিরন্তনের ভিত্তি পরে তাহার বুনিয়াদ
জিন্দিগী সে- আফলাতুনের নয়ক মায়াবাদ।
জিব্রাইলের মতই তাহার রূপ-পিয়াসী প্রাণ
সত্য এবং সুন্দরেরই করে সে সন্ধান।
আযমের সে প্রাচুর্য আর দৈন্য আরবের-
এই হ'ল তার সত্য স্বরূপ ভিত্তি জীবনের।

তারানা-ই-মিল্লি

(জাতীয় সঙ্গীত)

গোলাম মোস্তফা

আরব আমার, চীনও আমার, পর নহে সেও হিন্দুস্তান।
মুসলিম আমি বিশ্ব- প্রেমিক, ওতান্ আমার সারা-জাহান।।
আমার সিনায় লুকানো রয়েছে পাক আমানত তৌহিদের
হিম্মৎ কার দুনিয়া হইতে মিটায় আমার নাম-নিশান।।
এই দুনিয়ার বুৎখানা তলে আমারি প্রথম খুদার ঘর
আমি আছি তার পাসবান আর আমার পরেও সে পাসবান।।
তেগের ছায়ায় লালিত হইয়া বড় হইয়াছি আমি যে ভাই
আল-হিলালের খঞ্জর তাই আমার কওমী পাক-নিশান।।
আমার আযান ধ্বনিছে আজিও দূর-দিগন্তে মাগ্‌রিবের
থামেনি আমার গতি কোথাও-চির-দুর্বার শক্তিমান।।
আস্‌মান, বল, মিথ্যা-বাতিলে আমি কি কখনো করেছি ডর?
যুগ যুগ ধরি শত বার করে হয়েছে আমার ইম্‌তিহান।।
সে-দিনের কথা মনে আছে কি গো আন্দালুসের হে গুলবাগ,
যে-দিন তোমার শাখায় শাখায় বাসা বেঁধে মোরা গাহিনু গান।।
দজ্‌লার ঢেউ, তোমার সাথেও চির-পরিচয় রয়েছে মোর
মোর কাহিনীর ঝংকারে আজো তোমার দরিয়া স্পন্দমান।।
হে পাক-যমীন, তোমার শিরায় আজো বহিতেছে মোদের খুন
জান্ দিছি মোরা তোমার লাগিয়া রাখিতে তোমার মহিমা-মান।।

এই কারোয়াঁর সিপাহ্-সালার আমার পিয়ারা নবী-করিম
যাঁহার নামের স্পর্শে আমার শীতল হয় যে দিল্ ও জান।।

উটের গলার ঘন্টা-ধবনি এই তারানা সে ইক্‌বালের
চলেছে আবার কাফেলা আমার- মুয়াজ্জিনের শোন্ আযান্।।

বালাদ-ই-ইসলাম

গোলাম মোস্তফা

দিল্লী

দিল্লী- সে আমাদের ব্যথা-মসজিদ
এখানে ঘুমায় কত আশা-উম্মিদ।
এ-পাক যমীন্ কেন পাবে নাক মান?
এখানে রয়েছে কত মহিমার দান।
শুয়ে আছে হেথা কত বাদশা-ফকীর
শৃঙ্খলা দিল যারা সারা ধরণীর;
তাদের কাহিনী আজো পরান মাতায়,
সব গেছে, তবু স্মৃতি নাহি যায়।

বাগদাদ

দিল্লীই নহে শুধু- বাগদাদও ভাই
মুসলিম-গৌরব- মহিমার ঠাঁই।
এ-বাগান ছিল কত শোভায় অতুল
এই খানে ফুটেছিল হেজাযের ফুল।
এ-বাগান এরেমের দিয়েছে হরষ
নায়েব-ই-রসূলদের পেয়েছে পরশ!
এই দেশ ছিল এক নয়া গুল্‌শান্-
এর প্রতি-ফুল ছিল প্রতিটি বাগান।
যাদের প্রভাবে রোম কেঁপেছিল হায়
তারা আজ এইখানে নীরবে ঘুমায়!

কর্ডোভা

কর্ডোভা আমাদের ছিল আঁখি-নূর
মাগ্‌রিবী যুল্‌মাতে যেন কোহেতূর।

আজি আর নাই তার শিখা সে জ্যোতির
মরীচিকা ছেয়ে আছে নব-প্রগতির!
ইউরোপে দিল আলো দীপ-শিখা যার
সে -দীপ নিভিয়া গেছে– নেমেছে আঁধার!

কুস্তুনতুনিয়া

কুস্তুনতুনিয়ার ছিল খুব নাম
কাইজার বাদশার শক্তির ধাম।
এল সেথা মেহ্দীর নব অভিযান
বুকে তার উড়াল সে বিজয়-নিশান।
এর মাটি পাক সেই হেরেমের প্রায়
যেখানে সূরের নবী নীরবে ঘুমায়!

মধুময় ছিল এর আকাশ-বাতাস,
আবু-আয়ুবের ছিল এইখানে বাস।
ইসলামী মিল্লাৎ ছিল এর পর–
বহু যমানার খুনে গড়া এ নগর

মদীনা

হে পাক্ মদীনা ভূমি, নাই তব তুল,
তোমার বুকেতে সুখে ঘুমায় রসূল।
হজ্-ই-আকবর যথা কা'বার কাছে
তোমার দিদারে সেই মহিমা আছে।
সৃষ্টির আংটিতে নগিনার প্রায়
তুমি শোভিতেছ চির-জ্যোতির আভায়।
আশ্রয়-স্থল যিনি সারা-ধরণীর
তুমি দিলে আশ্রয় সেই নবীজীর।
তারি উম্মৎ গেল ছড়ায়ে ধরায়

জামশেদ কাইজার লুটাইল পায়।
মুসলিম চায় যদি স্বদেশ-ভূমি–
ইরান কি শাম নয়– সে হবে তুমি।
হে পাক্ মদীনা, তুমি চির-দিবসের
আশ্রয়-ভূমি সারা মুসলমানের।
তারে আজ তব বুকে ফের টেনে নাও,
তোমার প্রেমের বাণী তাহারে শুনাও।
প্রভাত আসিলে যথা শিশির আসে
মোরাও তেমনি রব তোমার পাশে।

ওয়াৎনিয়াৎ

(স্বাদেশিকতা)

গোলাম মোস্তফা

এই যমানায় বহুৎ বহুৎ জাম ও সাকী দেখতে পাই,
কতই নূতন প্রেম-তরীকা,– কে করে তার শুমার ভাই!
মুসলিমেরাও বানিয়েছে এক নূতন হেরেম– কী অদ্ভুত।
নয়া তমদ্দুনের আযর গড়িয়ে দেছে অনেক বুৎ।
সে-সব তাজা খুদার সেরা মূর্তি সে ভাই দেশ-মাতার
পির্‌হান্ তাহার কাফন মোদের মজ্‌হাব এবং সভ্যতার।
নূতন তমদ্দুনের গড়া ওয়াৎনিয়াতের সেই সুরৎ।
তৌহিদেরই ঝান্ডাবাহী মরদ্-ই-মুমিন্– তোমার নাম,
লকব তোমার 'মুস্তফাবী'– ওতান তোমার দীন্-ইসলাম।
দেখাও তুমি দৃশ্য মোদের অতীত্ যুগের সেই কাবা'র
মিথ্যা বাতিল দেবদেবীদের লোপাট করে দাও আবার।
স্বদেশ মাঝে বন্দী হলে মরবে তুমি– সে নির্ঘাৎ
নীল-দরিয়ার থাকবে তুমি মাছের মতন দীল্-আযাদ।
দেশ-বর্জন– সুন্নত ভাই মোদের প্রিয় নূরনবীর

সেই সুন্নত আদায় করা ফরয তোমার জিন্দিগীর।
সিয়াসাতের ভাষায় ওতান ধরে সে এক নূতন রূপ
নবুয়তের ভাষায় তাহার অর্থ হল অন্যরূপ।
এক জাতি যে আরেক জাতির দুশমন্–তার মূল ত এই,
দেশ-বিজয়ের নেশাও আসে এই স্বদেশের প্রেম থেকেই।
রাষ্ট্র থেকে ধর্ম যে আজ পৃথক– তারও এই কারণ
এতেই করে সবল'রা ভাই দুর্বলদের আক্রমণ।
ওয়াৎনিয়াতের তরেই আজি খন্ডিত সব মানব-জাত
দীন্-ইসলামের কওমিয়াতের জড় কেটে দেয় ওয়াৎনিয়াৎ।

শামা ও শায়ের

(মোমবাতি ও কবি)

গোলাম মোস্তফা

শায়ের

কাল রাতে মোর মোমবাতিরে বলনু ডেকে মোর পাশে ঃ
পতঙ্গরা কতই আসে তোমার রঙিন কেশ-পাশে।
মেঠো ফুলের মতন নীরব একলা জ্বলে আমার দ্বীপ;
নাইক' আমার কুঞ্জ-ভবন, নাই জলসার খুশ্-নসীব্।
তোমার মতই জ্বল্ছি আমি, ফেলছি কতই অশ্রুজল;
কেউত' তাতে দেয় না সাড়া, দহন আমার হয় বিফল।
কত রঙিন স্বপ্ন ও সাধ জেগে আছে মোর প্রাণে,
তবুত' কেউ দিল্-দিওয়ানা আসে না মোর সন্ধানে!
কোথায় পেলে এই জৌলুস্– দূর আকাশের সূর-মেশা
মুসার মতন পতঙ্গদের চক্ষে দিলে রূপ নেশা?

শামা

যে-নিশ্বাসের তরঙ্গ-দোল মৃত্যু আনে মোর তরে,
সে-নিশ্বাসই তোমার ঠোঁটে ছন্দ সুরে গান করে।

দহন–সে ত' স্বভাব আমার, অন্য আশা নাই ক' তায়,
পতঙ্গদের মন-ভুলানো তোমার শিখার অভিপ্রায়।
আঁসুর তুফান অন্তরে মোর, তাই বহে মোর অশ্রুধার,
শিশির সম অশ্রু তোমার–ফুল-ফোটানোই লক্ষ্য তার!

প্রভাতে তাই সার্থক হয় আমার রাতের রক্তদান,
অনিশ্চিত সম্ভাবনায় গাইছ তুমি তোমার গান।
লোক-দেখানো কাঁদন, সাচ্চা দরদ নাই হিয়ায়,
তোমার আলো তাইত' মাঠের লালা-ফুলের প্রদীপ প্রায়।
ভেবে দেখ, তোমার মুখে সাজে কি আর সাকীর নাম?
মাহ্‌ফিল্ ত' প্রেম-পিয়াসী, কোথায় তোমার শরাব-জাম?
ধর্ম-স্বভাব তোমার সে এক, করছ তুমি আর-এক কাজ,
তোমার ঝুটা বদ্ চেহারায় আর্শিও তাই পায় যে লাজ।
বগল-তলে কা'বা তোমার, তুমি প্রেমিক বুৎখানার,
তবু তুমি বে-পরোয়া–লজ্জা-শরম নাই তোমার?
কায়েস কভু জন্মাবে না তোমার প্রেমের মাহ্‌ফিলে,
লায়লা কভু আসবে না ক' তোমার ছোট মঞ্জিলে।

ঢেউ-এর দোলায় জন্ম তোমার, হে দরিয়ার লাল মোতি,
তুফান তোমার নাই ক' এখন, তাই তোমার এই দুর্গতি।
কী ফল বল তোমার গানে বিরান যখন গুলিস্তান?
তোমার গানের নয় এ সময়, তোমার গানের নয় এ স্থান।
ছিল যারা প্রেমিক তারা নিয়েছে আজ সব বিদায়,
এখন তুমি দাওয়াৎ দিলে কেউ কি তাতে আসবে হায়!
সভা যখন ভেঙে গেছে, বিদায় নেছে প্রেমিক দল,
তখন তুমি শরাব– হাতে আসলে কী আর ফল্‌বে ফল?
শুকিয়ে গেছে ফুল যেখানে, ব্যর্থ সেথায় সকল গান;
দখিন হাওয়া এলেই বা কী? সাড়া দেবে কাহার প্রাণ?
রাতের শেষে হাজার তারার কুরবানি হয় আকাশ-গায়,

সকাল বেলার ছাদ থেকে কি সেই ছবি কেউ দেখতে পায়?
পতঙ্গদের কাম্য যে-রূপ, নাই তোমার সেই রূপ উজ্জল,
প্রেমিক যদি আসেই এখন, কী ফল তাতে? সব বিফল!
ঘুমিয়ে গেছে ফুলকুঁড়িরা, তোমার বাঙ্গ-ই-দারা শুনবে কে?
প্রেমিক হয়েও দিল্ যে তোমার নয়ক ব্যথায় রঞ্জিত,
পতঙ্গরা তাইত' তোমার সেই বেদনায় বঞ্চিত।
তস্বী– মালার দানাগুলো ছড়িয়ে কেন রয় এখন?
বিদায় নেছে দুঃসাহস আর আকাশচারী তোমার জ্ঞান,
দিওয়ানা নাই, জ্ঞানীও নাই, তোমার সভা তাই বিরান।
অন্তরে নাই দহন তোমার, রূপ-শরাবও নাই ক' আর;
পতঙ্গদের চাইছ কেন? তাদের তোমার কী দরকার?
সাকী তুমি, মানছি আমি, করবে কারে শরাব দান?
শরাব-খানা কোথায় তোমার? করবে কে আর শরাব পান?
কাল ছিল যে শরাব-রঙিন, আজ ভাঙা সেই পাত্র হায়,
নীরবে সে কাঁদছে বসে তোমার প্রেমের আস্তানায়!
আশিক্-মাশুক্ ছিল যেথায়, বাজ্‌ত যেথায় প্রেমের বীণ,
পুরানো সেই খান্‌কা এখন মলিন মুখে কাটায় দিন।
এই কাফেলা স্তব্ধ এখন, উঠছে না তার চলার গান,
আফসোস্! তার ধবংস দেখে কাঁদছে না আজ কারোই প্রাণ।
কালকে যারা করলো আবাদ বিরান মুলুক এ- বিশ্বের,
তাদের আপন আবাদ-ভূমিই বিরান হল আজকে ফের!
যে-নামাজে উঠত নিজে বিজয়-বাণী তৌহিদের,
আজ সে নামাজ ঠিক যেন সে অঞ্জলি ভাই ব্রাহ্মণের!
শান্তি ও সুখ আইন-কানুন শৃঙ্খলারই মধুর দান,
তরঙ্গদের স্বাধীনতাই তরঙ্গদের মৃত্যুবান।
যাদের দিদার পাবার আশায় ব্যাকুল ছিল খুদার নূর,
খুদার রহম তাদের থেকে আজকে দেখি অনেক দূর।
হাজার হাজার বুলবুলি যার উড়ত সুখে আসমানে,
কোন্ খেয়ালে বাসায় এসে বসল তারা– কে জানে!

বিশ্ব-নয়ন ঝল্‌সে দিত বিজ্‌লি-চমক যাদের হায়,
মেঘস্তূপের মধ্যে সে আজ শান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে যায়!

ফুলের শোভা দেখতে কেন যাব আমি ফুলবনে?
আঁচল-ভরা ফুল যে আমার অশ্রুধারার বর্ষণে।
সুব্‌হে-ঈদের দিচ্ছে খবর আজকে মোদের দুখের সাঁঝ,
আশার আলো দেখছি দূরে আঁধার-রাতের বুকের মাঝ।
হেজায-ভূমির প্রেমিক যারা, শোন সে এক খুশ্ খবর ঃ
গাফিল্‌রা সব জাগছে আবার অনেক দিনের ঘুমের পর।

আপন মানের মূল্যে তুমি কিনতে পরের দ্রব্যভার,
তোমার মালের দোকানে আজ জুটছে আবার খরিদ্দার।
পড়ছে টুটে যাদুর মায়া অপর জাতির তাহ্‌জীবের,
বিপ্লবী এক নূতন আওয়াজ শুনছি দূরে ইসলামের।
বিশ্ববাসী চাইছে এখন তোমার নূতন প্রেম-শরাব,
মাগ্‌রিবী ওই শরাব তাদের করেছে ভাই দিল্ খারাব।
চুপ থেকো না এখন তুমি, নগমা শুনাও– হও প্রকাশ।
অরুণ-আলোর শরাব কাঁধে ওই আসে ভাই পুব-আকাশ।
পরের ব্যথা বুঝতে শিখ, ব্যথার ব্যথী হও তাদের,
মন দিয়ে আজ গ্রহণ কর এই বাণী মোর অন্তরের।
শায়েরী– সে নবুয়তের অংশ– তাহার অনেক দাম,
মিল্লাতের এই মাহ্‌ফিলে দেই ফিরিশ্‌তাদের সে-পয়গাম।

নূতন কিছু দেখাবে– এই দিবি দিয়ে তোমার চোখ
দাও খুলে আজ, সৃষ্টি কর নূতন আশার স্বপ্নলোক।
বিলাসিতার মায়ায় তোমার শক্তি-সাহস নাই মনে,
দরিয়া ছিলে তেপান্তরে, ঝর্ণা হলে ফুলবনে!
নিজ স্বভাবে ছিলে যখন, শান্ত ছিল দিল্ তোমার;
গন্ধ যখন ফুলহারা হয়, তখনই হয় বে-কারার।

বিচিত্র এই মানব-জীবন, ঠিক যেন একবিন্দু জল,
কভু শিশির, কভু আঁসু, কভু বা সে মুক্তাফল।
আবার গড় জীবন তোমার, জীবন অতি মূল্যবান;
একঘেয়ে যে স্তব্ধ-জীবন, কে করে তায় কদর দান?
ঐক্য যখন ছিল তোমার, আসন ছিল মর্যাদার
ঐক্য যখন গেছে তোমার, শেষ নাহি আর লাঞ্ছনার।
মর্যাদা পায় ব্যক্তি যখন রয় সে বুকে মিল্লাতের
ঢেউ-এর মরণ হয় তখনি-বাইরে এলে সমুদ্রের।
অন্তরেতে গোপন রাখো তোমার শরাব্ মুহাব্বৎ,
বোতল মাঝে বন্দী হয়ে হও কেন ভাই বেইজ্জৎ।
মুসার মতন তাঁবু ফেলে থাকো আপন দিল্-সিনায়,
ভুল করো না অন্ধকারে তোমার আলোর অন্বেষায়।

জানুক প্রদীপ শেষ নতীজা কী আনে তার অত্যাচার ঃ
পতঙ্গদের ছাই এর পরেই ভিত্তি রচে প্রভাত তার।
চাও যদি মান, সাকীর কাছে চেয়ো না আর শরাব ফের;
সাগর বুকেই থাক্ পিয়ালা উপুড় করা বুদ্বুদের।

পুরাতন এই শুষ্ক মাঠের নাইক' কোনই আকর্ষণ,
নূতন যমীন্ আবাদ কর– আছে তোমার সখ যখন।
মাটির লেখা ভাগ্যে তোমার আছেই যখন পরিষ্কার,
বীজের মতন মাটি হতেই উর্ধ্বে তোল শির তোমার।
পুরাতন এই বৃক্ষ-শাখায় রচ আবার নূতন নীড়,
মন-মাতানো গান গেয়ে এই মাহ্ফিলে ফের জমাও ভীড়।
এই বাগিচার বুলবুলি হও, না হয় ত' হও খামুশ্ ফুল,
হয়ত কাঁদো কাঁদার মতন, নয়ত ধর অন্য কূল!
শিশির সম চুপটি ক'রে থাকবে কেন গুল্‌শানে?
বিশ্ব-বীণার সুর যে তুমি, দাও দোলা আজ সব প্রাণে।
কিষান, তোমার হোক পরিচয় আপন হকিকতের সাথ–
বীজও তুমি, ক্ষেতও তুমি– ফসল-ফলান তোমার হাত।

কার তালাশে আজকে তুমি পথ হারালে, জানতে চাই,
পথিক তুমি, পথও তুমি, মঞ্জিলও ত' তুমিই ভাই!
তুফান ভয়ে আজকে তোমার দিল্ কেন ভাই হয় আকুল?
মাঝি তুমি, দরিয়া তুমি, কিশ্‌তি তুমি, তুমিই কূল।
মনের গোপন গহন-তলে দৃষ্টি মেলে দেখ্‌না তুই–
লায়লা-কায়েস্ মেহ্‌রাব্-মাঠ– তুই-ই যে ভাই সব-কিছুই।
ওরে নাদান, আজকে তুমি করছ সাকীর পায়রবী,
সাকী শরাব মহ্‌ফিল জাম– তোমার মাঝেই রয় সবি।
অগ্নি-শিখা তুমি যে ভাই, অসত্য সব জ্বালিয়ে দাও,
মিথ্যারে ভয় করবে কেন? সত্য-আলোর গান সে গাও।

যুগ-যমানার আর্শি তুমি, রাখ কি ভাই তার খবর?
তুমি খুদার শেষ-পয়গাম– থাকবে কায়েম নিরন্তর।
সঠিক স্বরূপ চেনো তোমার, ওরে নাদান অর্বাচীন,
কাৎরা তুমি, তবু তুমি সমুদ্র– সে অন্তহীন।
অক্ষমতার মন্ত্রে তুমি থাকবে কেন ভয়-বিভল?
ঘুমিয়ে আছে তোমার মাঝে অসীম সাহস মনের বল।
আঁ-হুযুরের প্রিয় বাণীর রক্ষক সে দিল্ তোমার,
জগত মাঝে জাহির-বাতিন আজও শাসন চলছে যার।
তেগ্-তলোয়ার ছাড়াই যারা বিশ্ব-জাহান করল জয়,
সেই হাতিয়ার আজও আছে তোমার কাছে, কিসের ভয়?
ফারান-গিরির স্তব্ধতা দেয় সাক্ষ আজও সেই কথার,
ওরে গাফিল, মনে কি নাই সেই সেদিনের অঙ্গীকার?
মূর্খ তুমি, গোটা কতক ফুলেই তোমার ভর্‌ল প্রাণ!
চাইতে যদি, মিলত তোমার সবটুকু এই ফুল-বাগান।

আমার কথার অন্তরালে পাচ্ছে প্রকাশ মোর বেদন–
বোতল-মাঝে শরাব যেমন প্রকাশ হয়েও রয় গোপন।
প্রজ্বলিত সুরের আগুন জ্বালিয়ে দেছে জীবন মোর,
লক্ষ্য আমার এই জীবনের তাই ত' দহন অশ্রুলোর।
অগ্নি-সুরের ভেদ বুঝে নাও আমার গোপন অন্তরের,
আমার দিলের আর্শিতে ভাই মুখ দেখে নিজ তক্‌দীরের।

প্রভাত-আলোয় রঙিন হবে মোদের আকাশ-তল আবার,
দূর হবে এই মরীচিকা- রাতের কালো অন্ধকার।
শীতের শেষে বসন্তবায় আবার এসে গাইবে গান,
ফুল-কুঁড়িরা ফুটবে আবার, হাসবে আবার গুলিস্তান।
এই বাগানের ফুলের সাথে মিশবে আরও অনেক ফুল
দুলবে আবার শাখায় শাখায় ভোরের বায়ু দোদুলদুল।
আমার ঝরা শবনামে ভাই জাগবে ব্যথা ফুলবনে
ফুল-কুঁড়িরা মেলবে আঁখি নূতন আশার স্পন্দনে।
চলবে ব'য়ে চিরদিনের গতি-স্রোত এই সমুদ্রের,
এই গতি-বেগ রুদ্ধ করার শক্তি নাই তরঙ্গের।
ধর্ম-নীতির পড়বে ছায়া সবার মনের অঙ্গনে,
শির লুটাবে আবার সবাই কারা-ঘরের প্রাঙ্গণে।
শিকারীদের আওয়াজে ফের উঠবে জেগে সব পাখী,
দুশ্‌মনদের রক্তে রাঙা হবে আবার ফুল -সাকী।

ভাষায় ধরা দেয় না আমার মনের কোণের গোপন ভাব,
এই দুনিয়ায় আসছে আবার নও-যমানার ইনকিলাব।
দূর হবে এই রাতের আঁধার, সূর্য হেসে উঠবে ফের-
এই বাগিচা মুখর হবে সুরে সুরে তৌহীদের।

পুত্র জওয়াবদের প্রতি

আবুল হোসেন

প্রেমের অমর রাজ্য, হে পুত্র আমার, বাঁধো ঘর।
নতুন সকাল আনো, আনো নয়া সন্ধ্যার খবর,
নতুন জমানা আনো। প্রকৃতিরে বোঝ হৃদয়
যদিও পাও, যদি খোদা কৃপা করে তোমার উপর
ফুলের স্তব্ধতা থেকে পয়দা করো তোমার কালাম।

কাঁচের ব্যাপারী সে পশ্চিম মুছে ফেলো তার নাম।
খোঁজোনা ঐশ্বর্য তার, ভঙ্গুর যা' কাঁচের মতন,
প্রচুর প্রাণের সোনা সে মৃত্তিকা করেছে বহন
ভারতের সে মাটিতে বানাও তোমার মীনা-জাম।
আঙ্গুর আমার গান নুয়ে-পড়া ফলন্ত শাখায়—
সে দ্রাক্ষা নিঙাড়ি আনো সুরা-সুধা ধারায় ধারায়।
আমিরী আমার নয়। ফকিরের তরীক আমার।
আত্মারে দিওনা যেচে। নাই থাক রূপের বাহার,
নকল সোনার মোহ। নাই হলে চেকনাই ক্লীব।
যে দরবেশ দুনিয়ার পরোয়া করে না, কিংবা নাম
করে না জাহের। চাও, পাও তুমি সে খোশ নসীব।

কোন যুবকের প্রতি

আবুল হোসেন

সোফা তোমার ইউরোপের, গালিচা ইরানের—
এমনি বিলাসিতা যখন দেখি তরুণদের
মগজে খুন চাপে আমার। কিসের এতো জাঁক?
কি দাম ধন-দৌলতের, কিসের পেটা ঢাক?
কি হবে ফাঁকা শাহানশাহী এ শান-শওকত
বাহুতে যদি না থাকে কারো আলীর হিম্মত?
যদি না পারো দুনিয়াটাকে সুলেমানের মতো
দু'পায়ে ঠেলে ফেলতে তবে দেমাগ কেনো অতো?
মুসলিমের মেরাজ সেই আসক্তিহীনতা
কোথায় পাবে চকচকে একালের সভ্যতা?

জাগে যখন যৌবনের শ্যেনদৃপ্ত প্রাণ
দেখে আপন মন্‌জিল সে অসীম আসমান।
আশা অমর। ধ্যান-জ্ঞানের মৃত্যু হতাশায়;
মনের চাবিকাঠি খোদার মোমিন শুধু পায়
তোমার নীড় নয় শাহের প্রাসাদ গম্বুজ,
শাহীন তুমি, বাঁধবে বাসা পাহাড় চূড়া খুঁজে।

মোল্লা ও বেহেশত

আবুল হোসেন

শ্রদ্ধেয় সেই পীর সাহেবকে যখন দেয়া হল
স্বর্গে আসার খোদার দেওয়া হুকুম নামাখানা
আমি তখন সেখানটাতে হাজির ছিলাম বলে
অবাধ্য এ কণ্ঠ আমার শুনলো না আর মানা।
জোড় করে হাত খোদার কাছে আরজি করি পেশ;
তফছীর আমার মাফ করবেন পরোয়ারদিগার,
বেহেস্তের হুরপরী তো ওর লাগবেনাকো ভালো,
গুল বাগিচা শরাব কিছুই সইবে না যে তার;
কারণ ঝগড়া ফ্যাসাদ লড়াই করাই স্বভাব যার
ফিরদৌসে নাই এমনি ধারা একগুঁয়েদের ঠাঁই
এবং তোমার এ' মহাজন কসম খেয়েছেন
নিত্য নূতন কলহ আর কোন্দল তার চাই।
সারা জীবন কাজ ছিল ওর গুলিয়ে দিয়ে মাথা
রাজার সাথে রাজার এবং প্রজার গোল বাধায়
স্বর্গেতো নাই মসজিদ, নাই গির্জা ও মন্দির
কি বদনসীব, এমন দেশে প্রাণরাখা ওর দায়।

খোদার দুনিয়া

আবুল হোসেন

মাটির আঁধার গর্ভে লালন করে কে লক্ষ বীজ?
সমুদ্রের ঢেউ থেকে আকাশে তোলে কে কালো মেঘ?

পশ্চিম পাহাড় থেকে ডেকে আনে কে মধুর হাওয়া?
এ' সোনার মাঠ কার? কার ওই সূর্যের স্বচ্ছ আলো?
মুক্তার দানায় ভরে কে সোনালী ফসলের শিষ?
মাসগুলো ঘুরে ঘুরে আসে কার অমোঘ আদেশে?

এ' জমি তোমার নয়, হে ভূস্বামী, তোমার তো নয়,
নয় পূর্বপুরুষের, তোমার আমার কারো নয়।

প্যারির মসজিদ

আবুল হোসেন

স্থপতির কারিগরি ছাড়া
এখানে দেখার আছে কী আর এমন,
পাশ্চাত্যের এ এবাদৎগায়?
এখানে খোদার নাম গন্ধ নাই আর।
কোথায় মস্‌জিদ?
ফিরিঙ্গী ওঝারা সব মস্‌জিদের এ পাথুরে শবে
দিয়েছে পূজোর প্রাণ ভরে।
তাছাড়া তুলেছে কারা এ মূর্তি–মন্দির?
সেই একই দস্যুরাই
করছে দামাস্কাসকে মরুভূমি যারা।

য়ুরোপ ও সিরিয়া

আবুল হোসেন

সবচেয়ে সাচ্চা সৎ, মানুষের ব্যথায় কাতর
সিরিয়া ফিরিঙ্গীদের দিয়েছিলো সে পয়গম্বর।
য়ুরোপ দিয়েছে আজ সিরিয়াকে প্রতিদান তার
মদ জুয়া আর বেশ্যা হাজার হাজার।

তোমরা ও আমরা

আবুল হোসেন

আমরা না হয় কানাই হলাম, আর
তোমরা আলোর রঙের জগৎ দেখো।
তাই বা কী
আমরা নালিশ কোরেই গেলাম, আর
তোমরা নিজেই নিজের নসিব লেখো।
তাই বা কী
ঠাঁই ঠিকানাও আমাদের নেই, আর
তোমাদের ঘর তাবৎ জগৎ–জোড়া।
তাই বা কী

পুঁজির হিসাব তোমাদের নেই, আর
আমরা শুধুই ছুটাই ক্ষতির ঘোড়া।
তাই বা কী
তোমরা হাওয়ায় জাহাজ উড়াও, আর
আমরা শিকার পাল ছেঁড়া নৌকার।
তাই বা কী
থাকলো না হয় হাজার হাতীর জোর
তাই বা কী
না হয় হলো একান্ত কমজোর
তাই বা কী
এই হও আর ঐ হও না কেনো
তাই বা কী
সুখ কোথায়ও নেই দুনিয়ার জেনো।
তাই যদি হও বাহার তোমার, আর
বোশেখ মাসের পাহাড় আমরা হই
তাই বা কী

হিমালয়

বেনযীর আহমদ

হিমালয়! হিমালয়! হে ভারত–সাম্রাজ্য–প্রাচীর
আকাশ আনত শীর্ষে নিত্য চুমে তব উচ্চশির।
কালের কঠোর চিহ্ন তোমাতে অঙ্কিত নাহি হয়,
অম্লান যৌবন তব করিয়াছে সন্ধ্যা–ঊষা জয়।
বাহিরের চর্ম চক্ষে তুমি শুধু প্রস্তর পাষাণ,
সত্য দৃষ্টি কহে, তুমি ভারতের রক্ষক মহান্।
তুষার তোমার শিরে পরায়েছে উষ্ণীষ গৌরব
প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্ক পাণে চাহি সে যে হাসিছে নীরব।

অনন্ত অতীতকাল কোথা গেছে নাহি জানি ঠিক,–
বর্ষীয়ান, তব কাছে সে যে শুধু মুহূর্ত ক্ষণিক।
উপত্যকা কোলে তব কৃষ্ণমেঘ রচে চন্দ্রাতপ,
তোমার শিখর সনে সপ্তর্ষির চলে মন্ত্র জপ।
মৃন্ময়ী ধরণী–বুকে যদিও সে বিরাজিছ তুমি–
তব সত্য অধিষ্ঠান নীলাঞ্জনা উর্ধ্ব নভঃভূমি।

হিমালয়! হিমালয়! তুমি ক্রীড়–আনন্দ–অঙ্গন–
জড়ের ক্রীড়ার লাগি' স্রষ্টা তোমা করেছে সৃজন!
চঞ্চল মেঘের নৃত্য হেরি যবে তব শীর্ষ পরে,
উদ্বেল আনন্দে কাঁপি চোখে মোর সুখ–অশ্রু ঝরে।
মনে হয় করি দল চিরমুক্ত শৃঙ্খল বিহীন
উড্ডীন বিহঙ্গ সম শূন্যপথে হতেছে বিলীন।
তোমার অঙ্গন হতে বহে নদী সঙ্গীত–মুখর,
পীযুষ–অমৃত সুধা–তব বারি তারো শ্রেয়তর।
সুনির্মল বারিত সে যেন গো সৃষ্টির মুকুর,
বক্ষে তারি সারা বিশ্ব হেরিতেছে বিম্ব সুমধুর।
নদী তব বক্ষ হ'তে বহে নাচি' নৃত্য সাবলীলা
পাষাণ প্রহত কভু–জাগে মধু কল হাস্য–লীলা।

হে পথিক! হে চঞ্চল! চিরযাত্রী হে নদী–প্রবাহ!
চিত্ত মোর বুঝিতেছে নিত্য তুমি কি সঙ্গীত গাহ।
হিমালয়! হিমালয়! কহ কহ,–অতীত কাহিনী,
যে দিন আদিম নর প্রথম কুটির–গেহ খানি
রচেছিল বক্ষে তব সৃজনের উদ্বেল আশায়,
কৃত্রিম কুহক–ছাপ ঢালেনি কালিমা যবে তায়।
হে কল্পনা–সাথী মোর! চল মোরা যাই পুনঃ ফিরে,
সে দিনের চিরশান্ত মৌন–পূত উষা–সন্ধ্যা–তীরে,

হে কাল–গতির চক্র! নিত্য তুমি কোন দূরে ধাও?
অতীত কালের বুকে আবার ফিরে যাও।

বেদনার চিত্র

মনির উদ্‌দীন ইউসুফ

শ্রবণ-উজল কাহিনী আমার কাহারো শোনার কাঙাল নয়,
নীরবতা মোর চির মুখরতা মৌনতা মোর কথা যে কয়।
এ কেমন রীতি আসরে তোমার-বন্দী করিছ সকল গান,
ব্যাকুল রসনা কাঁপিছে আমার অবারিত তাই করিতে প্রাণ।

নার্গিস তার নিয়ে গেছে পাতা লালা আর গুল নিয়েছে হায়,
জীবন-বহ্নির কাহিনী আমার বিতত পড়িয়া কানন ছায়।
চুরি করে নিয়ে গেছে বুলবুল পাপিয়া পায়রা কানন ছায়।
আমার গভীর ক্রন্দন যত কিছু আর তারা রাখেনি বাকী।
পতঙ্গ-আঁসূ হয়ে তুমি কাঁদ হে দীপ, ব্যথার রজনী আজ,
বেদনা আমাতে ধরিয়াছে দেহ, কাহিনী পরেছে শোণিত সাজ।
প্রভু হে, আমার কি সুখ বল তো এই দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকা,
জীবনে মরণে যেখানে কোথাও অধিকার কিছু যায় না রাখা।
আমার রোদনে শুধু আমি নই–সারা বনভূমি কাঁদিছে যায়।
আমি সেই ফুল হেমন্ত যার প্রতিটি ফুলেরে কাঁদায়ে যায়
মন্ত্রমুগ্ধ ঘন্টার মত পড়ে আছি আমি জীবনভোর,
ঝটিকা-ক্ষুব্ধ উতলা হৃদয় নির্বাক হায়, আজিকে মোর।

দুনিয়ার এই মিলন-বাসর ভাগ্যে আমার নাহিক হায়,
নিয়তি-তাড়িত হাসিটি আমার কান্নায় যে গো ভাসিয়া যায়।
আমার নিঠুর ভাগ্যের পরে গাহি আমি এক বিষাদ গান,
আমি সেই ধ্বনি শুনিতে যাহায় কেহ কোন দিন পাতে না কান।
ব্যাকুল মাটির ঢেলা যেন আমি প্রাণের তত্ত্ব খুঁজিয়া যাই,
সিকান্দরের নিয়তি আমার? মুকুর কি আমি? নিভানো ছাই?
এতটুকু তবু জানি প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা ফিরে আমার ঘিরে,
নূরেতে যাহার জন্ম হইল আমি সে আধার আলোর তীরে।
গোপন মানিক-পরশ পাথর লুকায়েছে মোরে মরুর ধূলি,
কেহ নাহি জানে কার ধন আমি, অনাদরে কোথা রয়েছি ভুলি।
জীবন-গহনে করিনি ভ্রমণ, আপনারি চোখে অচেনা আজ,
আমি সেই এক ক্ষুদ্র পৃথিবী যেখানে রয়েছে আমারি রাজ।
আমি নহি মদ, আমি নহি সাকী, আমি নহি নেশা, পেয়ালা নই,
আমি জীবনের শরাবখানার সকল কিছুরি সত্তা হই।
হৃদয়-মুকুরে আমি দেখি বসে সারা জগতের মনের ছায়া
চোখে-দেখা সব ঘটনাপুঞ্জ গানে মোর তাই নিতেছে কায়া।

মহতী প্রেরণা দিয়েছে আমারে বক্ষে এমন তীব্র প্রাণ,
আমারি গানের সুর সুর দিয়ে স্বর্গ-বিহগ গাহিয়ে গান।
আমাতে আজিকে জেগেছে দারুণ বিদ্রোহী এক পাগল সম,
মৃত্যু-পারের নিয়তি ফলক আঁকিছে চিত্র মরমে মম
হে ভারত, তোর মুখ ছবি আজ কাঁদায়ে তুলিছে আমার প্রাণ,
বিচিত্র তোর কাহিনী বিশ্ব-ইতিহাস শোনে পাতিয়া কান।
দিয়াছে আমারে এমন কাঁদন যেন সে দিয়াছে বিভূতি সব,
নিয়তি আমারে নিয়াছে বাছিয়া গাহিতে তোমার শোকের স্তব।
ফুলচোর, তুমি রেখো না কাননে এতটুকু ফুল-কলির চিন,
বাগান-মালীরা হানাহানি করি ওই দেখ, সবে হতেছে ভিন।
আকাশ রেখেছে বিজুলী লুকায়ে ঘন কালো ওই বাদল-গায়,
উদাসীন হয়ে বুলবুল যেন না বসে আপন নীড়ের ছায়।
আমার এ ডাক শোন রে গাফেল, কথাগুলি মোর এমনি যাহা
কাননে কাননে পাখীরা মিলিয়া ওজিফার মত পড়িছে তাহা।
স্বদেশের কথা ভাব কি অবোধ? আসিছে বিপদ নহে সে দূর,
তোমার ধ্বংস-আয়োজন সভা বসিয়াছে মহা আকাশে দূর।
ঘটিতেছে আজ যাহা কিছু দেখ, আরো যা ঘটিবে দেখিবে পাছে,
পুরনো দিনের কাহিনীর মাঝে কি মোহ এমন ঘুমিয়ে আছে?
কতকাল আর নীরব থাকিবে? ফরিয়াদ নিয়ে দাঁড়াও সব,
মাটিতে থাকিয়া বিপুল শূন্যে প্রেরণ কর গো, তোমার রব।
এখনো যদিও না বুঝিয়া থাক হে স্বদেশবাসী, শোন গো তবে
আগামী দিনের ইতিহাস মাঝে নামটুকু তব নাহিক রবে।
বিধির ইহাই সনাতন রীতি, প্রকৃতি বিধান তাহাও এই
কর্মের পথে অশ্বারোহী যে জীবনের প্রিয় হয়েছে সেই।

জানি ওগো জানি, নিশ্চয় আজ গোপন ব্যথাটি বেকত হবে,
মাহফিল মাঝে রক্তবিন্দু ফুলদল সম ঝরাব সবে।
প্রতিটি হৃদয়ে প্রদীপ জ্বালাব গোপন জ্বালার আগুনে আজ,
তোমার আঁধার নিশীথগুলির দীপান্বিতার পরাব সাজ।

কুঁড়ির বুকের সুরভির মত বিকশি' তুলিব বাসনা-গান,
কাননের যত ধূলিকণা মাঝে জাগায়ে তুলিব ব্যাকুল প্রাণ।
একটি সুতায় হবে যে গাঁথিতে তস্বীর দানা ছড়ানো যত,
কঠিন এ কাজ যতই বন্ধু প্রতিজ্ঞা মোর কঠিন তত।
বন্ধুরা, মোরে দাও অবসর বিদীর্ণ করি হৃদয় মোর,
গোপন মরম হতে টেনে আনি আঁধারে লুকানো প্রেমের ভোরে।
যে-স্বপন আমি দেখিয়াছি রাতে তোমারেও আজ দেখাব তাই,
রূপ-পিপাসিত আরশীর মত ব্যাকুল তোমারে করিব ভাই।
সন্ধানী আঁখি যবনিকা তুলি গোপন তথ্য জানিয়া লয়,
দেখে, যাহা কাল-গতি স্রোত মাঝে অনাগত হয়ে মিশিয়া রয়।

উর্ধ্বে উঠার আস্বাদনের পরিচয় কভু করনি তুমি,
পদচিহ্নের মত চিরকাল পথপাশে মাটি রয়েছ চুমি।
সখাদের সেই ঘরোয়া আসরে বসে আছ তুমি কিসের আশে?
দেখিলে না চেয়ে বাহিরে বিশ্ব রূপে রূপে তনু মেলিয়া হাসে।
পরসুন্দরী প্রিয়াদের রূপে বন্দী হইয়া কাটালে দিন,
আরশিতে তোর কি রূপ ফুটিছে দেখিলে না, হায়, চেতনাহীন।
ক্ষুদ্র বাসনা ছেড়ে আয় দেখ, মুকুর-শোভিত কালের ঘরে
বিশ্বির হয় কি রূপ তোমার-বিরূপ রয়েছ যাহার পরে।
জ্বলন্ত প্রাণ! সুর তোল তুমি, সপ্তমে তোল জীবন-গান,
উদারার গ্রামে বাঁধিয়া রেখেছ গগন-চুম্বী বিপুল তান।
হৃদয়-সজ্জা লাগি প্রয়োজন নাহি বাহিরের রঙের সেবা,
স্বচ্ছ উজল আয়নার গায়ে রঙিন মেহেদী পরায় কেবা?
তোমার বক্র দৃষ্টি হেরিয়া সুদূর আকাশ ঝুরিছে হায়,
পূত কুর্‌আন খোদার কালাম শুলেতে চড়ায়ে দিলে যে তায়।
মুখেতে কহিছ তৌহীদ বাণী, একতবাদ হৃদয়ে নাই,
স্থূল বাসনার প্রতিমা বানায়ে নিয়ত তাহারে পূজিছ তাই।
কি রূপ দেখিলে য়ুসুফের তুমি, আঁধার কূপের মলিনতায়?
মুক্ত যে রূপ ভুবন-মোহন বন্ধনে হেরিলে তায়!

মধুর ভাষণে মোহিত করিতে মঞ্চে তোমার কথার ধারা
কাহিনী মাত্র হয়ে পড়ে থাকে প্রাণহীন, প্রাণে আনে না সাড়া।

জগৎ জ্বালানো রূপ-আলো হানো ঘুমন্ত দুটি আঁখির পর,
যে রূপ লাগিয়া পতঙ্গ ধায়, কাঁদিছে শিশির জনমভর।
রে অবোধ, শুধু বহির্দৃশ্য দেখিবার তরে এ চোখ নয়,
আদমের আঁখি সৃজনে আরো যে সুদূর-প্রসারী লক্ষ্য রয়।
জামশেদ' যদি দেখে থাকে সারা দুনিয়া আপন পাত্র মাঝে,
কিছুই সে নয়, যদি সে না দেখে কি রূপ তাহার হৃদয়ে রাজে!
মহামানবের বিভেদ-বৃক্ষে স্বার্থ-বৃদ্ধি সেই সে ফল,
যে ফল ফেলিল পিতা আদমেরে স্বর্গ হইতে ধরণীতল।
টানিল সূর্য বিপুল প্রণয়ে উড়িল না ফুল-কলির দল,
উপরে উঠার বাসনায় দেখ, উড়িছে প্রেমিক ব্যাকুল হয়,
ঔষধ সে যে আপনি তৈরী আপনার মত করিয়া লয়।
সারা অন্তর আলোকিত করে ক্ষুদ্র যে এক প্রণয়-রাগ,
অণুসম বীজ অনল-শ্বসনা সাজায় সে 'তূর' বিশাল বাগ।
প্রতিকার যত দুখের রয়েছে প্রেম-তরবারী-আঘাত মাঝে,
বেদনা-শান্তি গভীর গোপনে মুক্ত বাসনা-পরশে রাজে।
আত্ম-বিলোপ সূরা পানে আমি সপ্ত আকাশ হয়েছি পার,

রঙের বিলোপ দেখে দেখে শেষে সুরভিকে আজ জেনিছি সার।
থামে না আমার অশ্রু-প্লাবন দুখ গাঁথা যবে দেশের গই,
কবির আঁখির উপাসনা-রীতি চোখের জলের 'অজু'তে পাই।
কি প্রাণ লইয়া বাঁধিয়াছ নীড় গোলাপের ডালে বল তো হায়,
ফুলবনে যদি আসিয়াছে তবে নগ্ন হইয়া বিরাজ' তায়।
হায়রে, একথা বুঝিতে যদি গো, মুক্তি প্রেমের মাঝেতে রয়,
আমি-তুমি ভেদ-বাঁধনে গোলামী শক্ত হইয়া রচিত হয়।
না করি সাকীর পরোয়া দেখ তো উলটি পাত্র ধরেছে জলে
বুদ্বুদ যত আত্মবিশ্বাসী; তুমিও নিজেরে যেয়ো না ছলে।
শত্রু-স্বভাব দুনিয়ার বুকে বাঁচিতে যদি গো আশাটি রয়,

ভাবিয়োনা পর আপন জনেরে, সকল বিভেদ করিয়ো ক্ষয়।
মানুষের তরে প্রেম যে বন্ধু, মৃত্যুঞ্জয়ী সুধার ধারা,
সেই তো মাতাল করেছে আমারে পাত্র ও মদ সকল ছাড়া।

প্রেম-অমৃত পানে বাঁচিয়াছে যুগে যুগে কত অভাগা জাতি
ঘুমন্ত নিজ ভাগ্য জাগায়ে প্রভাত করেছে গহন রাতি।
প্রেম-প্রান্তরে সুদূর বিদেশ মধুর স্বদেশ সকলি আছে,
এ বিজন মাঝে বন্দী দশা ও নীড়খানি আছে ফুলের গাছে।
প্রেম সে লক্ষ্য যেখানে শান্তি-কখনো বিরাজে চলার শ্রম,
কখনো যাত্রা, যাত্রাঘন্টা, কখনো দিশারী, পথের যম।
ব্যাধি বলে এর হয়েছে প্রচার, এ ব্যাধি বন্ধু এমন হয়,
দৈব-বিপাকে প্রতিকার যত ইহারি মাঝারে গোপন রয়।
প্রেমের আগুনে জ্বালিয়ে হৃদয় আলোকিত কর সারাটি প্রাণ,
পতঙ্গ সম পুড়িয়া কর গো, চির উজলতা সবারে দান।
এই সে অনল সকল কিছুতে ক্ষণে ক্ষণে যাহা ঝলসি উঠে,
এই তো শিরীন, এই সেবতূন এই ফরহাদ কাঁদিয়া লুটে।
মানবজাতিতে ভাঙন এনেছে ধর্ম ও রীতিনীতির ভেদ,
হে স্বদেশবাসী, স্বদেশের লাগি হৃদয়ে তোমার আছে কি খেদ?
দীর্ঘ আমার বেদন-কাহিনী নীরব থাকিতে বলিছে মোরে,
যদিও আমার রয়েছে রসনা রয়েছে দীপ্তি কথার জোরে।
বেদনা-ব্যাপ্তি ছুঁয়েছে আকাশ, সীমাহীন ব্যথা উথলে বুকে,
সাগরের মত গুমরে কাহিনী, বলে যাই তাহা মৌন মুখে।
এখনি আনিবে জাগরণী বাণী আলসে ঠেলি।
সন্ধ্যায় পুনঃ লুকাবে অস্ত-গিরির পার,
সাঁঝের পাত্রে ভরিয়া ঢালিবে সুধার সার।

সবাই মত্ত জীবনের সুখে চিন্তাহীন,
বিকাশের ধাপে উঠিতেছে ক্রমে আয়াসহীন
মানুষের ব্যথা যে করিবে দূর দেখি না তায়,
তিক্ত তাহার জীবনের দিনগুলি যে হায়!

বেদনার দর্শন

মনির উদ্‌দীন ইউসুফ

বিলাস যদিও রাজে জীবনের প্রমত্ত নেশায়,
তবু প্রাণে ক্ষণে ক্ষণে বেদনার বাদল ঘনায়।
বেদনা-ঊর্মিতে নাচে পুলকিত প্রাণের বুদ্বুদ,
জীবনের সঙ্গে বাঁধা বেদনার কাহিনী অদ্ভুত।
একটি পর্ণও যদি ঝরে যায়, সে নহে গোলাপ,
বুলবুল সে নয়, যদি শোনে নাই হেমন্ত-বিলাপ।

প্রাণের কাহিনী রাঙা প্রয়াসের দারুণ শোণিতে
পূর্ণতার বাণী আনে যে-প্রয়াস মানব-সঙ্গীতে।
ব্যথার কাজলে দৃষ্টি মনোমাঝে প্রদীপ জ্বালায়,
'আহা'র মুকুরে ফোটে প্রাণ চিত্র পূর্ণ মহিমায়।
দুঃখের ঘটনারাজি মানুষে পূর্ণতা করে দান,
হৃদয়-মুকুরে দুঃখ ফুটে উঠে সজ্জার সমান।
স্বপনের সুখ হতে যৌবনের জাগায় বেদনা,
ইহারি আঘাতে জাগে মনোবীণে সঙ্গীত-কামনা।
প্রাণ-পক্ষী তরে ব্যথা মেলে-দেওয়া শক্ত ডানা তার,
রহস্যে অদৃশ্য প্রাণ রূপ ধরে পরশে ব্যথার।
বেদনা বেদনা নহে—অন্তরের নীরব সঙ্গীত,
অস্তিত্বের বীণাতারে সুপ্ত এক অনুপম গীত।

'হে প্রভু, ক্রন্দন সাথে সন্ধ্যা যার নহে পরিচিত,
রজনী গভীর যার অশ্রুজলে নহে তারকিত,
হৃদয়ের পাত্র যার ভাঙেনিক কোনদিন দুখে,
যে রয়েছে চিরকাল মদমত্ত মদিরায় সুখে,
যে মালীর হাতে কভু বিঁধে নাই গোলাপের কাঁটা,

যে প্রেমিক কাঁদে নাই বিচ্ছেদের কান্না বুক ফাটা
বেদনার দুঃখ হতে যে রয়েছে যতখানি দূরে,
জীবন-রহস্য হতে রয়েছে সে ততই সুদূরে।
জানিতে চাও হে যদি পরিচয় বিশ্ব-বিধানের,
বেদনা-মঞ্জিল কেন আজো নয় লক্ষ্য তোমাদের!

অনন্তের আদি আর অনাদির শেষ কথা প্রেম,
নশ্বর মানব-বুদ্ধি, চিরঞ্জীব এই মহা প্রেম।
প্রেমের সূর্যাস্ত-রাগ মৃত্যু-সন্ধ্যা লাজে নতমুখী,
প্রেমের জ্বলনে দীপ্ত জীবন এ, যবে ভস্মমুখী।
প্রিয়ের বিরহ-ব্যথা মর্মে যদি না তুলিত ঢেউ,
প্রেমের উদ্দীপ্তি তবে চোখেমুখে দেখিত না কেউ।
সত্য প্রেম মরেনাক প্রিয় যদি মরে যায় কভু,
বিরহ-বেদনা হয়ে প্রেমিকের বুকে জাগে তবু।
চিরন্তন প্রেমে হয় প্রেমপাত্র অজর অমর,
মৃত্যুঞ্জয়ী রূপ ফোটে মধুর সে জীবনের পর।
পর্বত-ললাট হতে আসে নদী সঙ্গীত ছড়িয়ে,
আকাশ-বিহঙ্গদেরে গীতিকার পাঠ দিয়ে দিয়ে।
হূরের আনন সম স্বচ্ছ তার জলের মুকুর,
পাষাণ চত্বরে পড়ি হয়ে যায় একেবারে চূর।
সহসা সচল ধারা হয় কোটি কোটি মুক্তাদল,
শূন্যপথে যেন তারা দীপ্তিমান তারকা সকল।
ফাটিয়া পারদ স্রোত ব্যাকুলিত হয় দিকে দিকে,
অসংখ্য বিন্দুর দল ক্ষিপ্ত হয়ে ছড়ায় চৌদিকে।
কিন্তু এই কণাদের পরস্পর বিচ্ছেদের মাঝে,
মিলনের শিক্ষা আছে, তাই পুনঃ যুক্তি হয়ে রাজে।
জীবনের স্রোত স্বর্গে এই মত ছিল এক হয়ে,

পতনে বিচ্ছিন্ন আজ কাঁদিতেছে জগৎ আলয়ে ঃ
"ভালবেসে এক হব বলে মোরা পৃথক হয়েছি,
বিচ্ছেদের সত্য বলে মিছামিছি ভাবিতে শিখেছি।"

পরলোকগত জন বিনিঃশেষে হয় না বিলীন,
মোদের জীবন হতে মুছেনাক তাহাদের চিন।
দুনিয়ার মোহে হয় বন্দী এই বিবেক যখন,
কিংবা তারে ঢেকে রাখে যৌবনের বিকৃত স্বপন,
শোনা যায় মনে শুধু ভালমন্দ সংগ্রাম-চীৎকার,
বিভ্রান্তি-আঁধার মাঝে পথ নাহি দেখ যায় আর,
সাহস আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে খুঁজে ফিরে নিরালা ভবন,
কল্পনা গুটায় পাখা, থেমে যায় সঙ্গীত যখন,
অস্তিত্ব মরুর বুকে বিজনতা ব্যাপে সর্বলোক,
নিরন্ধ্র আঁধার মাঝে জোনাকিও দেয় না আলোক,
পরলোকগত কোন প্রিয়জন-আনন তখন,
নিশুতি তামসী রাতে ফুটে উঠে চাঁদের মতন।

মেরাজ রজনী

মনির উদ্দীন ইউসুফ

গগন-গম্বুজ হতে সন্ধ্যাতারা ডাক দিয়ে বলে,
ঊষা যার বন্দনায় নতশির আজ সেই রাত!
সুদূর আরশ-সেতো হিম্মতের এক পদক্ষেপ–
মোমিনে বলিছে ডাকি মে'রাজের সুমহান রাত।

খিজিরের প্রত্যুত্তর

মনির উদ্‌দীন ইউসুফ

বন পরিক্রমা

বিস্মিত কেন হে তুমি, বনে বনে ঘুরে ফিরি বলে?
বিমুক্ত প্রাণ যে শুধু অবিরাম চলায় উচ্ছলে।
বন্দী তুমি গৃহবাসে, তাই তো দেখনি সেই প্রাণ–
মনোহর দৃশ্য সেকি! শোনে যবে যাত্রার আহ্বান।
–বন্ধুর পর্বতগাত্রের হরিণের দ্রুত সঞ্চরণ,
নিঃসম্বল যাত্রা আর পথহীন পথের শরণ;
নক্ষত্রের অন্তর্ধান–পটে জাগা দীপ্ত উষালোক,
উদিত অলিন্দে যেন জিব্রীলের ললাট আলোক;
নিস্তব্ধ মরুর বুকে সন্ধ্যাকালে অস্তগামী রবি,
খলীলের চোখে যাহা খুলেছিল এক বিশ্ব-ছবি;
শীতল ঝর্ণার তীরে যাত্রীদল ফেলিলে শিবির,
মনে হয়, বিশ্ববাসীরা মিলিয়াছে 'কওসরে'র তীর;
প্রেমের মত্ততা খোঁজে এই মত জনহীন মরু,
বন্দী তুমি লোকালয়ে চারিদিকে ফলশস্য তরু।
নিয়ত ঘূর্ণনে শক্ত জীবনের সুরাপাত্র হয়,
অনন্ত জীবন লাভ উদাসীন! ইহারি বিস্ময়।

ছোটদের জাতীয় সঙ্গীত

মনির উদ্‌দীন ইউসুফ

চিশতী শোনাল যে ভূমিতে বসে সত্যের বাণী পরাণ খুলে,
একত্ব গান গাহিল নানক যে দেশের শ্যাম কানন তলে
তাতারবাসীরা বরেছিল যারে আপনার প্রিয় স্বদেশ বলে,
মরুর মুক্তি ভুলিল হেজাযবাসীরা যাহার স্নিগ্ধ কোলে,
সে দেশ আমার জন্মভূমি গো, সে মাটি আমার স্বদেশ রে।

প্রতিভায় যার তাক লেগেছিল জ্ঞানীগুণীদের য়ুনান দেশে
সারা পৃথিবীরে দিয়েছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান যে গো, মধুর হেসে,
মাটিতে যাহার সোনা ফলে রয়, নদী-বুকে যার মুকুতা দোলে,
তুর্কবাসীর দু'হাত ভরিয়া হীরা জহরত দিল যে তুলে,
সে দেশ আমার জন্মভূমি গো, সে মাটি আমার স্বদেশ রে।

জ্যোতিহীন হয়ে পড়েছিল খসে তারকারা দূর ইরানী নভে
জ্বালায়ে যে পুনঃ উজল কিরণে ছায়াপথে ধরি, রাখিল সবে,
একম-গানের সুর শুনেছিল বিশ্ববাসীরা যেখান হতে
আরব প্রভুর গায়ে লেগেছিল স্নিগ্ধ মলয় যেদিক হতে
সে দেশ আমার জন্মভূমি গো, সে মাটি আমার স্বদেশ রে।
দিব্যদৃষ্টি সাধক যে দেশ সিনাইসম যে, দেশের গিরি,
প্লাবনের শেষে ভিড়িল যেখানে নূহের বিপুল জীবন-তরী,
উন্নত ভূমি যে প্রিয় দেশের অলিন্দ যেন আকাশে ফাঁকা,
মনোরম যার দৃশ্যাবলীতে সুখ-স্বর্গের দৃষ্টি-আঁকা;
সে দেশ আমার জন্মভূমি গো, সে মাটি আমার স্বদেশ রে।

সৌন্দর্যের মর্মকথা

আবদুস সাত্তার

সৌন্দর্য করেছে প্রশ্ন মহান খোদাকে একদিন ঃ
আমাকে করনি কেন চিরঞ্জীব তোমার জগতে?

উত্তরে বলেছে খোদাঃ এ পৃথিবী, দৃশ্যপট আর
সমস্ত কিছুই এর মৃত্যুময়; রাতের কাহিনী
এবং এখানে দ্যাখো প্রকৃতি সমস্ত কাজ করে
গতিশীল কালের নিয়মে।
সুন্দরের মর্ম সেই- যা নাকি বিলয় হতে জানে।

নিকটে দাঁড়ানো চাঁদ শুনেছিল এই সব কথা
এবং কথারা সব পাখা মেলে আকাশের দিকে
প্রভাত তারার কাছে পৌঁছে গেল নির্বিঘ্নে তখন।

সকলে তা জেনে নিয়ে প্রভাত–তারার কাছ থেকে
বললো শিশিরে ডেকে; এমন কি পরিচিত মাটি
শিশির বিন্দুর কাছে শুনে নিলো স্বর্গীয়–সে বাণী।
শিশিরের কথা শুনে ফুল তার আঁখি ভরে নিলো–
যন্ত্রণায় কেঁপেছিল ছোট ছোট কুঁড়ির হৃদয়;
সুন্দর বাগান থেকে কেঁদে গেলো বসন্ত একাকী–
যে যৌবন এসেছিল একদিন বেড়াতে সেখানে
চলে গেল দুঃখের পা ফেলে।

একটি সন্ধ্যা

আবদুস সাত্তার

ধূসর চাঁদের আলো কেমন নীরব হয়ে আছে,
সমস্ত গাছের শাখা প্রশান্ত, নড়ে না একটিও।
উপত্যকা–সুরকার সেও আজ নীরব; নিশ্চুপ
অজস্র পর্বত শ্রেণী সবুজ পোশাকে আচ্ছাদিত,
মূর্ছাহত সৃষ্টি যেন ঘুমমগ্ন রাত্রির শিয়রে।

এ প্রশান্ত লগ্ন থেকে এমন সুরের আবির্ভাব ঃ
নেকার নদীর স্রোত এখন বহে না দূরে আর।
নীরব তারার–গাড়ি সম্মুখে চলেছে এক মনে,
বাজে না ঘুন্টির শব্দ অবিরাম সেই যাত্রা পথে।

পাহাড়, নিকুঞ্জ, নদী সব আজ নিস্তব্ধ, নীরব।

সমস্ত প্রকৃতি যেন নিমগ্ন ধ্যানের সুগভীরে–
হে হৃদয় চুপ করো, দুঃখ ভুলে ঘুমাও কেবল।

ইউরোপীয় সংস্কৃতি

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্

বুদ্ধিতে দীপ্তিতে ভরা পশ্চিমের জীবনের গতি
প্রেমের সুরাহী দিয়ে পূর্ণ হল প্রাচ্যের জীবন;
উজ্জ্বল প্রেমের পথে বুদ্ধি পায় বাস্তবের পথ
বুদ্ধির পথেই চলে প্রেম তার স্থায়িত্বের দিকে।
জাগো, সবে বাঁধো এই নব বুনিয়াদ–
প্রেম আর বুদ্ধি দিয়ে অন্য এক নয়া জগতের।

ইউরোপীয় সভ্যতা

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্

জ্ঞান আর বিজ্ঞানের নবালোকে হয়েছে উজ্জ্বল,
শোনা যায়, এই পথে সেরা হলো দূর ইউরোপ;
কিন্তু এ যে সত্য নয়, সেই জ্ঞান সমুদ্রের বুকে
এক বিন্দু পানি নেই– তৃষ্ণা যাতে দূর হতে পারে।
রূপ আর ঐশ্বর্যের দীপ্তি নিয়ে ভরা আছে সব–
ব্যাঙ্কের প্রাসাদমালা, কী আশ্চর্য এই–
বাহ্যিক রূপের কাছে ম্লান হয় সে সব প্রাসাদ–
মন্দির ও গীর্জা নামে পরিচিত যারা।
তেজারতি নাম নিয়ে জুয়া খেলা চলে অবিরাম।
লক্ষের মুনাফা লুটে কিস্তিমাৎ করে একজন–
জ্ঞান আর বিজ্ঞানের, আর সেই সেরা তমদ্দুন
এ সবের নাম নিয়ে রক্তচোষা হয়েছে সরকার!
অথচ সাম্যের বাণী রাত্রিদিন প্রচারিত হয়–
বেকারী, শৈথিল্য আর নগ্নতার, শুদু দারিদ্র্যের
পেয়েছে অনেক কিছু আকাঙ্খার সুমহৎ দান
এ সব নিয়ে এলো সে দেশের জাতীয়তাবাদ।

রাভী তীরে

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্

বিকেলের স্তব্ধতায় রাভী নদী হয়েছে চঞ্চল
এখন হৃদয়ে তার সঙ্গীতের সুর,
চেয়ো না জানতে কভু কি করে এ হৃদয়ের সাথে
এক সুরে হলো ভরপুর।
কোমল সুরের দোলা, আন্দোলিত, এখানে এখন–
ডাক এলো প্রার্থনার তরে,
পৃথিবীকে মনে হয় আল্লাহর এবাদত খানা
চারিদিক রয়েছে যা' ভরে।
চঞ্চল নদীর তীরে দাঁড়ায়ে রয়েছি আমি একা–
জানি না কোথায় আছি আজ–
আমার অস্তিত্ব ভুলে গতিমান নদীর কিনারে
শুনি মিহি সুরের আওয়াজ।

এখন অবশ হাতে বেহেশ্তের শুঁড়ি খানা থেকে
সুরার পেয়ালা নিয়ে আসে–
রঙিন সুরার রঙ বিকেলের শেষ সীমানায়
লাল হয়ে লেগেছে আকাশে।
দিনের কাফেলা চলে দ্রুত থেকে আরও দ্রুততায়
দৃশ্য তার হয়ে যাবে শেষ,
গোধূলিকে মনে হয় মৃত সেই স্তিমিত সূর্যের
যেন চিতা–ভস্ম অবশেষ।

এখন অনেক দূরে দৃশ্যমান মিনারের চূড়া
মাথা তুলে জাগে সুনির্জন,
যেখানে তৃপ্তির কোলে মোগলের বীরত্বের ফুল–
বুকে নেই কোনোই স্পন্দন।
সে আবাস বুকে রেখে সময়ের ঢের অত্যাচার
আজো আছে উপকথা হয়ে,
কেতাবে খোদিত যেন সেই সব ভুলে যাওয়া দিন,

সময়ের স্রোতে গেছে বয়ে।
সে সব বাগান আজ একমাত্র নৈঃশব্দের সুর
শব্দহীন স্বরগ্রাম তার,
সে সব গাছের শাখা মনে হয় দায়রা আদালত–
শান্তি আর নীরবতার।

নদীর উপরে বয়ে যায় একটি তরণী–
দ্রুত গতি সে নদীর জল,
তরঙ্গের সাথে লড়ে মাঝি চলে সম্মুখের দিকে
স্রোতধারা ছুটে অবিরল।
যেমন হাল্‌কা তরী মিশে যায় একটি নিমিষে–
দু'চোখের দিগন্তের তীরে–
শব্দহীন গতি তার অলক্ষ্যে আড়ালে ছুটে চলে–
বিলুপ্তির নিবিড় তিমিরে;
তেমনি সমুদ্রে চলে মানুষের জীবন জাহাজ–
তরীটির মতো লুপ্ত হয়,
অনন্তকালের বুকে জন্ম নিয়ে, মুছে গিয়ে ফের
দেখা দেয় তার অভ্যুদয়।
কিন্তু তবু, ভ্রাম্যমান চিরকাল জীবন জাহাজ,
মানবের দৃষ্টির আড়ালে–
কখনো হারিয়ে যায়, হয়তো বা যেতে পারে, তবু
ধ্বংস তার নেই কোনো কালে।

নতুন চাঁদ

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্

বিক্ষিপ্ত সূর্যের আলো ডুবে গেছে নীল নদী জলে
নিভে গেছে সে ঔজ্জ্বল্য তার–
শুধু এক বিন্দু ভাসে প্রতিকূল স্রোত–আবর্তনে
সেই সূর্য আলোক–ধারার।
বিশুদ্ধ রক্তের ফোটা আকাশের অববাহিকায়
গোধূলিতে হলো গতিশীল,
উত্তপ্ত সূর্যের শিরা ছিন্নভিন্ন করেছে কী
অস্ত্রাঘাতে প্রকৃতি–নিখিল?

সন্ধ্যার বধূর কানে দীপ্তিমান দামী মুক্তা
এ আকাশ নিল চুরি করে!
অথবা রূপালী মীন নিঃশব্দে যে সঞ্চারিত
নীল নদী জলের ভিতরে?
বাঁক ঘুরে চলো তুমি শুনিও না তাহার আহবান
রাজপথ ডাক দিয়ে যায়–
বধির মানব–কর্ণ তোমারই সে স্পষ্ট উচ্চারণ
শুনিবে না, রহিবে নির্বাক।
পাণ্ডুবর্ণ বৃদ্ধ যারা, তোমাদের জীবনের শেষ
শেষ এই পুরানো জগৎ;
তোমাদের দেশ কোথায়? কোন্ সে দেশের দিকে
পড়ে আছে তোমাদের পথ?
তোমরা ঘুরিছ যারা–দেখ এক ধ্রুব তারকাকে
আমাকেও সঙ্গে করে নাও–
আকাঙ্খার তীক্ষ্ম কাঁটা দীন আজ করেছে আমাকে
এ মুহূর্তে আমাকেও নাও!
আলোর পিয়াসী হয়ে অবিরাম আছি যাতনায়
পৃথিবীতে শিশুটির মত–
জীবনের বিদ্যালয়ে; দ্রুতগামী বিবর্ণ পারদ
বাধাহীন চলে অবিরত।

তুলুয়ে ইসলাম

রুহুল আমীন খান

তারার আলো নিভু নিভু চিহ্ন যে এই নও উষার
পুব গগনে সূর্য হাসে নিদ্রাতে কেউ রয় না আর।
মূর্দা শিরায় প্রাচী'র পুনঃ সঞ্জীবনী রক্ত বয়
আবু সিনা, আলফারাবীর বুঝা ইহা সাধ্য নয়।
মুসলমানের হুশ ফিরেছে পশ্চিমা ঐ ঝঞ্ঝাতে
সিন্ধু–জলে মুক্তা ফলে তরঙ্গেরই সংঘাতে।
মহান খোদা মুমিনদের অচিরেই করবে দান
তুর্কী–কদর, হিন্দি–মেধা, আরবী ভাষা, উচ্চ শান।
ফুলকুঁড়িদের নয়ন–কোণে যদিও আছে তন্দ্রা–রেশ
গাও জোরে গান ভোরের পাখি, সেটুকুও হোক নিঃশেষ।

কুঞ্জে, কুলায়, শাখায় শাখায় জাগাও কাঁপন মঞ্জুসুর
পারদ হতে চঞ্চলতার স্বভাব কভু হয় কি দূর?
সবিস্ময়ে বর্ম–শোভা সে জন কিবা দেখবে আর
বীর গাজীদের বাহাদুরী দেখল পূত নয়ন যার।
বিকাশ লাভের যন্ত্রণা দাও গুলে লালার হৃদয় ফের
শাহাদতের নেশা জাগাও সবার মনে এই বাগের।

ফাল্গুনী সে বৃষ্টি সম মুসলমানের অশ্রু জল
পয়দা হবে মুক্তো তাতে খলীল নবীর সিন্ধুতল।
শুভদিনের আগমনী যায় শোনা এ মিল্লাতের
হাশিম–শাখা পত্র, পাতা, ফুল, কুঁড়িতে সাজবে ফের।
শিরাজ–বালা, তাব্রিজ দিল, কাবুলী মন আন লুটে
প্রভাত সমীর ফুলের সুবাস নিয়ে যেমন যায় ছুটে।
উসমানীদের চারিদিকেতে যদিও আজি বিপদ ঘোর
ভয় কি তাতে, হাজার তারার মরণে হয় একটি ভোর।
বিশ্ব–বিজয় হতে কঠিন লাভ করা তার তত্ত্বগুণ।
হৃদয় আঁখি হয় উজালা ঝরলে পরে কলজে খুন।
হাজার রাতের কান্না শেষে দীর্ঘ দিনের তপস্যায়
নার্গিস হয় সফল তবে, ফোটা কুঁড়ি ফুল শাখায়।
সুর বেহাগে দাও মাতিয়ে বুলবুলি এ কুঞ্জতল
কবুতরের কোমল ডানায় জাগুক শ্যেনের বজ্রবল।
সুপ্ত তোমার হৃদয়–মাঝে সিন্ধু জীবন রহস্যের।
দাও খুলে তার রুদ্ধ দুয়ার বেহুশ জাতি জাগুক ফের।

তুমি খোদার হস্ত বাণী, খোদায়ী তেজে শক্তিমান
সকল দ্বিধা দূর করে ফের দাঁড়াও উঠে মুসলমান
আকাশ সীমা পার হয়েও যাত্রী তুমি দূর পথের
গ্রহতারা পথের ধূলি তবু সুদূর মঞ্জিলের।
লয় হবে সব, তুমিই রবে, তোমার কোন নাই মরণ
তুমিই খোদার শেষ নিশানী সত্তা তোমার চিরন্তন।

তোমার বুকের রাঙা খুনে বিশ্ব–বাসর রঞ্জিত
ইব্রাহিমী! তোমার দ্বারাই জগৎ–সভা সজ্জিত।
বীজ তোমাতে সুপ্ত বিপুল সম্ভাবনা যোগ্যতার
ক্ষেত্র তুমি সৃষ্টি লীলার নিত্য নতুন পরীক্ষার।
পানি মাটির জগৎ থেকে চিরস্থায়ী জগৎ ঠাঁই
নবী যাহা সঙ্গে নিলেন সে উপহার তুমিই ভাই।

ঐতিহাসিক সত্য ইহা মহান বিজয় আসবে ফের
প্রাচ্যভূমি আসবে পুনঃ কব্জাতলে মুসলিমের।
সত্য ন্যায় ও শুজায়াতের সবক তুমি লও আবার
তোমার শিরে আসবে পুনঃ কুল দুনিয়ার শাসনভার।

মুসলমানী রহস্য এ, ফিতরতেরও এই বিধান
'উখুয়াত' ও প্রেম দিয়েই হয়গো বিজয় দেশ, জাহান।
রক্ত এবং বর্ণভেদের গর্ব করে ধূলিসাৎ
তুর্ক, ইরানী ভুলে গিয়ে হও সকলে এক জামাত।
আর কত কাল রইবে চুপে বন–বিটপী শাখার 'পর
বাজু তোমার কোহেস্তানী শাহীন সম শক্তিধর।
মঠের বাতি বিয়াবানে বাতায় যেমন পথ–নিশান
তোমার ঈমান করবে তেমন আঁধার ধরা দীপ্তিমান।
কোন তাকতে পদানত রোম ও ইরান মুসলিমের
আলীর বাজু, ত্যাগ বুজরের আর সততা সালমানের।
চলল ধেয়ে স্বাধীন জাতি শেকল ভাঙার গান গেয়ে
যুগান্তরের বন্দীরা তাই দেখল মহাবিস্ময়ে।
ঈমান বলেই ভিত্তি অটল হয় জগতে মিল্লাতের
নয় বাহুবল, প্রমাণ দেখ তুরানী ও জার্মানের।
এই মাটিরই কায়ার মাঝে পয়দা যখন হয় ঈমান
জিব্রাইলের মতই তখন হয় সে মহাশক্তিমান।
অধীনতা করতে খতম ব্যর্থ অসি, সুকৌশল
সব গোলামীর শেকল ভাঙে সাচ্চা একিন, ঈমান বল।

খবর রাখ, কি যে অসীম ক্ষমতা ঐ কব্জাতে?
এক নজরে পারে মুমিন ভাগ্যলিপি বদলাতে।

শাহানশাহী, রাজত্বধন, বিজ্ঞানের এই অসীম বল
ঈমানের এক অনুস্বারের ব্যাখ্যা শুধু এই সকল।
ইব্রাহিমী দৃষ্টি কভু সৃষ্টি করা সহজ নয়
সঙ্গোপনে হৃদয় মাঝে মূর্তি বহু পয়দা হয়।

মাওলা গোলাম এই ভেদাভেদ মানবতার অসম্মান
হও হুশিয়ার জালিম, কঠোর ফিতরতের শাস্তিদান।
একই মূলের প্রকাশ যে সব নারী নূরীর একই গুণ
দীর্ণ করো সূর্য অণু ঝরবে তাতে সূর্য–খুন।
দৃঢ় ঈমান, অধ্যবসায়, জগজ্জয়ী প্রেম দিলের
তেজ হাতিয়ার জিন্দেগানীর জিহাদে এ তিন বীরের।
কোন গুণেতে সৃষ্টি করে ব্যক্তি মাঝে উচ্চ শান
উষ্ণহৃদি, স্বচ্ছদিঠি, আবেগ অধীর ব্যাকুল প্রাণ।
ঈগল সম ঝাঁপিয়ে পড়ার লুপ্ত আজি শক্তি বল
সাঁঝের খুনে গোসল করে উঠল ফুটে তারার দল।
সাগর তলার বীর ডুবুরী নদীর জলে ডুবল হায়
মুক্তা হয়ে জ্বলছে সে আজ দোল খেত যে উর্মি ঘায়।
আলকিমিয়ার মালিকেরা লুটায় পথের ধূলার মাঝ
পথের ধূলার লোকেরা ঐ পরশমণির মালিক আজ।
এক জামানার দূতরা মোদের নও মালিকের নান্দী গায়
বিজলী যাদের খবর দিত তারা শুয়ে নিদ্রা যায়।
হরম বেহুরমতীর কারণ মুরব্বীদের তঙ্গ–নজর
হালের নবীন তুর্কী তাতার যুব সমাজ বেশ উদার।
ফেরেস্তারা এই জমিনে ডেকে বলে শোনরে ভাই
এই যে মানুষ—অজর, অমর, কভু যে তার ধ্বংস নাই।
সূর্য এবং ঈমানদারের এই দুনিয়ায় একই হাল
এই দিকেতে হয়গো উদয় ওদিক গেল অস্তাচল।
জাতি গড়ার আসল পুঁজি জনগণের ঈমান–ধন
জেনে রেখ এর দ্বারাই ভাগ্য–প্রাসাদ হয় গঠন।
'কুন ফাকানের' ভেদ তোমাতে সুপ্ত খোল চোখ আবার
সত্তা তোমার জাগিয়ে তোল, হওগো খোদার ব্যাখ্যাকার।

খণ্ডিত আজ মানব সমাজ স্বার্থ লোভের সংঘাতে
প্রেমের ডোরে বাঁধ আজি সবায় এনে এক সাথে।
তুর্ক-তাতারী, ভারতীয়—দাও ভেঙে সব অন্তরাল
দাও মিটিয়ে কূলের রেখা সাগর সম হও বিশাল।
পাখনা তোমার মলিনতর বর্ণবাদের ছাই ধূলায়
পাক হারামের পাখি! ঝাড়া ওড়ার আগে দাও ডানায়।
খুদীর গাঙে ডুব দে গাফেল, ভাবনা তবে আর কিসে?
সন্ধ্যা-সকাল যাক ঘুচে সব মহাকালে যা মিশে।
লোহার মত শক্ত কঠোর হও জিহাদে জিন্দেগীর
রেশম সম হও সুকোমল প্রেম-বাসরে মৌ-রাতির।
মরু, গিরি কান্তারে বও ঝঞ্ঝা হয়ে শনশনে
ঝর্ণা হয়ে মধুর সুরে গান গেয়ে বও ফুলবনে।
তোমার জ্ঞান মুহব্বতের নাই সীমানা নাইকো পার
বিশ্ব বীণার তারে তুমি সুর যে একক চমৎকার।

অত্যাচারীর শাহানশাহী আজও ধরায় চলছে হায়
মানবজাতি মানব শিকার করছে আজও এই ধরায়।
যদিও দেখ চোখ ধাঁধাঁনো রূপ আধুনিক সভ্যতার
মেকী ইহা-গিল্টি সোনা, সার ত কিছু নাই ইহার।
পশ্চিমারা যে বিজ্ঞানের করছে সদা অহঙ্কার
তার অবদান মানুষ মারার যন্ত্রপাতি আবিষ্কার।
পুঁজিবাদের উপরে যে তমদ্দুনের কায়েম ভিত্
জ্ঞান-ক্ষমতায় কাজ হবে না, ধ্বংস তাহার সুনিশ্চিত।
ফিতরতে কেউ নারী নূরী নয়-জগতে এক তামাম
কর্মে হবে নির্ধারিত জান্নাত, না জাহান্নাম।

বুলবুলিগো গান জুড়ে দাও, ঘোমটা খোল মুকুলদের
তুমি যে এই গুলবাগিচার মলয় সমীর বসন্তের।
আজ এশিয়ার বক্ষ মাঝে জ্বলছে পুনঃ প্রেম অনল
লড়াই মাঠে ঝাঁপ দিয়েছে ফের বিলাসী তুর্কীদল।
মোদের পুরান-পতিত মালের ক্রেতা এসে জুটছে ফের
দীর্ঘদিনের পর কাফেলা যাত্রী আবার এই পথের।

এসো সাকী, তরুর শাখে ঐ যে পাখি গাইছে গান
আসছে ফাগুন, ফুটছে কুসুম, উঠছে হেসে গুলিস্তান।
বাসন্তী মেঘ ফেলছে তাঁবু বিয়াবানে, গিরির 'পর
পাহাড় কোলের ঝর্ণা মেয়ের আসছে ভেসে মধুর স্বর।
দোহাই সাকী, আজকে তুমি চালাও আবার পুরান রীত
গায়কেরা আসছে সবাই মুহব্বতের গাইছে গীত।
বন্ধু এবার ভাবনা ভোল, লও শিরাজী পান করে
বুলবুলিরা শাখায় শাখায় ঐ যে শোন গান করে।
'বদর' 'হোনায়েনের' নেতার গজল শোনাও আশিকদের
সেই সুমহান দৃশ্য আমার ভাসছে পাতায় দুই চোখের।

উঠছে জেগে জাত খলীলের—জাগছে পুনঃ মুসলমান
প্রেমের হাটে মোদের টাকা পাইছে ফিরে পূর্ণমান।
শহীদানের কবরগাহে ফুলের মালা করব দান
তাঁদের খুনেই জাগবে পুনঃ জাতির কচি–সবুজ প্রাণ।

ছড়াই কুসুম, বিলাই শরাব, আয়রে সবাই আয় ওরে!
ছাদ ভেঙে দেই নীল আকাশের নতুন জগৎ নিই গড়ে।

চন্দ্র

মীজানুর রহমান

হে চন্দ্র! সৌন্দর্য তব প্রাণের বিলাস।
ঘুরিছ অনন্তকাল পৃথ্বীরে ঘিরিয়া
মাটির দেউল তব। বুকেতে বিকাশ
ছোট্ট ঐ দাগ বল কাহার লাগিয়া?
কাহার প্রেমেতে কহ রয়েছ মশগুল?
প্রতীক সে–দাগ তব কোন্ কামনার?
ধরাতে বসিয়া মোর হৃদয় ব্যাকুল,
বেতাব বিমান বুকে হৃদয় তোমার।
কাহারে খুঁজিছ তুমি? কোন্ সে সুন্দর
ফিরিছ তালাশ করি' আমারি মতন?

অনন্ত আলোকে যাঁর মানব অন্তর
আলোকিত প্রভাসিত প্রদীপ যেমন।
তাঁহারি মজলিস তুমি করিছ গুল্‌জার।
একই মন্‌জিল বটে তোমার আমার।।

নীরব নিথর নীল নীহারিকা–লোকে
খুঁজিছ যাঁহারে, সে যে রয়েছে গোপন
কল–কোলাহল–ময়ী বসুধার বুকে
কর্ম্মমুখরিত করি' মানব–জীবন।
চির–বিরাজিত সে যে কানন–কান্তারে
শ্যামল, সবুজ শষ্পে। বুলবুলের তানে
মধুর মোহন তান। প্রসূন মাঝারে
বিলোল বিলাস। তোমা দেখাব কেমনে
সুষমা সম্ভার তাঁর? এস মোর সনে
সলিল বিপুলা স্বচ্ছ তরঙ্গিনী তীরে
দেখাব মোহন ছবি সলিল দর্পণে।
আকাশের অশ্রু–ধারা নিশির শিশিরে।
বিরাজিছে মরুবন গিরির গুহায়,
মানব হৃদয়ে, তব দোদুল দোলায়।

শিশির ও তারকা

মীজানুর রহমান

আঁধার রাতে বল্‌লে তারা শিশির–কণায় ডাকিঃ
"রোজ সকালে নিত্য–নতুন দৃশ্য দেখ নাকি!
কিন্তু তোমার নাই কো জানা বিশ্ব বেশুমার,
দেখুন চোখে, জন্ম নিয়ে বন্‌লো নিরাকার।
জোহরা বলে মালাক থেকে শুন্‌ছে খবর সেরা,
ফালাক থেকে বহুৎ দূরে মানুষ আকার ডেরা।
বলবে ভায়া, বাঞ্ছিত অই আজীব দেশের বাণী
চন্দ্র নিতি গাইছে যাহারা প্রেমের রিনিঝিনি।"

বল্‌লে শিশির, "হে তারকা! করো না জিজ্ঞাসা,
গুল বাগিচা নয় দুনিয়া বেদন–ব্যথার বাসা।
দখ্‌নে হাওয়া ঝুরঝুরে তায় ব্যর্থ হয়ে ফেরে।

ফুল কলিরা ফুটিছে বটে, মরণ তাদের ঘিরে।
বল্‌বো কী সে কলির কথা কুসুম–কানন আলা।
ছোট্ট যেন আলোর শিখা বিজুলী–বিভাস ঢালা!
কিন্তু আহা! কুল বঁধুরা চায় না বিহগ–তান,
আঁচল ভরা মুক্ত আমার অনাদৃত শান।
আকাশ–চারী মুক্ত বিহগ সেথায় গেরেফতার।
ফুল–বীথিকা কাঁটায় ভরা বালাই চমৎকার।
চুপটি বসে হাসনা–হেনা মুখটি সদা ভার,
দেখ্‌তে হৃদে সাধ বেচারীর চোখটি অন্ধকার।
গ্রীষ্ম–চোটে তপ্ত–হৃদি কাঁদছে যে শমশাদ,
বন্দীশালে বন্দী বটে নামমাত্র আজাদ!"

"হে তারা! তোমায় বলি হৃদয় কাতরানি,
মানুষের রসনা অই উনুনের তাতানী!
শিশির–কণিকা আমি নাহি হেরফের,
বাগানের পরিভাষে 'অশ্রু আকাশের'!
পৃথ্বী পার্শ্বে চন্দ্র ঘোরে নিছক নাদানী,
ভাবৃছে বোকা মিলবে তাহে দিলের আছানী!
হাওয়ার বুকে বিনির্মিত এই দুনিয়ার ঘর,
বেদন–ব্যথার চিত্র বিরাট হাওয়াই পটের পর।"

নয়া শেওয়ালা

ফযলুর রহমান

ব্যথাহত হৃদে আমি ত্যজিয়াছি মসজিদ মন্দির;
হে যাজক, শুনিব না আর কভু তব ধর্ম–বাণী
শতবিধ নীতিকথা মধুময় অপূর্ব কাহিনী।
তুমি ভাবো, খোদা ওই মূর্তিময় পাষাণ প্রাকারে
আছে বন্দী! মোর তরে প্রিয় মোর স্বদেশের ধুলি,
প্রতিকণা লভে তার সে খোদার অপরূপ রূপ!
এসো তবে পুনরায়; দাও তুলি দাও যবনিকা
অপরিচিতির হীন; দূরে যারা আছে সবে আজি
ডাকো কাছে; ফেলো মুছে বিরোধের কলুষ কালিমা!
লদিতর আছে পড়ে কতকাল স্তব্ধ জনহীন,
এসো মোরা রচি সেথা মরমের নব নিকেতন;

হোক্ তাহা পৃথিবীর মাঝে শ্রেষ্ঠ সমুন্নত শির!
চূড়া তা'র তুলে ধরি ওই দূর নীলিমার গায়!
নিভৃত অন্দরে তার প্রতিপাতে রচি স্তোত্রগাঁথা
সকল ভক্তের প্রেমের গানে আছে শান্তি আছে নীতিবল,
নিখিল–মানব–মুক্তি লভে রূপ প্রেমের মাঝারে।

নালায়ে এতিম

আবুয্ যোহা নূর আহমদ

হায়! কি বলি, বক্ষপঞ্জরে এখন আর প্রাণ নেই।
উজ্জ্বল প্রদীপ যখন নির্বাপিত হয়ে যায়–মহফিলের যোগ্যতা তার থাকে না।
হে জীবন কাব্যের লীলাভূমি–আমি তোমার উপযুক্ত নই;
নৈরাশ্য যা অতিক্রম করতে পারে–এটা, তেমন স্থানই নয়।

হায়! শারাবখানার মজলিসে আমি কি মুখে শরীক হই,
চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় যা–আমি যে সে পেয়ালা।

আফসোসের কাঁটার কাছে বর্শার তীক্ষ্ণ ফলকও লজ্জা পাচ্ছে–দুঃখের
ইউসূফ প্রাণ বাযারের সৌন্দর্য পণ্য হতে চলেছে।

আমার হৃদয় ফরিয়াদ রোধ করতে অপারগ হতে শুরু করেছে–দিলের
কান্নার সুর আকাশের সান্নিধ্য লাভ করতে চলেছে।

ধ্বংসীভূত বাগানের বুলবুলের যে গান–
সে গানের সুর কেন শত ফরিয়াদের চেয়েও হৃদয় বিদারক হবে না?

অস্বস্তির হাত এগিয়ে আসছে পরণের কাপড় ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য–
দুঃখের অশ্রু জামাকাপড় প্লাবিত করে নীচের দিকে বইতে লাগল।

ক্রন্দনরত দিল ঊষর প্রান্তরের জন্য এমনি চঞ্চল হয়ে পড়েছে–
ফুল বাগিচার জন্য বুলবুল যেমন ছটফট করতে থাকে।

জীবনের হাটে বসে এখন আর আমরা কি কিনতে পারি?
(হে মন) যাও কোন প্রান্তরে গিয়ে একাকী বসে ক্রন্দন কর।

ক্ষোভ–দুঃখে অভ্যস্ত দিল–আনন্দ উপভোগের উপযোগী নয়,
কবর শিয়রে জ্বালানো প্রদীপ–খুশীর মজলিসের উপযুক্ত নয়।

আসমানের নীচে আরাম উপভোগকারীর চিহ্নই নেই
ক্ষোভ–দুঃখ ছাড়া–সুখের কপোল লালিমা নেই।

আমাদের আনন্দ প্রভাত ও–শত সায়াহ্নের ঈর্ষাযোগ্য
মানুষের অস্তিত্ব আরামের দিলের ধূলো–স্বরূপ (আরামহীন)

জীবন সাগরের স্থায়িত্ব নির্ভর করে আশা ভরসার জোয়ার ভাটার উপর–
মাঝে মাঝে আবার খুশীর হাওয়াও এসে পড়ে।

যে মুহূর্তে জীবনে ভালোবাসার আলোকচ্ছটা পড়ল
পরিবর্তনের ঘনঘটা–তখনই বিপদের ঝড় নিয়ে আসল।

কারো মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো, কেউ বা ব্যর্থ মনোরথ হলো–
এই দৃশ্যের–পরিণাম কিন্তু কবরের মাটি।

হে আসমান! তোমার কাছে সৌভাগ্য বৃদ্ধির আশা!
তোমার প্রত্যেকটি তারা সৌভাগ্য–তারার হৃদয়–ক্ষতস্বরূপ।

তুমি কাউকে বঞ্চিত করতে বাকী রেখেছ?
হে মুসলমানগণ! কান্নার রোল আকাশের গতিপথ ভেদ করছে।

বন্ধুত্ব আর কারো কাছ থেকে দেখতে পাইনে–বন্ধুরা সব গেল কোথায়?
বন্ধুত্বের সমাপ্তি ঘটলো–দোস্তদের হলো কি?

দুঃখের অবস্থা প্রকাশ–ভাষার অসাধ্য;
বর্ণনার ভঙ্গি দুঃখের তীব্রতাকে খর্ব করে দেয়।

দুঃখ–বেদনার কাহিনী জিহ্বা পর্যন্ত আসতে পারে না
আমার মুখর ঠোঁটে প্রচ্ছন্ন বেদনার হাসি লেগে আছে।

'বাক্‌শক্তিরহিত করা'ই যেন নীরবতার কয়েদখানার আদেশ
বিষাদ প্রকাশের অপরাধীকে এই শাস্তি পেতে হচ্ছে।

হৃদয়–ক্ষতের কোন মলম আমি খুঁজে পাচ্ছি না–
মানুষের রূপধারী–আমাকে নিজের ভাগ্যেরই বিলাপ করতে হচ্ছে।

পিতার আশ্রয় ছায়ার জন্যই আমার কান্নাকাটি,
হাঁ, হে অশ্রুভারাক্রান্ত আঁখির সাগর–আমাকে তুমি ডুবিয়ে দাও।

বাল্যকালের আশা–আকাংখার জন্য–হে হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠো না।
তুমি 'এতিম হওয়ার' অশ্রুর তিক্ততার জন্য এসেছ।

হে পিতার আশ্রয়–ছায়া–তুমি রহমতের ছায়াস্বরূপ
বাল্যকালের মুকুলের উপর তোমার আগমন পূরবী বাতাসের মত।

দুনিয়ার প্রান্তরে তুমি খিযিরের মত পথ প্রদর্শক।
তুমি ত করুণাময়ের করুণার এক জীবন্ত প্রকাশ।

শিশুকালের রাজত্বে তুমি একচ্ছত্র প্রভাবশালী
তুমি না থাকলে–যিন্দেগী এক শৃংখলহীন বন্দীখানা।

কিন্তু শিশু বয়সেই নবচন্দ্রের মত কোমর বেঁকে গিয়েছে;
প্রৌঢ়ত্বের প্রভাত 'এতিম হওয়ার' রূপ নিয়ে এসেছে

ব্যর্থতার স্মৃতি ওকে কি জানি কি বুঝিয়ে গিয়েছে
বেদনার প্রজ্জ্বলিত শিখাকে আরো উত্তেজিত করে গিয়েছে।

নিঃশ্বাসের বদলে আমার বুকে তরবারীর ক্ষুরধার আছে
আমার জীবনটাই মৃত–পুস্তকের ব্যাখ্যা।

হে সাগর!–প্রবল বাতাসের প্রকোপেই তোমার উদ্বেলতা,
এবং তোমার এই সব উচ্ছলতা চাঁদের আকর্ষণেই হয়।

তোমার রাজকীয় মর্যাদা–পাহাড় ও সমুদ্রের দরুণ–ই প্রতিষ্ঠিত আছে।
এবং সূর্যের আলোকচ্ছটায় তোমার ললাট হাস্যোজ্জ্বল।

পৃথিবীর সুপরিকল্পিত পরিচালনায় ও 'উপায়হীনতার' উপকরণ নেই
তবে কেন 'এতিম হওয়াটা' নিঃসহায়তারূপ বাযপক্ষীর শিকার হলো?

চিত্র শিল্পী ফুলের হাসির দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে পারে
এবং হে বিদ্যুৎ–তোমার চপলতার (চিত্র) মোটেই কঠিন নয়।

প্রভাত তারকা–কল্পনার কলমের জন্য কঠিন নয়।
কিন্তু আমার মুচকি হাসির রূপ অন্য ধরনের।

এই মুচকি হাসি–আফসোসের অশ্রু–লাবণ্য বৃদ্ধি করে
প্রচ্ছন্ন বেদনাকে লুক্কায়িত রাখবার–এটা এক পর্দা বিশেষ।

অতীত দিনের স্মৃতি! তুমি আমাকে বিচলিত করে ফেলেছ
হায় হে কল্পনার আঁখি! তুমি কি সব দেখে ফেল্লে!

হে যাত্রীদলের বিচ্ছেদ! এ তুমি কি দেখালে?
প্রচ্ছন্ন বেদনার আঘাত আরো জাগরুক করে তুল্লে।

দুই হাতে কল্‌জে চেপে ধরে বসে রয়েছি
হে ব্যর্থ হৃদয়! এই রোগের কোন চিকিৎসা কর।

স্বর্গের ঈর্ষাউদ্দীপক ফুল বাগানের মৃদু বাতাসের সুরভি এসেছে
যার পায়ের আওয়ায শ্রুতিগোচর হয় না।

প্রভাত সূর্য রশ্মি জালের নৃত্য স্বাদ
কিম্বা রাত্রিশেষের পাখীর গানের সুরের উথান পতন

নির্বাকদের শহরে কোনই প্রভাব বিস্তার করতে পারে না
কবরের ছায়ায় নিদ্রিত লোকদেরে জাগাতে পারে না।

হে হৃদয়! প্রত্যেক মুহূর্তে অশ্রুর নদী প্রবাহিত করা উচিত নয়।
যেমন কাহিনী তেমনি শ্রোতৃবর্গের প্রয়োজন।

প্রত্যেকের কাছে এই দুঃখের কাহিনী বলে ক্রন্দন করা উচিত নয়;
এর জন্য হাশিম বংশীয় এতিমের (আঃ) দরবারের প্রয়োজন।

অন্তর্চক্ষুর দৃষ্টিও কেমন দ্রুতগামী।
একটি মুহূর্তের মধ্যে–সামনেই পুণ্যবানদের শাহান শাহের (আঃ) দরগাহ্!

হে দরিদ্রদের সাহায্যকারী! হে নিঃসহায়দের আশ্রয়স্থল!
হে উপায়হীনদের সাহায্যকারী! হে সম্বলহীনদের সম্বল!

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার কাফেলা হৃদয় থেকে যাত্রা করেছে–
আমি আমার দুঃখ–বেদনার কাহিনী বলতে এসেছি।

সমস্যার সমাধানের জন্য ত তোমার মহিমামণ্ডিত সত্তা আছে
আর্ত হৃদয়ের জন্য তোমার নাম আরোগ্য স্বরূপ।

আকাশের নির্যাতন সহ্য করার শক্তি নিরুপায়দের থাকে না;
ঐ হৃদয় সমূহে ক্রন্দনরোল সহ্য করার শক্তি থাকে না।

এমন কোন্ বিপদ আছে–যা বর্ণনার ঋণে আবদ্ধ নয়?
একমাত্র 'এতিম হওয়া' জিহ্বার ঋণজালে বন্দী থাকে না।

আমার মূর্তিই নিরানন্দ হৃদয়ের কাহিনী স্বরূপ
আমার নীরবতাও তোমার সাহায্য ভিক্ষা করে।

তুমি দুনিয়ার মজলিসে মর্যাদার আসনের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী
তুমি মানুষের জন্য রহমতের নিদর্শন স্বরূপ–জিবরাইল।

হে জ্ঞান বিজ্ঞানের আবাসভূমি!–তুমি উম্মতের কেব্‌লাস্বরূপ
হে ঈমান আঁখির জ্যোতি–তুমি প্রত্যেক প্রশংসার অলংকারস্বরূপ।

মানুষের যত দুঃখদৈন্য তার প্রতি সহানুভূতি তোমার বক্ষপঞ্জর থেকেই উঠেছে।
প্রীতি উদ্বেলতার লোহিত সাগর তোমার আঁখির জল থেকে উঠেছে।

প্রীতি–তৃষ্ণায় আকণ্ঠ শুষ্ক তৃষিতদের জন্য তুমি 'আবে কউসর' স্বরূপ
তুমি সেই সাগর যার প্রতিটি বিন্দুতে শত মুক্তা থাকে

তুর পর্বতে অবস্থিত মুসা কলিমুল্লার (আঃ) চোখের তারা তুমি
'ইয়াসিনের' অর্থ তুমি; 'আও আদনার' ইংগিত তুমি।

ঐ ব্যক্তি তোমার জ্যোতির্ময় সত্তাকে চিনতে পারে নি
যে 'মিম' ছাড়া 'আহমদের' রহস্য বুঝতে পারে নি।

প্রাণ মাতানো হিসাবে তুমি মায়ের হাসির মত
পিতার স্বরের মত 'কউসর' থেকেও সুস্বাদু তুমি।

আরশ–মুকুটের সৌন্দর্য বাড়ে যা দিয়ে তুমি সেই মণি
মানুষের ভাগ্যের জন্য তুমি সৌভাগ্য তারকা।

তুমি দুনিয়ার সম্ভ্রান্ত মানুষের মহ্‌ফিলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী
যদিও আবির্ভাব সর্বশেষে কিন্তু মর্যাদায় তুমিই অগ্রগামী।

তোমার মর্যাদা 'লাওলাকা' আয়নার মুক্তস্বরূপ
তোমার করুণায় বিশ্বাসের চোখের পাতা আর্দ্র হয়।

আসমানের আঁখি তোমার ছায়ায় উজ্জ্বল
যাকে স্পর্শমণি বলা হয় তো তোমার দরযার ধূলো।

তোমাকে নিরীক্ষণ করা মুসার (আঃ) সাধ্য কোথায়?
তুমি তূর পর্বতের চূড়ায় ধ্বনিত 'লানতারানী'র প্রতীক

কৃষকের পক্ষে দুপুরের আগুন–কষ্টের সময়
ঘাম থেকেই প্রচণ্ড সূর্যের প্রভাব প্রকটিত–

কিন্তু চেহারার উপর আশার ঝলক খেলতে দেখা যায়
যখন সে পরিশ্রমের ফল সংগ্রহ করে।

"ইয়া মোহাম্মদ" বলে সে নিজের নিজের কাজ থেকে উঠে পড়ে
'আঃ' তোমার নামে সে কি শান্তিই না পায়?

সেই সত্যধর্মের আশ্রয়স্থল–সেই হেরা গুহার কিনারা
তোমার পদগৌরবে যা সিনাই পর্বতের ঈর্ষাস্থল হয়ে গেল।

সেই নিরাপত্তার দুর্গ–সেই ফারান পর্বতমালা
যার প্রতিটি কণা থেকে 'পরিপূর্ণ ধর্মের' আওয়ায উঠেছে

যা তোমার পদস্পর্শ গৌরবে আসমানের মত হয়ে গিয়েছে
এই ধরণী মহিমামণ্ডিত আরশের সমপর্যায়ভূক্ত হয়ে উঠেছে।

সৃষ্টির বিধানে অসহায়ের অস্তিত্বের কোন চিহ্নই নেই
অতৃপ্ত মনের কাজই হলো অভিযোগ করা।

তোমার দরযায় এসে পড়েছি–এখন সাহায্যের সময়
আমার দুঃখ দৈন্যের বদলে কৃপা ভিক্ষা চাই।

উপায়হীনতার বর্ণনা জিহ্বা পর্যন্ত আসতে পারে নি–
কিন্তু তোমার 'এতিম হওয়া' আমাকে সাহস জুগিয়েছে।

হে অশান্ত হৃদয়, একটু থাম–এ কি আওয়ায আসছে
যা চির প্রবহমান ঝর্ণার পানির কলতানকেও লজ্জা দেয়।

হৃদয়কে যা প্রেমবহ্নি–জ্বালায়–প্রজ্জ্বলিত করে তোলে
আত্মাকে যা আল্লার স্মরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

হে মন! মানুষের সম্মান প্রদর্শনের জন্য সৌজন্য বাড়িয়ে তোল!
আমি মহামান্য 'লাওলাকা'র সাথে কথা বলছি।

হে এতিম হওয়ার বন্দী! হে দুঃখের জেলখানার কয়েদী!
তোমার দ্বারা শ্রেষ্ঠ উম্মতের সরদারের প্রাণের আরাম।

নৈরাশ্য তোমার উপর এরূপ নির্যাতন করেছে–
বিষাদ–বেদনার ফরিয়াদ তোমার দিলকে চিরে ফেলেছে।

তোমার সম্বলহীনতা দেখে কেন আমার অন্তর জ্বালা করবে না?
তোমাকে নিরাশ্রয় বলতে লজ্জাবোধ হয়।

প্রাণের–স্তূপে বিদ্যুৎপাত হওয়া তোমার কাহিনী–
বক্ষপঞ্জরে তোমার প্রাণ নেই–আছে শুধু দুঃখের বিলাসাগার।

তোমার পরিত্যক্ত ভূমি–ধ্বংসের চাইতেও ভয়াবহ
আনন্দ যেখানে ভয় পায়–সেটাই তোমার নীড়।

তোমার অসন্তুষ্ট মনের কারণে আসমান কেঁপে ওঠে–
তোমার ফরিয়াদে গৌরবান্বিত আরশও নড়ে যায়।

তোমার ক্রন্দনরত চক্ষু আমার রক্ত অশ্রু ঝরায়
কেন তোমাকে প্রচ্ছন্ন বেদনায় ভারাক্রান্ত দেখতে পাই?

কেন তোমাকে আমি সম্বলহীন অবস্থায় দেখতে পাই?
কেন তোমাকে প্রাণহীন দেহের মত দেখতে পাই?

আমার উম্মত কি পয়গম্বরের দুঃখের শরীক (সহানুভূতি-শীল নয়?)
দুনিয়ায় কি কিয়ামতের শাফায়াতকারীর প্রেমিক নেই?

নবুয়তে যেমন আমার চাইতে অগ্রগামী কেউ নেই-
আত্মমর্যাদাবোধে তেমনি আমার উম্মত থেকে কেউ অগ্রসর নয়।

সাহস ও সততার পরীক্ষায় আর কেউ অগ্রসর নয়
মুসলমানদের চাইতে আত্মসম্মানবোধে কেউ এগিয়ে নেই।

এরা মনে প্রাণে আল্লার নামে উৎসর্গীকৃত
ফেরেশতারা যাদের উপর কোরবান হোন-এরা সেই মানুষ।

যাও, গিয়ে বল-হে মুস্তাফার বাগানের ফুলসমূহ
যামানার হাওয়া যেন তোমাদের প্রতি বিমুখ না হয়ে যায়।

অস্তিত্বের ময়দানে দাবী পূরণের জন্য-
এতিমের দোয়া শত আকসিরের ঈর্ষাযোগ্য।

এটা সেই জাদু-যাতে বঞ্চনার দৈত্য দূরীভূত হয়,
এটা সেই ব্যবস্থাপত্র যাতে পাপের ব্যথা দূর হয়।

এই দোয়া হাশরের ময়দানে অত্যন্ত কাজে লাগবে
আল্লার মহিমার সাক্ষীর (মোহাম্মদের) বক্ষ আলিঙ্গন করাবে।

আল্লার প্রেমের আগুন দিয়ে তোমাদেরে উত্তপ্ত করে তুলবে
মুসা (আঃ)ও যা দেখেননি তা তোমাদের দেখাবে।

যে রকম কারবালার শহীদদের প্রতি আমার ভালবাসা আছে
আল্লার কাছে তেমনি এতিমের দোয়া অতি প্রিয়।

নিজের সাহসের শিরাকে উত্তেজিত করা উচিত।
যামানাকে আহমদী মর্যাদাবোধ দেখানো উচিত।

দুঃখের বন্ধন থেকে এতিমদেরে মুক্ত করা উচিত
সম্মিলিত চেষ্টায় বদান্যতার এক দরিয়া প্রবাহিত করা উচিত।

এই পুরোনো আসমানের নীচে দৌলত ছাড়া কোন কাজই চলে না
সোনার পানি ছাড়া মকসুদের খেজুর বাগানে ফল আসে না।

'এতিম হওয়া'র বাযপক্ষীর শিকারের ছটফটানি অন্যরকম
যার তীক্ষ্ণধার হৃদয়ে প্রবেশ করে সে কাঁটা অন্য ধরনের।

ভাগ্য বিড়ম্বনার রোগের চিকিৎসা অন্যরকম
বিপদ–ব্যথার যন্ত্রণা মুক্তির মসিহ্ (ধন্বন্তরি) অন্য কেউ।

এই ব্যথা কলযায় ফুঁ দেয়, হৃদয়কে চমকিয়ে তোলে
তবে এটা স্নেহ ভালবাসার ব্যবস্থাপত্রে দূরীভূত হয়।

সৃষ্টির আরম্ভ থেকেই 'এতিমী' ইসলামের অনুরাগী ছিল
এতিমরাই প্রথম ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস হৃদয়বানদের কাছে ঘোষণা করছে
এতিমদের উপর ইসলামের দান অসীম।

যদি তোমরা বোঝ–তবে এটা শত কথার এক কথা
আমার এতিমী'র সম্মান রক্ষা এখন তোমাদেরই হাতে।।

ইকবালের কবিতা

মতিউর রহমান মল্লিক

❑হে খোদা মোর প্রার্থনা এই
তোমার দুয়ারে
খুব সাধারণ অন্তর চোখ
দাওগো আমারে
দৃষ্টিশক্তি দাওগো প্রভু
ভাগ্যাহত মানুষদের
দেখেছি হায় এই আমি যা
দাও দেখিয়ে তা তাদের

❑একটি মাত্র দিন–রজনীর
সফল বিজয় এলে
ডুব দিওনা ভোগ–বিলাসে
দায়–দায়িত্ব ফেলে
সামনে অনেক মনজিল আছে
অনেক যুগ যে আর
সব করতলগত করার
আয়ত্তে আনবার

❑প্রেম–দুয়ারে নীড় বাঁধো হে
তৈরী করো যুগ নবীন
সৃষ্টি করো নতুন সকাল
নতুন সন্ধ্যা ক্লান্তিহীন

❑দেখেছো কি চিন্তা করে
হে মুসলমান নওজোয়ান

কোন্ আকাশের বিচ্ছুরিত
তারা তুমি জ্যোতিষ্মান

❑সব কাফেরই যুদ্ধ করে
ভরসা তার তলোয়ার
মোমিন সে তো ঝাঁপিয়ে পড়ে
হোকনা খালি হাত তাহার।

❑একটি লক্ষ্য যায় হারিয়ে
যদি কভুও
পায় না যেন নাগাল হুতাশ
তোমার তবুও
আরো আছে শত উপায়
শত উপাদান
ঘুরছে আজো কালের চাকা·
সময় অফুরান।

[আল্লামা ইকবালের বিভিন্ন কবিতার খণ্ডাংশ]

গজল

(খণ্ডিত)

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

(ক)

কেন স্বর্গের উদ্যান হতে হুকুমে করিলে বার?
দুনিয়ায় কাজ এখন প্রচুর আমার প্রতীক্ষায়।
কাজের তালিকা হিসাবের দিনে আসিলে আমার পেশ
তুমিও লজ্জা পাবে আর মোরে ফেলিবে গো লজ্জায়।

(খ)

বিজ্ঞের কাছে কী আর শুধাব কি ছিল শুরুতে মোর,
চরমে কি আছে সেই চিন্তায় রয়েছি আমি বিভোর।
আপনারে করো এত উন্নত, সব ভাগ্যের আগে
খোদা খোদ তাঁর বান্দারে ক'বে বল্ কি বাসনা তোর।
এত বাৎচিতে কিবা প্রয়োজন? আমি যদি যাদুকর,
কি আমার যাদু! বেদনাই এই জীবনে যাদুর ঘোর।
আমি তো দেখেছি এর মাঝে আছে ভাগ্যের গভীরতা,
না শুধাও মোরে সখা সে কেমন কৃষ্ণ আঁখি চকোর।
এই জমানায় হলে ফিরিঙ্গি খোদার প্রেমেতে মস্ত,
ইকবাল তবে জানতো কত না খোদার প্রেমের জোর।
নিশাবসানের শব্দে আমার জিন্দগী দুর্ভর,
বলে দাও খোদা কোন্ সে পাপের এমন শাস্তি মোর।

(গ) (খন্ডিত)

ইয়া রব, এই জগৎ চলেছে খুব,
তবে কেন বৃথা জ্ঞানী আর কলাকার?
খোদায়ীতে তার মহাজনী আছে, তাই
ভাবে সবে খোদা ফিরিঙ্গি এ ধরার।
হুকুমতো তব ঠিকই, তবে কোরানের
অসার বানাতে পারে তার টীকাকার।
স্বর্গ তোমার যা আছে দেখেনি কেহ,
ফিরিঙ্গি দেশ সবি যেন আমার।
প্রতীচী প্রাচী না, খোদামস্ত দরবেশ,
দিল্লী ইরানে বাঁধা নয় ঘর আমার।
সত্য বুঝি যা সেই কথা আমি বলি,
মসজিদ সূত নহি বা সভ্যতার।
বন্ধু ক্রুদ্ধ অন্যেরা অখুশী,
বিষকে মধুর পারি নাই কহিবার।

হর্ হালে দিল্ খুশী ও বিমুক্ত,
কলির খুশীরে নহে মোর কাড়িবার।
খোদাতেও চুপ রহিল না ইকবাল,
করুক বন্ধ মুখ কেউ বান্দার।

(ঘ) (খন্ডিত)
দেখার হিয়াও খোদার কাছেতে চাও,
নয়নের আলো হৃদয়ের আলো নয়,
জ্ঞানের মাঝেও আছেই তো এক নেশা,
এ সেই স্বর্গ হূর যেথা নাহি রয়।

(ঙ)
তারার আরও আগেতে জাহান আছে,
প্রেম পরীক্ষা এখনো আরও আছে।
ছোট জীবনেতে লভ্য বাহার নয়,
হেথা শত শত কারোয়ারা চলিয়াছে।
থেকো না তুষ্ট রঙরূপে ধরণীর,
আরো আরো বাগ আরো ঘর রহিয়াছে।
এক তোর বাসা গেছে যদি কিবা দুখ,
দুঃখের ঠাঁই আরো আরো পাবে পাছে।
তুমি শ্যেন, জেনো ওড়াই তোমার কাজ,
সামনে তোমার আরো নভ পড়ে আছে।
এই রাতদিনে উদ্বেগে থেমো নাকো,
তব কাল তব মকান আরও আছে।
সভায় মৌন থাকার দিন আর নাই,
হেথা এবে মোর বন্ধু আরও আছে।

(চ)
শাহানশাহীর গুহ্য গোলামেরো জ্ঞাত
প্রেমে লব্ধ আত্মজ্ঞান তাহার যখন।

আত্তার রুমী ও রাজী অথবা গজালি
লব্ধ কিছু নয় বিনা প্রেমের রতন।
হে জ্ঞানী, হে নেতা, কেন হও হে হতাশ,
ভ্রষ্ট কিন্তু নিরাসক্ত নয় রাহীগন।
উধর্ব কামী হে বিহঙ্গ, সে ভোজ্যের চেয়ে
মৃত্যু ভালো আনে যাহে ওড়ায় পতন!
দারা সিকন্দর চেয়ে উচ্চ সে ফকীর
গন্ধ যাহে রয় খোদা-বীরের মতন।
সত্য পর নির্ভীক যে সেই তো জওয়ান,
জানে না খোদার বীর কাপট্য ছলন।

(ছ)

খোদার কাছে ইকবালেরে করল দোষী ফরিস্তারা–
দেখুন বড়ই অবাধ্য সে, উন্নতি এই ধরার করে,
এই ধরণীর মানুষ সে তো কিন্তু করে আকাশী ঢং,
রোম ইরাকে রয় না, না রয় কাশী সমরকন্দ 'পরে।
ফরিশ্ তাদের সে শিখাল মানবমনের উদ্বেলতা,
খোদাবন্দী হয় কেমনে তাই শিখিয়ে দেয় সে নরে।

(জ)

সব ঠাঁই থেকে আগে আগে চলে নতুন চাঁদ,
কে পেল কামাল বলনাগো দিয়ে দামকে বাদ।
আপনার বলে ফুটলেও কলি তাতে বা কি?
হ'ল নাকো যা সে ফুলে তপন কিরণ পাত?
দৃষ্টি তোমার পবিত্র যদি, হৃদয়ও তাই,
খোদার আদেশে দিল্ সদা চলে চোখের সাথ।
রৈল না বেঁচে কেয়ারিতে দুখী ফুলের দিল্,
এই এ জাহানে গম ও যবের নাহি বেসাত।
রয় নাই বাকি আইবক ঘোরী ফতোয়া আর,
মিষ্টি ও তাজা সদা আছে খুসরু নাদ।

(ঝ)

বিজ্ঞের কাছে সংবাদ ছাড়া আর তো কিছুই নাই,
উপশম তব নজর ব্যতীত আর তো কিছুই নাই।
সব ঠাঁই থেকে আরো আরো আগে রয়েছে মোকাম তোর,
জীবনে মজার সফর ব্যতীত আর তো কিছুই নই।
যদি হয়ে থাকে দামী সে তো তবে খুদী হেফাজৎ তরে,
নয়ত মোতীতে, সলিল ব্যতীত তার আর তো কিছুই নাই।
শিরায় শিরায় ছোটে যদি খুন কিবা লাভ বল তাতে?
হিয়ার বেদনা ব্যতীত জীবনে আর তো কিছুই নাই।
লালিম ফুলেতে পর্দা লাগানো মোর মুনাসিব নয়,
আমি তো ভোরের মলয়, আমাতে আর তো কিছুই নাই।
যাহারে মন্দ বলি ভাবে ঐ ফিরিঙ্গি ব্যবসায়ী
কলা-মূলধন ব্যতীত তাহাতে আর তো কিছুই নাই।
বড় দয়াবান তবু ইকবাল নিশ্চুপ, বলি শোনো,
অঙ্গার দানে গর্মী ব্যতীত আর তো কিছুই নাই।

(ঞ) (খন্ডিত)

দিল্‌-এ নাই দুখ নয়নে পবিত্রতা,
আজব কি তবে বীরতা তোমার নাই?
এই মাটিতেই গুপ্ত আলোক তৃষা,
তুঙ্গ অলস! সে খবর তব নাই।
উজল যে চোখ ফিরিঙ্গি সুর্মাতে,
বচন চতুর, ব্যথাভার তাহে নাই।
সূফী ও মোল্লা কী জানে খবর মোর?
আপাদশীর্ষ শুচিতা ওদের নাই।
কতদিন রবে ভাগ্য তারার তাবে?
রব না আমি বা রবে না ও তারারাই।
আমি বিদ্যুৎ, মরু পর্বতে চোখ,
আমার নজরে তৃণ গুল্মাদি নাই।

দুনিয়ায় দাবি জানবাজ মোমিনের,
মোমিন নয় যে রসুলের প্রেমে নাই।

(ট)

কিবা ভালোবাসা চাওয়ার জীবন যার?
থাকার সনেতে কিবা প্রেম না থাকার?
যে প্রেমের শমা নেভেগো মৃত্যু ফুঁয়ে
তাতে কই মজা ব্যাকুল প্রতীক্ষার?
কি মোর সাধ্য? ক্ষণিকের এক প্রাণ,
ফুলকি আগুনে ঠিক নয় বচসা।
আগে কর মোরে স্থায়ীর জীবন দান,
দেখো ফের শখ প্রাণে মোর বে-করার।
দাও সেই কাঁটা বেধন যাহার স্থায়ী,
ইয়া রব, স্থায়ী আর্তি যে বেদনার।

(ঠ)

শুধাও উহারে, নিজ প্রকৃতির সাক্ষ্য সদাই সত্য,
পেয়েছো ঠিকানা? কিম্বা বৃথাই ঘুরছো স্বর্গ মর্ত্য?
মুসলমান সে হলে হে কাফির শাহী নয় না ফকিরী,
মোমিন যে হয় ফকিরীর মাঝে শাহী রয় তার সত্য।
কাফির যে হয় ভরোসা কেবল আপনার তরবারে,
মোমিন যে তার বিনা তরবারে সংগ্রামে আধিপত্য।
কাফির হয় যে মুসলমান সে রয় তকদীর তাবে,
আর সে যদি গো হয় হে মোমিন তকদীর তার ভৃত্য।
আমি তো করেছি গুহ্য যা দিল তার পর্দাটি ফাঁস,
কিন্তু তোমার দৃষ্টিপীড়ক ব্যাধিটিতে প্রাচীনত্ব।

শিশুর প্রার্থনা

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

প্রার্থনা হয়ে আসিতেছে মুখে যাহা কিছু আমি চাই,
হে খোদা আমার জিন্দেগী হোক শমাসম রোশনাই।
এ দুনিয়া থেকে আমার দমেতে আঁধিয়ার হটে যাক,
যত ঠাঁই আছে সব ঠাঁই মোর চমকেতে চমকাক।
হোক গৌরব আমার দমেতে মোর এই স্বদেশের,
ফুলের কারণে যথা গৌরব হয় ফুল বাগানের।
পরোয়ানা-প্রেম সম ইয়া রব হোক মোর এ জীবন,
জ্ঞানের শমার সেন ইয়া রব হোক প্রেম বন্ধন।
দরিদ্র যারা, মোর কাজ হোক তাহাদের হিমায়ৎ,
দরদীর নে বিজ্ঞের সনে হোক না মুহব্বৎ।
যা কিছু খারাপ, আল্লা, তা থেকে রেখো গো বাঁচিয়ে মোরে,
যে পথ পুণ্য সেই পথে মোরে নিওগো চালনা ক'রে।

আফ্‌তাব

[গায়ত্রী মন্ত্রের অনুবাদ]

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

(সূর্য)

ওহে আফ্‌তাব, এই দুনিয়ার জিন্দগী হও তুমি,
এই কায়েনাৎ–কিতাবের হও বাঁধন সূত্র তুমি।
তুমিই রয়েছ প্রকাশ গোপন উভয় স্থিতির প্রাণ,
তোমারি কারণে শ্যামল চমন অতীত বর্তমান।
তোমারি কারণে রয়েছে কায়েম পঞ্চ ভূতের মেলা,
তোমারি কারণে প্রাণের আকুতি জীবনের লীলাখেলা।
তব দীপ্তিতে বস্তুনিশ্চয় আপনার স্থিতি পায়,
আপাদ শীর্ষ জীবনেতে ভরা এই তব উজালায়।

যা হতে জগৎ লভিছে আলোক ঐ সেই আফ্‌তাব,
লভে সে হৃদয় আত্মা প্রজ্ঞা সমুদয় মহাভব।
ওহে আফ্‌তাব, কর আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান দান,
প্রজ্ঞা নয়নে তব উজালায় কর গো দীপ্তিমান।
এই জগতের মহ্‌ফিল লাগি সামান প্রদানো তুমি,
উচ্চে ও নীচে রয়েছে যাহারা সকলের খোদা তুমি।
তোমার স্থিতির কামাল ভবেতে যত আছে জান্‌দার,
তোমারি প্রকাশ দুনিয়ায় যত পর্বত লাগাতার।
সব বস্তুর জীবনের হও তুমি হে পালক একা,
দেবদূতগণ প্রধানের তাজ তোমার শীর্ষে লেখা।
নাহিক তোমার সূচনা কোথাও নাহি তব অবসান,
সুরু ও শেষের বন্ধন হতে মুক্ত তুমি মহান।

একটি প্রার্থনা

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

দুনিয়ার যত মহ্‌ফিল পরে হে খোদা তিক্ত আমি,
কিবা আনন্দ মজলিসে বল প্রাণই যদি যায় থামি।
কলরব থেকে পলায়িত আমি, প্রাণ মোর চায় এবে
এমন শান্তি যার কাছে হয় বচনো বিলোপকামী।
শান্তির তরে মরছি আমি গো, বাসনা আমার এই ঃ
পাহাড়ের কোলে ছোট্ট সে এক কুটির পাই গো আমি।
চিন্তার ভার মুক্ত আমার যাবে দিন নিরালায়,
প্রাণ হ'তে যত দুঃখের কাঁটা হবে গো বহির্গামী।
সরোদের মতো হবে উত্তম বিহঙ্গ কলতান,
ঝর্ণাধারার কলরোলে সেথা আসে সঙ্গীত নামি।
ফুলের কলিকা ফুটে কলের শোনাবে বার্তা কারো,
পান-পেয়ালায় দুনিয়ার যেন দেখা পেয়ে যাই আমি।
উপাধান করি বাহু আমি শোব সবুজের বিছানায়,
নিরালা নেহারি সমাবেশে সেথা আসুক লজ্জা নামি।

মোর বুলবুল এমন আমার হয় যেন অনুগত,
ছোট তার প্রাণে মোর লাগি কোনো রবে না সন্দ থামি।
দুধারে এমন শ্যাম সমারোহে রবে সবুজের সারি,
নদীর স্বচ্ছ বারি যেন তার হয় গো চিত্রকামী।
পাহাড় এমন শোভা দিয়ে তার ভোলাবে হৃদয়টিরে,
সলিল যেন গো ঢেউ হয়ে হয়ে হয় সে দৃশ্যকামী।
ভূমির কিনারে রবে গো শয়নে সবুজের সমারোহ,
কুঞ্জ মাঝারে সলিল যেন গো চমকায় থামি থামি।
ফুলের বৃন্ত ঝুঁকে ঝুঁকে ছোঁবে তার নীচে সলিলেরে,
সুন্দরী যেন আয়নায় নিজে হেরিছে গো অবিরামই।
তপন যখন সাঁঝের বধূরে মেহেদি লাগিয়ে দেবে,
সোনালি লালিমা ফুলে ফুলে দেবে পরায়ে পোশাক দামী।
তার লাগি মোর ভগ্ন দীপক আশার আলোক হবে,
ক্লান্ত যে জন থেমে গেছে পথ ভ্রমিয়া সারাটি যামী।
আসমান যবে মেঘে মেঘে রবে ঘিরে গো, তখন তাকে
দেখাবে আমার কুটিরের পথ বিজলীর পাগলামী।
আদি প্রহরের ঐ যে কোয়েল ভোরের মুঅজ্জীন,
আমি আর সে একে অপরের হব স্বর অনুগামী।
শুনি যেন কানে যত শুভ কথা মন্দিরে মসজিদে,
মোর কুটিরের গবাক্ষ পথে আসে যেন যাদু নামি।
শিশির যখন ফুলেরে করাবে ওজুর প্রক্ষালন,
অশ্রু আমার ওজু হোক আর নালা হোক দোয়া দামী।
নৈঃশব্দের উঁচুতে আমার উঠুক আর্তি যেয়ে,
তারার দলের মিছিলে আমার শব্দ রহুক থামি।
আমার কান্না যে আছে বেহুশ হয়তো জাগাবে তারে,
কাঁদাবে তাহারে যেই জন আছে দরদী-হৃদয়-স্বামী।

কবি

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

জাতি যেন দেহ, মানুষ অঙ্গ তার,
হস্ত ও পদ কারিগরি সম্ভার।

প্রশাসন-সভা তার মুখ প্রসাধন,
নয়নের আলো রংগীন কবিগণ।
অঙ্গে বেদনা, আঁখিতে অশ্রু ঝরে,
কত সমব্যথা সবা লাগি আঁখি ধরে।

দুখের বাছা

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার ছুরিটি কেড়ে নিনু বলে কাঁদিতেছ তুমি তাই,
করিলাম দয়া, তুমি ভাবিতেছ মোর মনে দয়া নাই।
হে নবজাতক, পড়ে পড়ে কাঁদা মনেতে দুখের ভার,
ছুঁয়োনাক যেন, করমের মুখ বড়ই তীক্ষ্ণ ধার।
তারে তুমি কেন এত চাও দেয় তোমারে দুঃখ যেই,
খোলো কাপড়ের টুকরোটি নিয়ে, এতে তো বিপদ নেই।
কোথায় তোমার বলটি, কোথায় বেড়ালটি চিনেমাটি–
সেই এতটুকু জন্তুটি যার মাথাটি গিয়েছে কাটি?
ছিল না তোমার মন-আয়নাতে চাহিদার কোনো ধূলো,
জানার নয়ন খুলে জ্বলে ওঠে আগুন বাসনাগুলো।
রূপটি তোমার হাতের কাঁপনে গুপ্ত চোখ চাওয়ায়,
দাবিটি তোমার সদা নব নব নতুন নতুন চায়।
তোমার জীবন মুক্ত তোমার বাধা নয় বিশেষতা,
তোমার নয়নে ব্যক্ত কিন্তু গুপ্ত প্রকৃতি কথা।
মোর কাছে কাঁদো উচ্চে যখন, কারো 'পরে বিগড়াও,
কিবা মজা তুমি বাজে কাগজের ডেলাটিতে ভুলে যাও।
তোমার এখন ভাবটি যেমন, আমারো তো ভাব তাই,
ক্ষণিকে তোমার আশ নাই আর মোরো তাতে আশ নাই।
নব আনন্দ প্রেমিক আমি হে করি কত চীৎকার,
যত দ্রুত আসে ক্রোধ উপশম তত দ্রুত আসে তার।
আমার আঁখিতে আনে প্রলোভন প্রকাশিত রূপখানি,
তুমি তো অবুঝ, মোর না-বোঝাও কম কিছু নয় জানি।
তোমার মতোই কভু কাঁদি আমি কভু হাসি তোমা সম,
দেখতেই আমি নব যুবা, মূলে অবুঝ বালকোপম।

শুকতারা

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

কেঁদে কেঁদে বলে শুকতারা এক ভোরে–
দিয়েছে দৃষ্টি দেয়নি সময় মোরে।
সূর্যের থেকে সবাই জীবন পায়,
প্রভাব সকাল দেয়নি তো গো আমায়।
ভোরের তারকা, কত বা সে বলবান,
ফুলকির আলো, যে বুদবুদ প্রাণ।
ঊষা শিরোমণি, বলি তারে তবে আমি,
লুপ্তির ক্ষোভ? নভো ছাড়ি এসো নামি।
এসো নামি নীচে শিশির সাথীর সনে,
রচনা বাহার আমার গণজীবনে।
আমি মালি, মোর বাগানে প্রেম বাহার,
মহাকাল ম বুনিয়াদ পায়েদার।

চাঁদ ও তারা

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

একদা প্রভাতে ভোরের ভয়েতে থাকি
চাঁদে বলে যত প্রভাতের তারা ডাকি ঃ
দেখার সকলি আকাশের 'পরে রবে,
চমকি চমকি আমরা ক্লান্ত সবে।
চলাই মোদের কাজ গো সকাল শাম,
চলা চলা শুধু চলা, নাই বিশ্রাম।
এই দুনিয়ায় সকলেই অস্থির,
যারে ধীর বলে আসলে সে নয় ধীর।
বেচারারা বে নাচার সফর করে,
তারারা, বৃক্ষ, লতাগুল্ম ও নরে।
এই এ সফর হবে কভু অবসান?

আসিবে নজরে কভু কি বাসস্থান?
চাঁদ বলে, ওহে আমার বন্ধুগণ,
রাতের ক্ষেতের ফসল কুড়ানী জন,
গতিই জীবন জেনো এই দুনিয়ার,
অতি পুরাতন রীতি এই এ ধরার।
দৌড়ে চলিছে এই জমানার হয়
খেয়ে তাগাদার কোড়া কড়া অতিশয়।
এ পথের মাঝে নাই ঠাঁই নাই ঘর,
স্থৈর্য্যের মাঝে মৃত্যু গোপন চর।
যারা চলে তারা এগিয়ে গিয়েছে দূর,
যারা থামে কভু, পায়ে পায়ে তারা চুর।
রূপ তার ফল নাম যার হয় গতি,
প্রেম এর শুরু এর পরিণতি।

সাকী

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

খাইয়ে নেশা পতন করা সে তো সবাই পারে,
পড়ছে যে তায় থামাও, মজার সেই তো কারণ নাকি?
যে পুরাতন মদ্যপায়ী সে চায় উঠে যেতে,
কোথাও থেকে অমর সলিল জোগাড় কর সাকী।
হুজ্জুতে আর হাঙ্গামাতে কাটলো তোমার রাতি,
ভোর হ'ল ঐ এবার খোদায় স্মরণ করা বাকি।

শেক্‌স্‌পীয়র

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

ভোর লালিমার আয়না সে নদী ঠমকে ঠমকে চলে,
সাঁঝ সঙ্গীত আয়না খামোশী কভু কথা নাহি বলে।
বসন্ত শোভা আয়না বৃক্ষ পত্রপুষ্প ভরা,
মদিরার তরে দর্পণ তার পাত্র পূর্ণ করা।

রূপ সে খোদার আয়না আর সে রূপের আয়না দিল্,
তব রচনার রূপের সঙ্গে হিয়া আয়নার মিল।
আকাশচুম্বী তব চিন্তার রসেতে ধরণী ধনী,
তব প্রকৃতিরে বল রওশন করিল কি এ ধরণী?
সত্যান্বেষী তোমারে যখন করিল অন্বেষণ,
সূর্যোত্তাপে গুপ্ত সূর্যে করিল নিরীক্ষণ।
তোমার গোপনে দেখিতে নারিল দুনিয়ার আঁখিতারা,
তোমার নয়ন দেখিল ধরায় যেন উলঙ্গ পারা।
গোপনে যে রাখে প্রকৃতির তার এমনিই ব্যবহার,
গোপনে যে জানে এমন তো কারে দেবে না সৃষ্টি আর।

জীবন

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

সুদ ও ক্ষতিকে ছাড়িয়ে এই জীবন,
কভু জান আর কভু এ মহৎ পূজন।
প্রতিদিনকার মাপেতে এরে না মাপো,
সদা এ তেজ চলিষ্ণু যৌবন।
আপন দুনিয়া বানাও জিন্দা যদি,
এ মানব-সার, জেনো এ "কুন" সৃজন।
পাহাড় যে কাটে জীবন কী তারে পুছো,
কুঠার পাহাড় শম এ জীবন পণ।
ক্ষীণ জলধারা অধীনের শেষতক,
জীবন স্বাধীন সমুদ্র উচাটন।
মুক্ত জীবন প্রকাশের শক্তিতে,
যদিও মাটির মূর্তিতে সে গোপন।
জগৎ সাগরে তুমি যেন বুদবুদ,
এ ক্ষতি-খানায় জীবনি পরীক্ষণ।
যত খন কাঁচা মানুষ তুমি মাটির,
হলে পাকা হও তুমি খোলা শমশীর।

সত্যের তরে মরিতে যে আনচান,
মাটি মূর্তিতে আগে দিক সেই প্রাণ।
সে জ্বালিয়ে দিক এই এ আকাশ মাটি,
ভস্মে গড়ুক নতুন নিজ জাহান।
গোপন শক্তি প্রকাশুক জীবনের,
স্ফুলিঙ্গ হোক আলোক সে অফুরান।
প্রাচ্য ভূমিতে জ্বলুক সূর্যবাণী,
চমকিলা হোক ফের চুনি-নির্মাণ।
পতিত হে, বলো, "আল্লাহু আকবর",
তারায় করহে মিত্রের সন্ধান।
কেয়ামৎ কাল এই আর তুমি আছ তার খর্পরে,
বে-খবর, কাজ দেখাও তো কিছু থাকে যদি দফতরে।

ইকবালের ব্যঙ্গ কবিতা

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

(ক)

মেয়েরা এখন পড়িতেছে ইংরাজি,
প্রগতির পথ জাতি পেল সন্ধানে,
দৃষ্টিতে আছে পাশ্চাত্যের পরী,
প্রাচ্যের চাল পাপ বলি মনে জানে।
এই এ নাটক দেখাবে দৃশ্য কোন ?
নজর রয়েছে পর্দা ওঠার পানে।

(খ)

জেল থেকে এই আয়াৎ নাজিল হল–
গীতায় কোরান কোরানেও গীতা পাই,
কত ভালো হয় মিলিলে বিপ্রে শেখে,
এ না হারে আর ওনা জেতে এ লড়াই।
মন্দিরে হিঁদু আগেই বেজার আছে,
মসজিদ জেদী ছাড়ছে না মিয়াঁ ভাই।

(গ)
শেখ সাহেবো তো পর্দার কিছু নহেকো হে অনুরাগী,
বৃথাই কলেজ ছোকরারা সবে তাঁর বিরোধিতা করে।
ধর্ম ভাষণে সাফ সাফ তিনি বলে দিয়েছেন কাল–
মরদি যখন আওরৎ হল পর্দা কিসের তরে?

(ঘ)
জান্ যাক হাত দেখে সত্য না যান–
তত্ত্ব এ বাণী সব ধর্মেতে পান।
একটিই বস্তার চট এরা সব–
সাহুকার, জমিদার আর সুলতান।

(ঙ)
শুনলাম কাল কারখানাতে হচ্ছিল এই কথা–
জীর্ণ যত ঝুপড়িগুলোয় কারিগররা থাকে,
কিন্তু কেমন কাউন্সিল হল্ বানালো সরকার,
ছিলই নাযে পুঁজির হেথা তাকিয়া এর আগে!

(চ)
পুবের মোদের পশ্চিমে দিল্ আটকেছে, সব দিচ্ছে পাড়ি,
সেথায় চিকন ডিকান্টার আর হেথায় প্রাচীন মটকি হাঁড়ি।
এই জমানায় শেষ হবে সব, বাকি কেবল সেই তো রবে
আপন পথে যে রয় কায়েম আর যে আপন জিদ্দি ধারী।
শুনছো গো শেখ শুনছো বামুন শুনছো কিবা বলছে জ্ঞানী
কোথার থেকে নোংরামিরা ফেলল এদের পটকা মারি।
পেয়ার জলসা কায়েম ছিল আর ছিল রীৎ মুহব্বতের,
এখন তর্ক হিন্দী উর্দু হালাল কিংবা ঝটকা ঝাড়ি।

(ছ)
উঠিয়ে বাইরে গলি মাঝে ছুঁড়ে দাও
গন্ধ আন্ডা নব এ সংস্কৃতির।
ভোট, মেম্বারি, সভাপতি, কাউন্সিল,
বানিয়েছে খুব ফাঁদ এই আজাদির।
ধার যে বড়ই ইয়োরোপী রাঁদাটির।

(জ)
হাতের থেকে বেরিয়ে গেল এই দুনিয়ার ছোঁয়া,
ভবিষ্যতের কথাও গেল দিলের থেকে চলি।
শেখ সাহেবো লড়তেছিল ওকফ্-কানুন লাগি,
ওকফে কি জায়দাদ আছে? শুধাও তাঁরে, বলি।

(ঝ)
কলকারখানা মালিক কাজের নয়,
আয়েস পুতুল, শ্রম করা নাহি চায়।
কোরান বলিছে, খেটে খাও সবে নিজে,
কেন মজুরের শ্রমফল ধনী খায়?

(ঞ)
নিশীথে মশক আমারে শুনায়ে গেল
অন্তবিহীন বাণী তার মর্মের–

একটি তো ফোঁটা আমারে শোণিত দেও,
বদলে তৃষ্ণা সহি সারা নিশীথের।
আর এ জমির মালিক মুফতে দেখ
সকল রক্ত খেয়ে গেল কিষানের।

(ট)
কিবা মুশকিল মেম্বারি কাউন্সিলে
ভোট পাওয়া যাবে, কড়ি ঠিক পাব না কি ?
মির্জা গালিব, খোদা ভালো করো, ঠিক
বলেছেন, 'কিবা খাব দিল্লীতে থাকি ?'

(ঠ)
মসজিদতো বানিয়ে দিল ধার্মিকেরা একটি রাতে,
মন যে আমার পুরান পাপী, নমাজী আর বনল নারে।
কেমন আমীর ফৈজলেরে সন্ন্যাসী বাৎ শুনিয়েছিল–
নামের তুমি হেজাজী ঠিক, দিল্-হেজাজী বনলে নারে।
অশ্রুতে চোখ ভেজেতো ঠিক, এই রোদনে কী আর মজা,
হৃদয়-রক্ত যখন মিশে অশ্রু মোতী বনল নারে।
ইকবাল বড় উপদেশক, কথায় কথায় মন সে কাড়ে,
কথার গাজী সে তো বটে, স্বভাবগাজী বনল নারে।

ভারত সঙ্গীত

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

সারা দুনিয়ার সেরা দেশ এই মোদের হিন্দুস্তান,
মোরা বুলবুল তার, সে মোদের কুসুমের উদ্যান।
বিদেশ বিভুঁয়ে থাকি যদি কভু
প্রাণ আমাদের দেশে রয় তবু,
যেথা প্রাণ জেনো আমরাও সেথা রহি গো বিদ্যমান।
আকাশের সাথী ঐ যে ভূধর
সবাকার চেয়ে উচ্চ শিখর,
সে-ই আমাদের সেনানী, মোদের রক্ষক সুমহান।
অগণন নদী কোলে করে খেলা,
বারি সিঞ্চিত কুসুমের মেলা,
কিবা তার কাছে স্বরগের বন নন্দন অতুলান।
সেদিনের কথা পড়ে কিগো মনে
পুণ্য সলিলা গঙ্গা, যে ক্ষণে
আসি তোর নীরে প্রথম আমরা করেছি পুণ্যস্নান ?
মোদের ধরম কভু নাহি কয়
শত্রু করিতে ভ্রাতৃ নিচয়,
হিন্দুস্তান জননী, আমরা সবে তার সন্তান।
আছিল মিশর, আছিল য়ুনান,
ছিল রোম, আজি কি আছে প্রমাণ ?
জগতের বুকে দেখো আজো মোরা রহিয়াছি গরীয়ান।
শত শতাব্দী রহিয়া আঁধার
আজো কেন দীপ জ্বলে অনিবার ?
আছে কেন আছে জগতের বুকে আমাদের সন্ধান ?
ইকবাল কহে জগৎ মাঝার
বন্ধু মোদের কেহ নাহি আর,
কেবা জানে আর মোদের গোপন বেদনার সন্ধান।

শেকওয়া

شکوہ

শেকোয়া

আশরাফ আলী খান

সর্বহারা চিত্ত আমার এই কথাটি বলতে চাহে,
লোকসানেরি সওদা করি চলছি খোদা তোমার রাহে;
বর্তমানের ক্ষেত্র আমার শস্যবিহীন, শুধুই ফাঁকি
দূর অতীতের শব-দেহকে সামনে রেখেই তুষ্ট থাকি।

গোলাব কুঁড়ি নই আমি যে, রইব পড়ি কাঁটার ঝাড়ে,
টলবে নাক' পাষাণ-হিয়া বুলবুলিদের হাহাকারে!
তীব্র কথার খোঁচায় আমি বিশ্ব-ভুবন কাঁপিয়ে তুলি
দুঃখ শুধু তোমার কাছেই কণ্ঠ আমার হারায় বুলি।

"ভালো-মন্দ হোক না যাহা, প্রভুর আদেশ মানব মোরা।"
এই নীতিতেই বোবার মতো লক্ষ আঘাত সইছে ওরা,
ধর্ম ধর্ম করে কেবল কাৎরে মরে মূর্খ সব,
দেখছে না কি পাশেই চলে ধর্মহীনের মহোৎসব!

ধূ-ধূ জ্বলে ব্যথার আগুন-হৃদয় আমার অগ্নি-গিরি,
মাফ্ করিও, তারি খানিক উঠবে আজি পাষাণ চিরি;
জীবন ভরি' যারা তোমার প্রশংসারই পড়ল নামাজ
তাদের মুখের কুৎসা খানিক নাওনা শুনে রাজাধিরাজ!

যুগ-জামানা তোমার আয়ু জানো তুমি সবই জানো,
সবক দেওয়া তোমার সে যে প্রদীপ দিয়ে দিন দেখানো!
জানো তুমি, ছিল যেদিন ফুল বাগানে ফুলের মেলা,
বুলবুলি সে গাইত সুখের স্রোতে ভাসিয়ে ভেলা;

ফুলের শোকে আজ কাতর, শুনতে হবে নালিশ তাহার,
হাকিম তুমি, দোষীও তুমি–বিচার হবে শাহান–শাহার।
বিশ্বে তোমার নামের কদর সে না হলে কে বাড়া'ত?
বাতাস বিনা ফুলের সুবাস দেশ–বিদেশে কে ছড়া'ত?

আজকে নালিশ তোমার নামে, এই কি তোমার খোদাই কাম্?
পাপীরা হয় জান্নাতী আর পুণ্যবানের জাহান্নাম?
বিশ্ব ছিল পাগলা–গারদ, ধারত না কেউ কারো ধার,
কেউ পূজিত পাথর নুড়ি কেউ বা ইতর জানোয়ার,

বলগা ছেঁড়া ঘোড়ার মত ছড়িয়ে ছিল বিশ্বতল,
মোরাই তাদের তাড়িয়ে নিয়ে ভরিনু তোমার আস্তাবল।
চক্ষে আপন দেখার আগে তোমায় খোদা মানত কে?
মোদের হুনোর তাকৎ বিনা তোমায় বলো চিনত কে?

বিশ্বে ছিল কতই জাতি বদকারী আর ফেরেব্ বাজ,
তারাই তখন জগৎ জোড়া, বিন্দু মোরা সিন্ধু মাঝ;
হিন্দু ছিল ভারত ভূমে কাফরী ছিল আফ্‌রিকায়,
নিবিড় বনেও মানুষ ছিল হিংস্র ভয়াল পশুর প্রায়;

সেলজুশী আর তুরানবাসী এহুদ চীনা–আর ঈসাই,
সবই জানো, আল্লা মিঞা, বোললে কি আর সার্‌বে ছাই?
তোমার নামে জীবন পণে ধরত্ কেবা হাতিয়ার?
কেই–বা এমন ভোল ফিরা'ল পঙ্গু তোমার সৃষ্টিটার?

আরাম ছিল হারাম মোদের–যুদ্ধভূমি খেলার মাঠ,
জলে–স্থলে ফিরনু করি' শয়তানের লুঠ্ লোপাট।
ইউরোপের ঐ গির্জা শিরে উঠত তোমার পাক–আজান,
তকবীরে যার শাহারাতে সাইমুমেরও কাঁপত জান;

শক্তিপাগল বাদশা' যারা ফেরাউনের খাস মুরীদ,
অহংকারে পায়ের তলায় ভাঙতে চাহে ধরার ভিৎ;
মোদের দোয়ার পাত্র তারা, মূষিক হোতেও শক্তিহীন,
তেগের তলে কল্‌মা সাথে বাজ্‌ত মোদের হৃদয়–বীণ।

একটি লড়াই জয় করেছি আর লড়ায়ে ঝাঁপ দিতে;
তোমার নামেই মৃত্যু জহর পান করেছি শান্তিতে;
ধন অথবা তখত লাগি নয়ক' মোদের যুদ্ধ জয়,
কেউ কি ধনের বিনিময়ে ছাড়তে পারে মরণ–ভয়

লক্ষ–হাজার স্বর্ণ হীরার প্রস্তাবে যে দেয়নি কান,
পাষাণ হয়ে করল গুঁড়া পাষাণ গড়া মূর্তি খান;
তাদেরও কি থাকতে পারে স্বার্থ–সেবার ক্ষুদ্রতা
বললে কেহ, বলব মোরা তার চেয়ে নেই ঝুট–কথা।

যেই বিপদে পিঠ ফিরা'ত শত্রুদলের শ্রেষ্ঠ বীর,
ঝড়ের মুখে পাহাড় সম ছিলাম মোরা উচ্চশির;
তলোয়ার ত' তুচ্ছ কথা! সে আমাদের শিশুর খেল্‌
তোপের মুখে প্রাণ বিলাতে আমরা ছিনু হাতেম দেল্‌।

তোমার নামের বেইজ্জতী করত কভু যে এক তিল,
ক্ষমার কথা! হারাম সে যে, হতাম তাহার আজরাঈল!
তারাই আজি মরণ–পথিক বাঁচাই সেরেফ যাদের হক্‌
জীবন পণে যারা তোমার তৌহিদেরই জাম–বাহক।

তুমি বল হেলায় কা'রা করল হাজার জঙ্গ জয়?
অহংকারী শির করিল পথের ধূলার সঙ্গে লয়?
অগ্নি–পূজার নিভল আগুন তোমার নামে ছায় ইরান;
ফুলের সাজে সাজল যে দেশ, করল কাফের হায় বিরান?

তকবীরে কা'র মাটির পুতুল জিন্দা হোত–খুলত প্রাণ?
দগ্ধ মরুর বালুকায়ও ডাকত মহা প্রেমের বান।
স্থবির ধরায় করল কারা নও–জওয়ানির উদ্বোধন?
করল কেবা রাজ্যে তোমার লক্ষ্য ভুলের সংশোধন?

রণ ভূমি সে সৃষ্টিনাশা প্রলয় নদীর ভাঙ্গনকূল,
সেথাও মোদের পড়তে নামাজ বারেক তরে হয়নি ভুল;
ভৃত্য মনিব ছোট বড় কেউ বা গরীব, কেউ প্রধান,
চরণ ঘাতে চুর করিনু আমরা সে সব ব্যবধান;

তোমার রাহে যখন মোরা মনের ঘোড়ায় হই সওয়ার,
জালিম হৃদয় শংকা দোদুল ভীরুর বুকে বয় জোয়ার,
এক জামাতে সবাই যখন হাজির তোমার দরবারে,
ভেদ কিছু কি পাও দেখিতে কম জোরে আর জোরব রে?

এই দুনিয়ার ম'ফিল মাঝে ফিরনু কত সাঁঝ সকাল,
বেঈমানীর সিন্ধু জুড়ি, পাতনু তোমার নামের জাল;
তোমার বাণী করতে প্রচার ফিরনু মরু–পর্বতে
ভরনু সকল প্রাণ পেয়ালা তৌহিদের শরবতে;

মোদের তরে মুক্ত ছিল হর্ জাহানের সব দুয়ার,
অতল সাগর টপকে যেত মোদের যত ঘোড়–সোয়ার;
এ সব কাজে বল মোদের দেখলে কোথায় ব্যর্থতা?
যেথায় গেছি, জয় করেছি, এইত জানি সার কথা।

জড়বাদ আর নাস্তিকতার করনু মোরা মূলোচ্ছেদ,
হীন গোলামীর শিকল–পরা মানুষ ভা'য়ের ঘুচল খেদ;
ইব্রাহীমের সাধের কাবা–তাও ছিল যে বোত্‌খানা,
মোদের বলেই আজ সে কাবা বিশ্ববাসীর আস্তানা।

তোমার বাণীর করতে আদর কেই–বা ঘামায় নিজ মাথা;
মোদের হাফেজ–বুকে তাহার প্রতি হরফ রয় গাঁথা;
তবুও যদি বলবে মোদের কৃতজ্ঞ আর সব নিচু
বুঝব তবে বুঝব তোমার হৃদয় বলে নেই কিছু

আজকে রাতে বোতখানাতে ধুম লেগেছে উৎসবের,
নানাভাবে শতেক রূপে হচ্ছে পূজা ভূত সবের;
কাফের যারা বলছে ডেকে আজকে সবাই ফুল্ল–প্রাণ,–
"প্রতিমাদের ধ্বংসকারী ধ্বংস আজি মুসলমান।"

ধ্বংস তারা, আর তাহাদের গ্রন্থ কোরান–তাও বিলীন,
এই দুনিয়ার পান্থশালায় নেইক' তা'দের কোনই চিন্।'
আজ তৌহিদের চৌদিকেতে ডাকছে ভীরু বন্ শিয়াল,
নামটি তোমার যাচ্ছে ডুবে, তায় কি তোমার নেই খেয়াল?
মূর্খ নাদান হল প্রধান রত্নমানিক ঢের তাদের,
এদিক মোরা সর্বহারা–কাদায় পড়ে রইল শের;
কাফের তরে গড়লে তুমি এই জগতের স্বর্গপুর,
শোনাও মোদের ভুয়ো কথা মরণ পরে আসবে হুর;

তোমার মাঝে মোদের মাঝে দেওয়া–পাওয়ার সেই সেতু
কেমন করে ভাঙল হঠাৎ বুঝতে নারি তার হেতু;
ঠুন্‌কো প্রণয় তোমারও কি এক আঘাতে যায় টুটে?
নরের মত চোখের নেশা ভোর না হতেই যায় ছুটে?

করতে পার সবই তুমি–তুমি অসীম শক্তিমান,
উষর মরুর বুক ভাসায়ে আনতে পারো ঘোর তুফান;
পথ ভুলানো আলেয়ারে করিয়া পথ প্রদর্শক,
পথ হারানো পথিকের আন্‌তে পারো পথের রোখ্;

সেই শক্তি আজ কি তোমার বদ্ধ সীমার গণ্ডিতে?
মোদের বেলায় ঘাটতি পড়ে বিশাল তোমার হুণ্ডিতে?
বে-দীন হতে পাচ্ছি মোরা টিট্‌কারী আর অপমান,
তোমার নামে সব দিয়েছি এই কি তাহার প্রতিদান?

বিশ্বে মোদের জীবন ধারণ গাইতে কেবল তোমার জয়,
নীচতারে করতে মহান, অসুন্দরে করতে লয়;
আজ দুনিয়া চাই না মোদের কাফেরদেরই বাদশাহী,
মোদের বাঁধা ঘরখানিতে মোদের আজ ঠাঁই নাহি;

বিদায়কালে আজকে মোদের পরান কাঁদে সেই ব্যথায়,
পারবে না ফের দুষতে মোদের, ও-নাম যদি ডুবে যায়।
আমরা ডুবে মরলে পরে ডুববে জানি তোমার নাম,
মরলে সাকী, রয় কি বাকি সাকীর হাতে শরাব জাম?

তোমার সভা ভাঙল আজি-দীন্-ঈমানের ঘনায় সাঁঝ
তোমার নামের পাগল যারা নিচ্ছে বিদায় তারাও আজ;
দিন-রজনী তোমার তরে ফেলত যারা চোখের জল,
হৃদয় সঁপি তোমার তরে পেল তাহার যোগ্যফল;

এই দুনিয়ার শান্তি লাগি খাটল যারা নিরন্তর,
শান্তি হল হারাম তাদের করলে তাদের দেশান্তর;
প্রেমিক যাঁরা যাচ্ছে চলে সামনে তাদের ঘোর আঁধার,
নূরের আলোয় খুঁজবে কি ফের করলে যাদের অবিচার?

আদম-হাওয়ার দণ্ড তুমি করলে মোদের চিরন্তন,
কাঁদছে কায়েস-লায়লী আজো জুড়ে নিখিল হৃদয়-মন;
কা'রেও দেছ করতে পীড়ন, কেউ নীরবে সইছে তা,'
কেউ জগতে চির সুখি সার করেছে কেউ ব্যথা;

হরিণ পিছে আজও আছে বাঘ শিকারীর অন্বেষণ,
প্রেমিক হৃদয়–সেথাও জ্বলে প্রেমের শিখা অনুক্ষণ,
অত্যাচার ও অবিচারের গড়লে তুমি হাজার রূপ,
সব–সওয়া সে সৃষ্টি পরে কোন ছলে ফের হও বিরূপ?

নাস্তিকতার এই দিনেও ছেড়েছি কি তোমার পথ?
বলতে পারো–কর্ছি হেলা শেষ রসূলের ধর্মমত?
নিত্য যেথা পুতুল পূজা মন্দিরেতে ঘন্টারব,
সেথাও মোরা করনু জোরে পুতুল ভাঙা মহোৎসব;

করনী আবেস, সলম গুণী যে পথ ধরি ছিলেন স্থির,
আজও মোরা মনে প্রাণে সেই পথেরই মোসাফির;
বেলাল রাহী আজও মোরা–দীপ্ত শিখা তক্‌বীরের
আজও মোদের হৃদয় মাঝে শক্তি যোগায় লাখ্ বীরের।

হয়তো প্রাণে আগের মতো খেলে না আর প্রেমের ঢেউ
তেমন খাঁটি হৃদয় নিয়ে করি না আর সেজদা কেউ;
হয়তো হিয়া প্রেম আবেগে ধায় না তেমন কেবলা মুখ,
দিদার তোমার লাভ করিতে নাইকো তেমন সমুৎসুক;

হয়তো মোরা আজকে নহি আগের মতো ভক্তিমান,
তোমারও নেই আগের মতো ক্ষমায়–দয়ায় পূর্ণ প্রাণ,
আমরা না হয় ক্ষুদ্র মানুষ কিন্তু ওহে কৃপাময়,
দান করে যে ফিরিয়ে নিলে তাতেই বা কি যুক্তি রয়?

দীন ঈমানের উৎস খুলে তুমিই দিলে 'ফারান' ময়,
ইশারাতে করলে তুমি সংখ্যাহীনের হৃদয় জয়;
সেই হৃদয়ে আজকে বলো কেমন কোরে লাগল ঘুণ
ধূ–ধূ করে জ্বলতো যাহে শুধু তোমার প্রেম–আগুন?

নূরের আলোয় উদ্ভাসিত ছিল মোদের যেই হিয়া,
কেমন কোরে রয় তা' আজি তিমির ঘেরা ঘোর সিয়া?
হৃদয় মোদের জ্বলে পুড়ে' হয়েই থাকে যদি ছাই।
কাহার সে দোষ? কা'র হুকুমে ভাঙ্গা–গড়া বিশ্বটাই?

'নজদী' উপত্যকায় আজি নাই সে হাসি–কোলাহল,
আজকে সুধার পাত্র মাঝে শুধুই রাজে হলাহল;
যেথায় ছিল ফুলের সুবাস, সেই হাওয়াতে 'হায়' মাতম্,
নাই যে মোরা, হৃদয় মরা, সব গরিমায় আজ খতম।

আর নাহি সে কায়েস পাগল, নাই পিয়ারা নাই পিরান,
আজ এ সভায় নাই তো শোভা, সোনার পুরী আজ বিরান,
গৌরব উজ্জ্বল হে শুভদিন! কোথায় তোমার অন্তরীণ?
বাজবে কি আর শিরীন্ রবে মোসলেমের এ ভগ্ন–বীণ্?

হেথায় রহে ফুলের মেলা, উৎস বারি সুনির্মল,
হেথায় কাঁদে ফুল–হারা দিল, পিপাসিতের মর্ম–তল,
হোথায় চলে ফূর্তি বেদম, ভোগ–বিলাসের মহোৎসব,
হেথায় রহে জ্যান্তে মরা তোমার নামের মাতাল সব;

শূন্য তাদের পান পেয়ালা–পূর্ণ তাদের গ্রহের ভোগ,
উল্টা চলে জীবন তাদের দুঃখ–সুখের যোগ বিয়োগ।
প্রদীপ শিখায় প্রাণ হারাতে পতঙ্গ আজ হয় উধাও,
শক্তি মালিক, তাদের পাখায় বিদ্যুতেরই শক্তি দাও।

পথহারাদের দৃষ্টি আবার কা'বার মুখে ফিরলো যে,
পক্ষহারা বুলবুলিরা দূর বিমানের পথ–খোঁজে
প্রণয় আজি গুমরে মরে বক্ষপুটে ফুল কলির,
ছিন্ন তারের বুক চিরে সুর বাইরে যেতে হয় অধীর,

তুর পাহাড়ে জাগলো আবার নূর আগুনে জ্বলার সাধ;
নির্জীবও আজ জীবন মাগে, মৃকের বুকে ফরিয়াদ।
শুকনো চড়ায় বান ডেকে যায় তোমার নির্দেশ যদি পায়,
নিখিল জুড়ি, ব্যথার কাঁদন, সাড়া তোমার নাই যে, হায়!

মুমূর্ষুদের অঙ্গে তুমি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দাও,
পুচ্ছ–শুনো ময়ুর পুনঃ শূন্য পানে হোক্, উধাও;
প্রেম–শরাবে পূর্ণ করে, প্রেমহারাদের এই হৃদয়,
ইচ্ছা তোমার মোদের মাঝে পূর্ণ হউক ইচ্ছাময়।

পথের মানুষ উঠলো রথে, আমরা আজি পথচারী;
দূর হতে তাই পূর্ব স্মৃতি দিচ্ছে মোদের টিট্‌কারী।
ক্ষীণকে যারা করল বলী, উৎপীড়কের তুললো দাদ,
জখমী হিয়া তাদেরই আজ করছে ব্যথায় আর্তনাদ।

হাওয়ার সাথে যুক্তি কোরে গুপ্তচর ঐ ফুল সুবাস্
ফুল কাননের গুপ্ত কথা বাইরে করে সপ্রকাশ
তেমনি মোরা ঘরের কথা ছড়াই নিতি সবখানে,
ভায়ের যত গুপ্ত কথা ভাই মুখে দুশমন জানে।

শেষ হোল আজ ফুলের ফসল, ফুলবনে আর নেই বিলাস;
নেই কুসুমে শাখায় পাতায় স্বভাব–রাণীর অট্টহাস;
স্তব্ধ হল সব কাকলী, নেই পাখিরা হেথায় কেউ,
শূন্য বনে একলা আমার বক্ষে ওঠে গানের ঢেউ।

সুখ যা' কিছু সব মরেছে হৃদয় ব্যথার নেই মরণ,
পাখীর শাখায় নেইক আজি সবুজ পাতার আস্তরণ,
মরা বাঁচার অর্থ একই কিছুতে আজ শান্তি নাই,
কাজ বলিতে সার করেছি নিজের লোহু পান করা–ই

নিভার আগে প্রদীপ যথা মরণ ভয়ে কম্পমান
তেমনি এ–ক্ষীণ প্রাণের মাঝে কাঁপছে আমার ক্ষীণ ঈমান!
বেঁচে থাকার সার্থকতা আগেই গেছে সব ঘুচে;
বাদ ছিল যে চিহ্নটুকু যায় বুঝি আজ তাও মুছে।

ফুলের শোকে তোর ও–বুকে কান্না কেন রে বুলবুল?
প্রাণ যদি রয় গানের সুরে উঠবে ফুটে হাজার ফুল;
কাটবে আবার দুখের নিশি, ভোরের হাওয়ার ক্ষীণ পরশ
লাগলে পরে বিষাদ–মেঘে, হইবে মরুর বুক সরস।

বহুৎ দিনের ত্যক্ত গেলাস্ ফের তুলে নে ঢাল্ সুরা।
নবোৎসাহে উঠুক বেজে ভগ্ন হিয়ার তানপুরা।
হিন্দী তোদের গানের ভাষা হোক তাহাতে নেই হানি
সবাই জানে, সুরটি তাহার হেজাজ হোতে আমদানী। *

** কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইকবালের "শেকোয়া" পড়ে তার বাংলা ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজন অনুভব করেন। আশরাফ আলী খান কবির সেই সাধ পূর্ণ করেছিলেন এবং গ্রন্থটি তিনি নজরুলকে উৎসর্গও করেছিলেন। বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত 'শেকোয়া'র যতগুলো অনুবাদ বেরিয়েছে, অনেকের মতে, এই অনুবাদ–কর্মটিই তার মধ্যে উত্তম। এই কাব্যানুবাদটি দুর্লভ–কবি আশরাফ আলী খান দুর্ভাগ্যবশত দারিদ্র্যের অভিশাপে ১৯৩৯ সালে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।*

জওয়াবে শেকওয়া

جواب شکوه

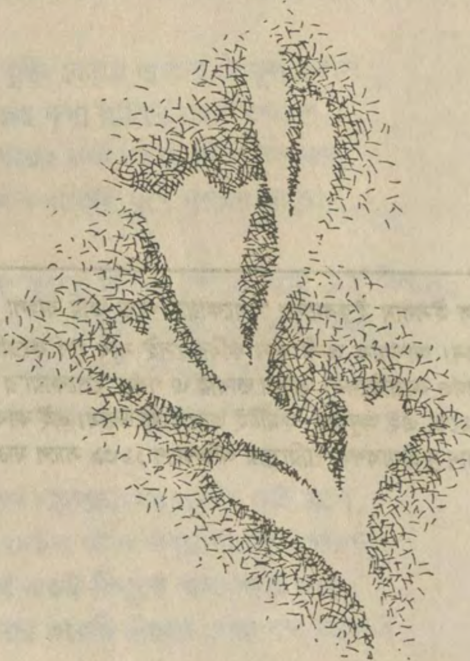

জবাব ই শিকওয়া

গোলাম মোস্তফা

দিল্ থেকে যদি আসে কোন বাণী, প্রভাব রাখে সে সুনিশ্চয়,
পাখনা না থাক্, তবুও তাহার ঊর্ধ্বে উড়ার তাকৎ রয়।
পাক্ বিহিশ্তে জন্ম তাহার, টান থাকে তার তাই সেথায়,
ধূলার ধরায় রয় নাক' বাঁধা—নীল-আকাশের গান সে গায়।
প্রেম ছিল মোর বেয়াড়া ভীষণ, কোঁদল-পাকানো স্বভাব তার
বাগ মানিল না, তীব্র গতিতে চলিল ছুটিয়া আকাশ-পার।

॥ ২ ॥

আকাশ-বুড়ো—সে চমকিয়া কয় ঃ কার কথা শুনি এইখানে?
তারারা কহিল ঃ তাই ত! দেখ ত উপর-তলার আসমানে!
চাঁদ কহে ঃ হাঁ! হাঁ! মাটির মানুষ হবেই এ ঠিক! তারি এ-স্বর!
কয় ছায়াপথ আমাদেরি মাঝে লুকালো কি সেই ধূর্ত নর!
রিদ্ওয়ানই * শুধু চিনিল আমারে—আমার করুণ কান্নাতে,
দেখেছিল সে যে আমারে সেদিন—ছাড়িনু যেদিন জান্নাতে!

॥ ৩ ॥

ফিরিশতারাও চঞ্চল হ'ল ঃ "কার এ আওয়াজ?" কয় তারা,
রহস্য এর জানিতে সকল আরশবাসীই হয় সারা!
মাটির মানুষ উঠিল কি আজ পবিত্র এই আরশ-পর?
আদম-শিশু কি হ'ল এতবড় শক্তিময় ও ধুরন্ধর?
দুনিয়ার এই মানুষগুলো—সে কত ধড়িবাজ! দেখেছ ভাই!
রূঢ় ভাষায় কথা বলে এরা! আদব-লেহাজ মোটেই নাই!

॥ ৪ ॥

এতই ইহারা বে-তমীজ্ ভাই! খোদার পানেও চোখ রাঙায়!
এই মানুষেরই পায়ে দিয়েছিল ফিরিশতাকুল সিজদা, হায়!
জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্ত্ব-কথায় ইহাদের জুড়ি নাহিক আর,

কিন্তু ইহারা উদ্ধত বড়! জানে না কোনই শিষ্টাচার!
এরাই–কেবল ভাষা জানে, তাই গুমর কত সে! বাপ্‌রে বাপ্!
ভদ্র ভাষা ত শিখিল না কেউ! নাদান্‌রা সব বদ–স্বভাব!

॥ ৫ ॥

হঠাৎ আসিল কালাম–ই–আযীম ঃ তোমার এ গানে কাঁদায় প্রাণ,
হৃদয় হইতে উছলিয়া–পড়া তোমার প্রেমের এই সে গান।
আকাশেরও দিল্ কেঁদে ওঠে আজ তোমার করুণ কান্নাতে,
বুঝিয়াছি ঃ এই গান আসিয়াছে কত না গভীর বেদনাতে।
'শিক্‌ওয়া' এ নয়,—প্রশস্তি মোর! এমন বাচন–ভঙ্গি তার,
বান্দা এবং খোদার মাঝারে বাঁধিয়াছ সেতু চমৎকার!

॥ ৬ ॥

দান–ভাণ্ডার খোলাই ত মোর; সে দান নেবার সায়েল্ কৈ?
কারে আমি বল পথ দেখাইব, পথ চলা সেই পথিক বৈ?
শিক্ষা ত মোর সবার তরেই, কোথায় বল না ছাত্র তার?
যেই মাটি দিয়ে গড়িব আদমে, সেই মাটি কই পাচ্ছি আর!
যোগ্য জনের শীর্ষেই আমি রত্ন–মুকুট দেই আনি,
নতুন পৃথিবী—তাও পেতে পারে থাকে যদি তার সন্ধানী!

॥ ৭ ॥

হৃদয় তোমার ঈমান–বিহীন, বাজু সে তোমার শক্তিহীন,
তোমরা নবীর উম্মৎ? হায়! শরমে তাঁহার মুখ মলিন!
বুৎ–ভাঙা দল বিদায় নিয়েছে, বাকী* যারা তারা গড়িছে বুৎ,
'ইব্রাহিমের' ছেলেরা এখন 'আযর' সেজেছে—কী অদ্ভুত!
শারাব, জাম ও পানকারীদের দেখছি এখন নূতন সব,
কা'বাও নূতন, বুৎও নূতন! চলিছে মজার কী উৎসব!

॥ ৮ ॥

তোমরাই ছিলে উৎস একদা সত্য এবং সুন্দরের
লালা–ফুল সম ফুটিয়া উঠিতে অগ্রপথিক বসন্তের!
খোদার প্রেমিক ছিলে সকলেই—যেই দিন ছিলে মুসলমান।
'হরযায়ী' এই খোদার পায়েই করেছিল সবে আত্মদান।
যাও না, এখন পূজা কর গিয়ে নূতন কোন সে 'একযায়ী'র?
খণ্ডিত কর মহামানবতা বিশ্বপ্রেমিক নূর নবীর!

॥ ৯ ॥

ফযরে উঠিয়া নামায পড়িতে পাও তুমি আজ কষ্ট ঘোর
আমারে ভুলিয়া অলস–আবেশে নিঁদমহলায় রও বিভোর।
প্রগতিপন্থী তুমি ত এখন! রাখো নাক' রোযা রামজানে
এই কি তোমার প্রেমের নিশান? 'ওফাদারী'র কি এই মানে?
ধর্ম দিয়েই মিল্লাৎ গড়ে, ধর্মহীনের নাহিক' মান,
আকর্ষণ না রইলে রহে না চাঁদ–সিতারার আঞ্জুমান!

॥ ১০ ॥

কর্মবিমুখ অলস যাহারা—তোমরাই হ'লে সেই জাতি,
স্বদেশের প্রতি নাহিক' দরদ, উদাস খেয়ালে রও মাতি।
বজ্রপাতের অনুকূল তব জীর্ণ গৃহেই পড়িছে বাজ,
বাপ–দাদাদের মাজার বেচিয়া বেশ ত সবাই খাচ্ছ আজ!
কবর লইয়া তেজারতি করে যেসব ঘৃণ্য ব্যবসাদার
মূর্তি পেলে যে বেচিবে না তারা—কোথায় তাহার অঙ্গীকার?

॥ ১১ ॥

মুছিল কাহারা কালের পাতায় চিহ্ন ছিল যা' কলঙ্কের?
মানব জাতির মুক্তি আনিল বন্ধন কাটি' দাসত্বের?
কা'বার কপোলে বোসা দিল কারা—তুলিল তৌহিদের আযান?
ছিনায়–ছিনায় গেঁথে নিল কারা আমার বাণী— সে পাক্–কুরআন্?

তারা কি তোমরা? সে ত তোমাদের বাপদাদা—যারা ছিল মহৎ,
তোমরা ত সব হাতে-হাত রেখে ভাবিছ শুধুই 'ভবিষ্যৎ'!

॥ ১২ ॥

কী বলিলে তুমি? মুসলমানের 'হূর' সে শুধুই 'ওয়াদা' সার?
কান্না যতই হো'ক্ না করুণ, থাকা চাই কিছু যুক্তি তার!
শাশ্বত মোর আইন-কানুন, শাশ্বত মোর নীতি-বিধান;
কাফির যখন মুসলিম হয়—সেও পাবে 'হূর' এক-সমান!
তোমাদের মাঝে কারা বল চায় সত্যিকারের 'হূর-কসুর'?
মুসাই ত নাই!—'তুর' পাহাড়ে ত তেমনি করিয়া জ্বলিছে নূর!

॥ ১৩ ॥

লাভ-লোকসান এক তোমাদের, এক মঞ্জিল, এক মোকাম,
এক তোমাদের নবী ও রসূল, এক তোমাদের দীন্-ইস্‌লাম।
এক তোমাদের আল্লাহ্ এবং এক তোমাদের আল্-কুরআন্,
আফ্‌সোস্, হায়, তবুও তোমরা এক নহ সব মুসলমান!
তোমাদের মাঝে হাজার ফিরকা, হাজার দল ও হাজার মত,
এমন জাতি কি দুনিয়ার বুকে খুঁজে পায় কভু মুক্তি-পথ!

॥ ১৪ ॥

কারা, বল, ত্যাগ করেছে আমার পাক্-রাসূলের পাক্-বিধান,
সুখ-সুবিধার যুক্তি-মাফিক কারা চলে আজ আযাদ-প্রাণ?
কাহাদের চোখে ভালো লাগে আজ অপর জাতির রূপ ও সাজ?
বাপ-দাদাদের তরীকাতে আজ চলিতে কাহারা হয় নারাজ?
অন্তরে নাই প্রেমের আগুন, আত্মাতে নাই তার দহন,
মুহম্মদের পয়গাম আর তোমাদের কারো নাই স্মরণ!

॥ ১৫ ॥

মস্‌জিদে আজ নামায পড়িতে যায় সে শুধুই গরীব লোক,
তারাই এখন রোযা রাখে সব—যতই না কেন কষ্ট হোক্!

গরীব যাহারা তাদের মুখেই শুনি যাহা–কিছু আমার নাম,
তারাই দিতেছে গৌরবে ঢাকি' তোমাদের যত অসৎ কাম।
ধনীরা ত সব মত্ত–মাতাল শারাব পিয়ে সে সম্পদের
গরীব রয়েছে বলেই আজিও জ্বলিছে চেরাগ মিল্লাতের!

॥ ১৬ ॥

কওমের যারা ওয়ায়েজ, তারা ধার ধারে নাক' সুচিন্তার,
বিদ্যুৎ সম তাদের কথায় হয় না এখন আছর আর।
রোসম্ রয়েছে আযানের বটে, আযানের রূহ্ বেলাল নাই
ফালসুফা আছে প্রাণহীন পড়ে', আল্–গাযালীরে কোথায় পাই!
মস্‌জিদ আজি মর্সিয়া গায়—নামাযী নাহিক' তার ভিতর,
হেজাযীরা ছিল যেমন–তেমন কোথায় মিলিবে ধরার 'পর!

॥ ১৭ ॥

খুব ত কহিছ ঃ দুনিয়া হইতে বিদায় নিচ্ছে মুসলমান!
প্রশ্ন আমার ঃ মুসলিম কোথা? সে কি আজো আছে বিদ্যমান?
চলন তোমার খৃষ্টানী, আর হিন্দুয়ানী সে তমদ্দুন্,
ইহুদীও আজি শরম পাইবে দেখিলে তোমার এ–সব গুণ!
হ'তে পার তুমি সৈয়দ, মীর্জা, হ'তে পার তুমি সে আফ্‌গান্,
সব কিছু হও, কিন্তু শুধাই ঃ বলত' তুমি কি মুসলমান?

॥ ১৮ ॥

সত্য–ভাষণে মুসলমানের কণ্ঠ ছিল সুনির্ভীক,
সবার প্রতিই অপক্ষপাত ন্যায্য বিচার করিত ঠিক।
বৃক্ষের মত স্বভাব তাহার নম্র হইত ফল–ভরে,
ধৈর্য, সাহস, বীর্য ও বল ছিল তাহাদের অন্তরে।
প্রীতি–উৎসবে সে ছিল যেমন অধরে স্নিগ্ধ লাল–শারাব,
ত্যাগে ছিল তার তেমনি আবার পান–পিয়ালার রিক্তভাব।

॥ ১৯ ॥

ক্ষতের যেমন ছুরিকা, তেমন মিথ্যার ছিল মুসলমান
আর্শিতে তার পান্নার মত কীর্তি ছিল সে দীপ্তিমান।
আপন বাহুর তাকতের পরে ছিল সুগভীর আস্থা তার,
মৃত্যুর ভয়ে তোমরা কাতর—ভয় ছিল তার শুধু খোদার!
পুত্র যদি সে লায়েক না হয়, পিতার শিক্ষা যদি না পায়,
পিতৃধনে সে কেমন করিয়া অধিকারী, বল, হইতে চায়!

॥ ২০ ॥

ভোগ-বিলাসেতে তন্ময় তুমি, অসাড় এখন তোমার প্রাণ,
তুমি মুসলিম? মুসলমানের এই আদর্শ? এই বিধান?
নাইক' আলীর ত্যাগের সাধনা, নাই সম্পদ ওস্‌মানের,
কেমন করিয়া আশা কর তবে তাদের রুহানি সংযোগের!
মুসলমানের তরেই তখন সে-যুগ করিত গর্ববোধ,
কুরআন্ ছাড়িয়া এখন হয়েছ যুগ-কলঙ্ক, হায় অবোধ!

॥ ২১ ॥

তোমরা এখন হিংসা-কাতর, তাহাদের ছিল উদার মন,
ঢাকিত তাহারা এ-ওর আয়েব, তোমরা করিছ অন্বেষণ!
'সুরাইয়া' সম উর্ধ্বে ওঠার দেখিছ স্বপন সুরঙীন,
তার আগে কর দিল্ প্রস্তুত, হও মুসলিম—হও মু'মিন্।
তারা লভেছিল ইরানের তাজ—'কাইকাউসে'র সিংহাসন,
বাক্য শুধুই সার তোমাদের—মর্যাদাহীন সব এখন!

॥ ২২ ॥

আত্মঘাতী সে তোমাদের নীতি,—ছিল তাহাদের আত্মজ্ঞান,
তোমরা মারিছ ভাইকে, তাহারা মরিত—রাখিতে ভায়ের প্রাণ।
তোমরা সবাই বাক্য-বাগীশ, তারা ছিল সব কর্মবীর
তোমরা কাঁদিছ কুঁড়ির লাগিয়া, ছিল তাহাদের ফুল-প্রাচীর।
আজিও জগৎ গাহিছে তাদের কীর্তিগাঁথা সে বীরত্বের
সৃষ্টির বুকে জ্বলিছে আজিও স্মৃতিচিহ্ন সে গৌরবের।

॥ ২৩ ॥

তারার মতন সেদিন শোভিত তোমার জাতির আস্‌মানে
হিন্দের জড়-মায়ায় তোমার ব্রাহ্মণও আজ হার মানে!
উড়িবে বলিয়া বাসা ছেড়ে তুমি ঘুরিয়া মরিছ লক্ষ্যহীন
আগেই ছেড়েছ কর্ম তোমার—এখন ছাড়িলে তোমার দীন্!
নব্য-যুগের সভ্যতা-মোহে কাটিয়া ফেলিলে সব বাঁধন
কা'বা ছেড়ে সবে মন্দিরে এসে বাসা বাঁধিয়াছ হায় এখন!

॥ ২৪ ॥

কায়েস্ এখন রয় না বসিয়া বিজন-মরুর প্রান্তরে
শহরবাসী সে হয়েছে এখন—প্রমোদ-ভবনে বাস করে!
দিওয়ানা সে, তাই মরু বা শহরে যেখানে খুশি সে সেখানে যাক্—
চাও বুঝি—একা লায়লীই তার মুখপানে চেয়ে বসিয়া থাক?
দারাজ কণ্ঠে শুনায়োনা আর প্রেমের যুলুমবাজির গৎ
প্রেমিক হইবে মুক্ত-স্বাধীন-বন্দিনী র'বে প্রেমাস্পদ?

॥ ২৫ ॥

নয়া যামানার আগুন লেগেছে, পাবেনাক' কেউ পরিত্রাণ,
সে-আগুনে আজ পুড়িতেছে যত ক্ষেত-খামার ও গুলিস্তান্।
প্রাচীন জাতিরা ইন্ধন আজি সেই লেলিহান যুগ-শিখায়
দীন-ইসলামের আঁচলেও বুঝি সে আগুন এসে লাগিল হায়!
থাকে যদি আজ তোমাদের মাঝে ইব্রাহিমের সেই ঈমান,
এ-আগুন তবে হইবে আবার স্নিগ্ধ-শীতল ফুল-বাগান।

॥ ২৬ ॥

অশ্রু ফেলো না হেরিয়া, হে মালি, দৈন্য তোমার মালঞ্চের,
ফুটিবে কুঁড়িরা তারার মতন, নব-বসন্ত আসিবে ফের।
সব রিক্ততা অবসান হবে-নব-পল্লব-গৌরবে
শহীদী খুনের রং মেখে ফের ফুটিবে গোলাব সৌরভে।
ওই চেয়ে দেখ—প্রভাত-আলোয় রাঙা হয়ে আসে পুব-আকাশ,
নূতন সূর্য উঠিবে এবার—এইত তাহার পূর্বাভাস!

॥ ২৭ ॥

পুরাতন এই সৃষ্টির বাগে ফল খেয়েছে সে অনেক জাত
অনেকে আবার ভোগ করিয়াছে ব্যর্থ আশার তুষার-পাত!
অনেক তরুই রয়েছে হেথায়-শুষ্ক বা কেউ, কেউ সবল,
অনেকে এখনো জন্ম লভেনি, রয়েছে গোপন মাটির তল।
ইস্‌লামের এই বিশাল তরুটি অতুল ধরায় ফল-শোভায়
এ ফল ফলেছে মুমিন মালীর বহু-শতাব্দী কর্ষণায়।

॥ ২৮ ॥

তোমারে বাঁধিতে পারেনিক' কোন স্বদেশ-ভূমির মাটির রূপ,
'মিসর' তোমার 'কিনান্' সমান—দেশকালজয়ী তুমি 'য়ূসুফ্'
ছুটিবে আবার এ নয়া কাফেলা-দাও বাজাইয়া ঘন্টা তার,
সামান্ তাহার নহে বেশি ভার, ছুটিবে সে দ্রুত মরুর পার।
পিল্‌সুজ্ সম তুমি আছ নীচে, উর্ধ্বে রয়েছে দীপ-শিখা,
সব সংশয় দূর হয়ে যাবে জ্বলিলে তোমার বর্তিকা।

॥ ২৯ ॥

দুঃখ কিছুই নাহিক তোমার ইরান যদিই হয় বিরান
পিয়ালায় নাহি হয় পরিচয় লাল-শিরাজীর মূল্যমান।
বিজয়-গর্বী তুর্কী- তাতার দিয়েছে প্রমাণ এই কথার;
মূর্তি-পূজক যাহারা-তারাই শ্রেষ্ঠ রক্ষী হয় কা'বার!
সত্য-তরীর মাঝি তুমি চির-উর্মি-মুখর সমুদ্রের,
নূতন যুগের যুল্‌মাৎ-রাতে ধ্রুবতারা তুমি এ-বিশ্বের!

॥ ৩০ ॥

বুলগারগণ আসিছে ধাইয়া তুর্কীর পানে—কিসের ভয়?
গাফিল দিগের হুঁশিয়ারি এযে—যাতে তারা সব সজাগ হয়।
দুঃখ করিছ কেন এ বিপদে? ভাবিছ কেন এ অকল্যাণ?
এই ত তোমার আত্ম-শক্তি-বলবীর্যের ইমতিহান্!
দুশ্‌মন্‌দের যুদ্ধ-অশ্ব আসুক না রণ-হুঙ্কারে,
সত্যের নূর নিভিতে পারে না শত্রুসেনার ফুৎকারে।

|| ৩১ ||

বিশ্বের চোখে আজো রহিয়াছে তোমার স্বরূপ সংগোপন
তোমার বিহনে হবে না খোদার পূর্ণ আত্মা–উন্মোচন।
যুগের জীবন বেঁচে আছে শুধু তোমার লহুর উষ্ণতায়
ভাগ্য–তারকা জ্বলিছে আকাশে তব খেলাফৎ–প্রতীক্ষায়!
এখনো তোমার বাকী আছে কাজ, ফুরসৎ নাই বিশ্রামের,
পূর্ণ করিয়া জ্বালাও এবার নূরের প্রদীপ তৌহীদের।

|| ৩২ ||

কুঁড়ির ভিতরে গন্ধ হইয়া থেকো নাক' আর বদ্ধ–দ্বার,
তোমার গন্ধে আমোদিত হোক আবার ধরার বাগবাহার।
বালুকণা হ'য়ে থেকো নাক' আর—বিয়াবান সম হও বিশাল
মৃদু–সমীরণ হউক তোমার ঝঞ্ঝা–তুফানপ্রাণ–মাতাল।
তুচ্ছরে আজ করগো উচ্চ—প্রেমে ও পুণ্যে কর মহৎ
মুহম্মদের নামের আলোকে উজ্জ্বল কর সারা–জগৎ।

|| ৩৩ ||

তোমার ফুল না ফুটিলে কেমনে গাবে বুল্‌বুল্ তারান্নুম,
কেমনে ফুটিবে কুসুম–কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে তাবাস্‌সুম্!
তুমি যদি সাকী না হও, না হবে! শারাব–জামও রবে না আর,
তৌহীদ গেলে তুমি কোথা রবে? ভেবেছ কী হবে নতিজা তার?
বিশ্ববীণার তারে তারে আজো ধ্বনিছে এ মহা পুণ্যনাম,
নিখিল সৃষ্টি কম্পিত করি ওঠে মহাবাণী 'দীন–ইস্‌লাম'!

|| ৩৪ ||

আজো ঝঙ্কারি উঠিছে এ–নাম মরু–দিগন্তে গিরি–গুহায়
সাগর–তটিনী কুলুকুলু নাদে আজিও এ–নাম গাহিয়া যায়।
চীন–দেশে, মরু–মোরক্কে এ–নাম উঠিছে আজিও সকাল–শাম,
মুসলমানের ঈমানের তলে গোপন রয়েছে আজো এ–নাম।
কিয়ামৎ তক্ দেখিবে জগৎ এ নাম–দৃশ্য জ্যোতির্ময়,
মুহম্মদের স্মরণ–মহিমা পূর্ণ হইবে—সে নিশ্চয়।

॥ ৩৫ ॥

পৃথিবীর কালো আঁখি–তারা সম 'কালো দেশ' ওই আফ্রিকায়
হাজার হাজার বীর–শহীদান যার বুকে সুখে নিদ্রা যায়,
সূর্যের স্নেহ–পালিতা কন্যা—'হিলালী চাঁদের' সেই সে দেশ,
প্রেমিক জনের 'বেলালী দুনিয়া'—বুকভরা যা অশেষ ক্লেশ,
এ নামের বারি পান করি সেই মরুর দেশও স্নিগ্ধ হয়,
নয়ন–জ্যোতিতে সিক্ত হইয়া—আঁখি–তারা যথা শান্ত রয়।

॥ ৩৬ ॥

জ্ঞান হোক্ তব বর্ম,—প্রেমের তলোয়ার লও হস্তে ফের
ওরে বে–খেয়াল্! জানোনা কি—তুমি খলিফা আমার মাখ্‌লুকের?
অগ্নিবাণী—সে তক্‌বীর তব উজল করিবে সারা জাহান,
মুস্‌লিম হ'লে তদ্‌বীরই তব হইবে তকদীরের সমান।
মুহম্মদেরে ভালোবাসো যদি ভালোবাসা পাবে তবে আমার,
'লউহ–কলম্' লভিবে তোমরা—মাটির পৃথিবী সে কোন্ ছার!

বালে জিবরীল

بال جبریل

প্রার্থনা

আবদুল কাদির

এই মোর ওজু, এই নামায আমার,
মোর সঙ্গীতের সুরে আছে মোর হৃদয়–শোণিত।

পুণ্যাত্মা সূফীর সঙ্গ, সে যে স্বর্গসুখ,
দিব্যজ্যোতিঃ, সাযুজ্য পরম।
নির্ঝরের পাশে ফুল্ল লালা যথা স্ফূর্তপ্রাণ,
আনন্দ–বিহ্বল।

প্রেম–সরণিতে কারো সঙ্গী কেহ নয়;
রয়েছে আমার সাথে শুধু মোর বাসনা উদ্দাম।
নৃপ কিংবা সামন্তের সিংহাসনে স্থান মোর নহে–
তুমি মোর নীড়, মোর নীড়ের আশ্রয়–শাখা তুমি।

তব প্রেম–ছিন্ন মন বক্ষোবাস
প্রলয় ঊষায় মুক্ত দিগ্বলয়–সম;
তব তরে 'আল্লাহ'র অগ্নি জ্বলে আমার অন্তরে।
তব তরে এ জীবন অগ্নিময়, ব্যথাদীর্ণ,
বেদনা–বিক্ষত;
আমার কামনা তুমি, ধ্রুবলক্ষ্য মোর।

তুমি না থাকিলে কাছে, মোর শহর বিরান;
তুমি যদি থাক, পূর্ণ উজাড়–মহল,
মুখরিত বিজন–বসতি।

আমার অধরে দাও পুনঃ সেই পুরাতন সুরা;
মোর পানপাত্র ভেঙ্গে আমি

সে–সুরের করি অন্বেষণ।
সংসারী ও সন্ন্যাসীর করপাত্র বহুকাল শূন্য প্রতীক্ষায়;
দৃষ্টিসুধা দাও সাকী, কৃপা করো তাহাদের পরে।

তব 'খুদায়ী'র কাছে প্রমত্ত মনের মম এই অভিযোগ–
তুমি ব্যপ্ত অসীমায়, আমি বন্দী সীমার বাঁধনে।

কামনার যেই বাণী অপরোক্ষ নাহি যায় বলা,
দর্শন ও কবিতার সত্য নয় ব্যতিক্রম তারা।

খোদার ফরমান

ফররুখ আহমদ

ওঠো-দুনিয়ার গরীব ভুখারে জাগিয়ে দাও।
ধনিকের দ্বারে ত্রাসের কাঁপন লাগিয়ে দাও।।

করো ঈমানের আগুনে তপ্ত গোলামী খুন
বাজের সমুখে চটকের ভয় ভাঙিয়ে দাও।
ঐ দেখ আসে দুর্গত দীন দুখীর রাজ!
পাপের চিহ্ন মুছে যাও, ধরা রাঙিয়ে দাও।।

কিষান-মজুর পায় না যে মাঠে শ্রমের ফল
সে মাঠের সব শস্যে আগুন লাগিয়ে দাও।
স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে কেন আড়াল?
মধ্যবর্তী মোল্লাকে আজ হাঁকিয়ে দাও.........

আদমের প্রতি পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন

ফররুখ আহমদ

এক

খোল আঁখি দেখ চেয়ে এ পৃথিবী, দেখ নভোতল;
দেখে এই বাষ্প আর হাওয়ার মহল।
তিমির-বিদায় সূর্য দেখ চেয়ে দীর্ণ করে সুপ্ত পূর্বাচল।।

গুণ্ঠন-বিমুক্ত স্বপ্ন সংগোপন দেখ এই উজ্জ্বল আলোতে
বিচ্ছেদ দিনের ব্যথা, অশেষ যন্ত্রণা-বহ্নি দেখ তুমি, ধারাবক্ষ হ'তে!
অধীর হোয়ো না তবু আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে
আবর্তিত সংগ্রামের স্রোতে।।

দুই

দেখ এই ঘনঘটা, বর্ষণ-মুখর মেঘ
দেখ এই অবিশ্রান্ত শ্রাবণী বাদল!
আকাশের এ গম্বুজ শব্দহীন আবহমন্ডল।
এ পাহাড়, এ সমুদ্র, বালিয়াড়ি—এই মরুতল;
নিয়ন্ত্রিত হবে এরা তোমারি শাসনে!
কাল তুমি দেখিয়াছো উজ্জ্বল ফেরেশ্‌তাদল জান্নাত-কাননে
দেখ নিজ প্রতিকৃতি আজ তুমি সময়ের এ স্বচ্ছ দর্পণে।।

তিন

তোমার পলকপাত বুঝে নেবে অনায়াসে অনন্ত সময়,
দুরান্ত আকাশ থেকে তারারা তোমাকে দেখে
প্রতিক্ষণে মানিবে বিস্ময়!

প্রজ্ঞার বারিধি তব মানিবে না কোনদিন, কোন সীমারেখা,
নভের উচ্চতা ছুঁয়ে চিত্তের স্ফুলিঙ্গ তব দূরে দেবে দেখা!
গ'ড়ে তোল নিজ সত্তা আকাঙ্ক্ষার শেষ প্রান্তে
তারপর দেখ চেয়ে একা।।

যে সূর্যে প্রদীপ্ত বিশ্ব, সে তোমার স্ফুলিঙ্গ দহন;
তোমার শিল্পের মাঝে সম্মোহিত আছে এক
সুসম্পূর্ণ পৃথিবী নূতন!

চার
অর্জিত নহে যা শ্রমে-সে জান্নাত অসুন্দর দৃষ্টিতে তোমার,
তোমার বেহেশ্‌ত জানি হৃদিরক্তে সংগোপন (অশ্রান্ত আশার)।
মৃত্তিকার প্রতিকৃতি! দেখ এ শ্রমের ফল
সঞ্চ্রামের পথে দুর্নিবার।।

পাঁচ
রোয-ই-আযল থেকে প্রতি বীণাতন্ত্রী তব অহর্নিশি ক্রন্দন-মুখর
রোয-ই- আযল থেকে প্রেমের বিপণী মাঝে তুমি একা এনেছো খবর
রোয-ই-আযল থেকে ধ্যানী তুমি খুঁজিয়াছো
চিরদিন রহস্যের ঘর!
শ্রমশীল!
    রক্তক্ষয়ী!
    শান্তিকামী!
উষালোক হ'তে অস্তিত্বের
দেখ চেয়ে-বলো আজ কোন্ অন্তহীন পথে
নিয়ে যাবে অফুরন্ত ভাগ্য এ বিশ্বের।।

জিব্রাইল ও শয়তান

ফররুখ আহমদ

জিব্রাইল
প্রাচীন দিনের সঙ্গী! 'গন্ধ ও বর্ণের বিশ্বে কি নিয়ে তোমার দিন যায়?'

শয়তান
অগ্নি ও আক্রোশে তিক্ত বিষাদ ব্যাপার ম্লান, প্রতীক্ষায়, ক্লান্ত
প্রত্যাশায়।

জিব্রাইল
যায় না এমন ক্ষণ যখন তোমার নাম জান্নাতে হয় না উচ্চারণ!
হৃত গৌরবের পথে পারো না কি মুছে দিতে গ্লানি-ম্লান ও ছিন্ন
দামন?

শয়তান
কী গোপন অভিশাপে জ্বলি আমি রাত্রিদিন বুঝিবে না– হায়
জিব্রাইল!
বিভ্রান্ত, উন্মাদ চিত্ত জান্নাতে এসেছি ফেলে পান-পাত্র– স্বপ্নের
নিখিল।
এখানে ধরার বক্ষে মুহূর্তের অধিবাস– অসম্ভব; এ যে অসম্ভব।
এ নৈঃশব্দে নাই পথ, গৌরব-প্রাসাদ নাই; নাই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের রব!
আশার বিদ্যুৎ যার নিখিল বিশ্বের বুকে ছায়া ফেলে তিক্ত বেদনার
কি আশ্বাস দেবে তারে, নিরাশ হোয়া না কভু কৃপাময়– কৃপায়
আল্লার?

জিব্রাইল
তোমার উন্নত শির নামায়েছে ধূলিতলে অকল্পিত বিদ্রোহ তোমায়,
অবশিষ্ট আছে আর ফেরেশ্‌তার কি সম্মান, কি মর্যাদা দৃষ্টিতে
আল্লার?

শয়তান
আমার বিদ্রোহী আত্মা জ্বালিয়াছে অনির্বাণ বহ্নিশিখা আদমের বুকে
আমারি বিদ্রোহ যুক্ত বুদ্ধি-মননের বস্ত্রে ধূলিমুষ্টি চলেছে সম্মুখে।
সত্য অসত্যের দ্বন্দ্বে দ্রষ্টা তুমি দূরবর্তী দূরপ্রান্তে আছো দিবাযামী,
প্রমত্ত ঝঞ্ঝার মুখে কে জাগে সংগ্রামী চিত্ত—জিব্রাইল। তুমি কিম্বা
আমি?
খিজির সহায়হারা, অসহায় ইলিয়াস সে ঝড়ের প্রমত্ত গতিতে!
আমার ঝঞ্ঝার পথ সমুদ্রে সমুদ্রে আর তরঙ্গিত নদীতে নদীতে।
তবু তুমি এই প্রশ্ন শুধায়ো আল্লার কাছে পাবে তাঁর যখন দিদার,
মানুষের ইতিহাস উজ্জ্বল হয়েছে আজ অফুরান প্রাণ-রক্তে কার?
সর্বশক্তিমান যিনি– বিকীর্ণ কাঁটার মত বক্ষে তাঁর জাগি যে অম্লান,
চিরন্তন কাল শুধু তোমরা গুঞ্জরি যাও ঃ সুমহান প্রভু সুমহান।

শাহীন

ফররুখ আহমদ

বিদায় নিয়েছি সেই ধুলিম্লান পৃথুতল থেকে
যেখানে জীবন বাঁচে এক কণা শস্যে ধরণীর!
আনন্দ-আনন্দ মোর মরুভূর নিঃসঙ্গ বিজনে
সৃষ্টির প্রথম থেকে এ প্রাণ অশ্রান্ত রাহাগীর।।

বসন্ত বাতাস, ফুল, বুলবুল, পসারিণী আর
আশিকের রুগ্ন সুর;–সব কিছু ছেড়ে চ'লে যাই।
বনের বাসিন্দা যারা।- যাদু জানে; যাদুতে ভোলায়!
প্রলুব্ধ প্রাণের সেই সম্মোহনে মুক্তি-স্বপ্ন নাই।।

মরু বিয়াবানে দীপ্ত খরধার তরবারি যার
বিজয়ী, গাজী সে বীর, অস্ত্রে তার অপূর্ব স্পন্দন!
ক্ষুধিত নহিতো আমি কবুতর তিতিরের তরে
প্রমুক্ত আত্মার মত শাহীনের অবাধ জীবন!

হানা দিয়ে ফিরে যাওয়া, ফিরে এসে হানা দেওয়া আর
আজব বাহানা এই রক্তধারা উত্তপ্ত রাখার
প্রাচী প্রতীচীর মাঝে চকোরীর ক্ষুদ্র এ সংসার;
আমার আকাশ নীলা- অন্তহীন সাম্রাজ্য আমার।

পাখীর দুনিয়া মাঝে দরবেশ–ভ্রাম্যমাণ তাই,
শাহীন বাঁধে না নীড়– নীড় তার প্রয়োজন নাই।।

চিন্তাকে সে ক'রে ভোলে আরো স্থির, আরো প্রজ্ঞাময়;
তীক্ষ্ণ আঁখি ক'রে তোলে তীক্ষ্ণতর আরো,

তৃণকে সে দান করে পর্বতের ভার;
সিংহ-শক্তি দেয় সে শিবারে।

ধূলিকণা তুলে নেয় সাত সিতারার মাঝে, বারি বিন্দু স্ফীত হয় সমুদ্রের মত;
রোজ হাশরের মত্ত কোলাহল মাঝে আনে গূঢ় নিস্তব্ধতা;
তিতিরের পদতল রাঙায় সে ঈগল-শোণিতে!

ওঠো ঢালো স্বচ্ছ সুরা মোর পেয়ালায়,
আমার চিন্তার কৃষ্ণশর্বরীর বুকে তুমি এন দাও চন্দ্রালোক আজ
যেন নিয়ে যেতে পারি ভ্রাম্যমাণ জনতারে মঞ্জিলে আমার;
তীব্র প্রাণ-চঞ্চলতা দিতে পারি যেন এই জড়তার বুকে,
উদ্যত উৎসাহে যেন যেতে পারি নবীনের দৃপ্ত অভিযানে;
পরিচিত হ'তে পারি নূতনের অগ্রগামী রূপে!
আঁখি তারকার মম হ'তে পারি—দৃষ্টিমান মানুষের কাছে,
বিশ্বের শ্রবণে যেন যেতে পারি আমি সুর হয়ে;
কাব্যের সুষমা যেন পরম ঐশ্বর্যময় হয় লেখনীতে;
আমার কান্নায় যেন জেগে ওঠে শুষ্ক তৃণ অশ্রুসিক্ত; প্রাণের প্রান্তরে....

কণিকা

ফররুখ আহমদ

ধর্ম কি জানো?
– মৃত্তিকা থেকে উত্থান!
যেন এ আত্মা খুঁজে পায় তার সত্তার সন্ধান।।

❑

কর উন্নত সত্তা এমন
যেন তক্‌দির লেখার আগে
শুধান আল্লা বান্দাকে ঃ বল্
কি বাসনা তোর্ হৃদয়ে জাগে।।

❑

খোদায়ী প্রেমের আলোকে যখন
খুঁজে পায় নর সত্তা ফের,
শাহানশাহীর রহস্য যত
তখনি তো ভাসে দুই চোখে
গোলামের।।

❑

শোন হুঁশিয়ার পান্থ সুজন
তোমার চলার পথে গো যদি
গুলশান থাকে, হও শবনম ;
সাহারা থাকিলে তুফান হও।।

❑

দুর্বার তরঙ্গ এক ব'য়ে গেল তীর–তীব্র বেগে,
ব'লে গেলঃ আমি আছি, যে মুহূর্তে আমি গতিমান,
যখনি হারাই গতি সে মুহূর্তে আমি আর নাই।।

❑

জরাজীর্ণ এ আকাশ, পুরাতন এ সব তারা–রা,
আমি শুধু চাই তারে সদ্যজাতা যে পৃথ্বী নূতন।।

❑
হারালো যখন ধর্মাবরণ
একতা কোথায় রহিল হায়!
ঐক্যসূত্র গেল যদি ভাই
মিল্লাত সাথে নিল বিদায়।।

❑
হারায় গরিমা ; সম্মান,—জাতি আকাশ খিলান তলায়,
হারায় যখন সে আত্মজ্ঞান ধর্মে ; কাব্যকলায়।।

❑
জীবন যেখানে ক্ষীণ স্রোতা নদী গোলামীর ছোঁওয়া লেগে,
আজাদীর মাঠে সেথা সীমাহীন সমুদ্র ওঠে জেগে।।

❑
বিশ্বাসহীন কাফের যে দীন বিশ্বে হয় সে হারা,
মুমিনের মাঝে হারায় নিখিল জগতের প্রাণধারা।।

❑
বসন তোমার হয়নি মলিন
স্বদেশ–ধূলিতে অপরিসর,
তুমি ইউসুফ নয়নে তোমার
কেনান সমান প্রতি মিসর।।

❑
আনো বিশ্বাস পরাজিত জন
কুদরতী হাত তুমি খোদার!
হে গাফেল! যদি আনো বিশ্বাস
পদানত তুমি রবে না আর।।

❑
ব্যক্তির প্রাণ সমাজ সঙ্গ
আর কিছুতেই নয়!
সিন্ধু–বক্ষে বাঁচে তরঙ্গ
আর কিছুতেই নয়।।

❑
সব হৃদয়ের ঐক্য–সূত্রে
সমাজ–দেহের এ পরিচয়,
একটি আলোর শিখা নিয়ে জ্বলে
এ সিনাই চির জ্যোতির্ময়।।

❑
একটি কথার গ্রন্থি হারায়ে
গুমরে কবিতা অর্থহীন,
যে সবুজ পাতা হারায় প্রশাখা,
হারায় সে তার ফাগুন দিন।।
❑
সত্য ন্যায়ের সবক নে ফের,
নে সবক তুই বীরত্বের,
তোরে দিয়ে কাজ হবে রে আবার
সারা দুনিয়ার ইমামতের।।
❑
সৃষ্টির আদি যুগ থেকে আছে চালু
এই পদ্ধতি, এই রীতি পুরাতন,
নবীর দীপ্ত প্রদীপ শিখার সাথে
আবু লাহাবের দ্বন্দ্ব চিরন্তন।।
❑
যে নর খঞ্জর ধরে আল্লা ছাড়া অপরের তরে,
তার দর্পী তলওয়ার বিদ্ধ হয় চির দিন নিজের পঞ্জরে।।
❑
যেদিন বিচ্ছিন্ন হ'ল ধর্ম আর রাষ্ট্র একে একে ;
লালসার আধিপত্য দেখা দিল সেই দিন থেকে।।
❑
বাদশাহী বিক্রম আর পরিহাস এ গণতন্ত্রের,
বিচ্ছিন্ন যখন ধর্ম রাজনীতি থেকে
অবশিষ্ট থাকে শুধু নীতি চেঙ্গিজের।।
❑
ব্যক্তি ও সমাজ যদি যুক্ত হয় খুলে যায় রহ্‌মতের দ্বার,
সমাজ সান্নিধ্যে পায় ব্যক্তির মানস চির মূল্য পূর্ণতার,
সমাজের সাথে রাখো সখ্যতা, সংগ্রামী হও ; হও মুক্তপ্রাণ ;
মহান নবীর কথা মনে রেখ ঃ দলত্যাগী সে যে শয়তান।।
❑
মানুষের সেবা শুধু নেতৃত্বের মূলতত্ত্ব
মোদের জীবন পদ্ধতির,

ফারুকের ইনসাফ সহজ, সরল আর
নির্বিলাস জীবন আলীর!
সাচ্চা দিল মুস্‌লিম নিল এই পৃথিবীতে নেতৃত্ব যখন ;
ঐশ্বর্য, শক্তির মাঝে নিল বেছে নির্বিলাস ফকীরী জীবন।।

❑

মুস্তফার মুহব্বত অমূল্য পাথেয় যার জীবন পথের
পর্ণ আধিপত্য তার প্রসারিত জলেস্থলে এই জাহানের।।
স্বাধীন তিমির মত বাস কর অন্তহীন সমুদ্র সলিলে।
যে নর সত্তাকে তার মুক্ত করে সীমানার কারাগৃহ থেকে
ক্ষুদ্রতার গণ্ডী ভেঙ্গে চিত্ত তার মুক্তি পায়
আদিগন্ত আকাশের নীলে।।

❑

তারায় তারায় গ্রহ সিতারায় র'য়েছে বিশ্ব ছড়ানো
সঞ্চরমান প্রজ্ঞার চোখে নতুন আকাশ জড়ানো।
দৃষ্টি যখন ফেরায়েছি আমি মোর আত্মার পাথারে ;
দেখেছি তখন আছে সুগোপন সিন্ধু আমারি মাঝারে।

❑

লাভ লোকসান হিসাব ছাড়ায়ে
বেঁচে থাকা জানি সেইতো জীবন,
কভু রাখা প্রাণ, কভু দেওয়া প্রাণ
জানি জানি আমি এইতো জীবন।।

❑

মদে মোমেন–ঈমানদারের
নিশানি জানাই, শোন ;
মরণ লগ্নে হাসি ছাড়া মুখে
চিহ্ন রবে না কোন।।

❑

আসবে সূরের হারানো রেশ, হয়তো সে আর আসবে না,
হেজাজ হাওয়া আসবে অশেষ, হয়তো সে আর আসবে না,
সীমান্তে আজ প'ড়ল এসে এই ফকীরের দিনগুলি ;
আসবে নতুন ধ্যানী এ দেশ ; হয়তো সে আর আসবে না।।

ফেরেশ্‌তাদের গীত

তালিম হোসেন

বুদ্ধি আজিও বল্গাহীন,
প্রেমের বসতি শূন্যে লীন,
সুচিরকালের হে রূপকার।
সৃষ্টি তোমার আজিও দীন।।

রক্ষণশীল, অথবা যার
আছে প্রগতির অহঙ্কার–
শোষণ–ক্ষেত্রে সব সমান
পীর ও আমীর এক কাতার।।

সাঁঝ–সকালের আবর্তন
প্রাচীন ধারারই অনুসরণ
দুনিয়াতে পরিবর্তনের
আজও নাই কোন নিদর্শন।।

ধনবান ধন–মদে মাতাল
তার পৃথিবীতে রুদ্ধ কাল,
বিষয়–বিবাগী ফকিরীতে
আপনা–বিভোল, মস্তী হাল।।

পথে পথে ফেরে নিঃসম্বল
আজিও খোদার বান্দা দল,
পুঁজির মালিক আজো গড়ে
আকাশচুম্বী রং–মহল।।

আজিও মানুষ জানে না হায়
প্রেম–প্রোজ্জ্বল কী মহিমায়,
কোন্ আগুনে সে জিন্দেগীর
শত বাধা–বন্ধন জ্বালায়।।

প্রেম জীবনের সত্য, আর
দুর্জয় খুদী প্রেমের সার–
খাপে ঢাকা আজো এ সত্যের
বন্ধ–ছেদন সে তল্‌ওয়ার।।

পাঞ্জাবের কৃষকের প্রতি

আবুল হোসেন

তোমার অস্তিত্ব বল কি সে, কি গূঢ় রহস্য তার
শতাব্দীর ইতিহাস হারিয়েছে পথের ধূলায়
নিভেছে তোমার শিখা সে ধূলোর গাঢ় অন্ধকারে
এবার জাগার পালা ডেকে যায় ভোরের মিনার।
মাটির মানুষ পারে মাটি থেকে আহার জোটাতে
কিন্তু প্রাণ নির্ঝরের ক্ষুধা সেতো পারে না মেটাতে
দেখেনি যাচাই করে যে কখনও আপন সত্তারে
এ জগতে নাম তার কতটুকু, দামই বা কী তার।
মূর্তি যত চূর্ণ হোক ধর্ম গোত্র জাতের মন্দিরে
সে প্রাচীন নীতি শাস্ত্র মানুষকে বেঁধেছে জিঞ্জিরে
ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে অচিরে
সারা দুনিয়ার লোক বাঁধা রবে মৈত্রীর বাঁধনে।
সেইতো চরম জয়, সে বিশ্বাস শক্তি আনে মনে
ছড়ায় আত্মার বীজ মাটিতে তোমায় ভালবেসে
আগামী কালের দীপ্ত আশ্চর্য ফসল ফলাবে সে

কর্ডোভার মসজিদ

মনির উদদীন ইউসুফ

[স্পেনের কর্ডোভায় রচিত]

দিনের পরে রাত্রি আসে ঘটনা সব মূর্ত হয়,
দিন রজনীর সুতায় গাঁথা এই জগতের সৃষ্টি লয়।
রাত্রি দিবস সাদা কালো এমন দু'টি সূত্র যা'য়—
পরম আত্মা প্রকাশ তরে রচেন স্বীয় বসন তায়।
রাত্রি দিবস অনন্ত তাঁর স্বর্গ–বাণীর গভীর তান,
ছন্দে লয়ে তোলেন যাতে সম্ভাবনার বিপুল গান।
তোমায় পরখ করছে সে যে, আমায় পরখ করছে সে,
রাত্রি দিবস সাত ভুবনে কষ্টিপাথর কষছে যে।
মূল্য তোমার কম হলে গো, মূল্য আমার কম পেলে,
ধরবে ছেঁকে মৃত্যু মোদের রাত্রি দিবার জাল ফেলে।
দিন রজনীর অর্থ তোমার এমন কিছু নয় হে যার
অস্ত উদয় গুণবে বসে, চলন্ত সে কালের ধার।
আনাগোনার এই যে লীলা জগৎ মাঝে চলছে হায়,
সকল কিছুর পরে সে যে মরণ কাঠি ছুঁইয়ে যায়।
অন্ত আদি হারিয়ে যাবে, গোপন প্রকাশ রইবে না,
অতীত ছবি ভবিষ্যতের লক্ষ্য যে কাল বইবে না।

কিন্তু শুধু সৃষ্টিতে সেই অনন্ত কাল যায় বয়ে,
গড়েছে যা' বিশ্বাসী এক খোদার প্রেমে বুঁদ হয়ে।
বিশ্বাসীদের চরিত্র যে প্রেম–আলোতে জ্যোতিষ্মান,
মৃত্যু হারাম তাহার তরে, জীবন তাহার অমর–প্রাণ।
যদিও কালের সব ডোবানো বন্যাগতি দুর্নিবার,
দুর্দমতর প্রণয় পারে করতে চলা রুদ্ধ তার।
প্রেমের মাঝে লুকিয়ে আছে ছন্দময় একাল ছাড়া,
নাম–না জানা আরো অনেক নূতন নূতন কাল–ধারা।
প্রেম সে হ'ল জিব্রাঈলের পরম–আয়ুর মুক্ত গান,
খোদার রসূল মুহম্মদের পবিত্র সেই মহান প্রাণ।

প্রেমের পূত উন্মাদনায় মাটির পুতুল দীপ্তিমান,
প্রেম–পেয়ালার মদ্যবারি বিধাতারই হাতের দান।
প্রণয় কা'বার শাস্ত্র–বিধি, মুজাহিদের অমর নাম,
প্রণয় চিরযাত্রী পথের, লক্ষ্য তাহার হাজার ধাম।
প্রণয় জীবন–বীণার তারে মৃত্যুবিহীন গানের তান,
প্রেমই উজ্জ্বল জীবন–জ্যোতিঃ, প্রেমের বলেই দীপ্ত প্রাণ।

ওগো প্রিয় হরম, তোমার বক্ষ বিশাল প্রেমের দান,
তাই তোমারে ঘিরে নাচে মৃত্যু বিহীন অগাধ প্রাণ।
রঙ–তুলিকা, পাথর–কাদা, বাক্য–গানের শিল্প সব,
প্রাণের শোণিত–পরশ পেয়ে মূর্ত করে অমর স্তব।
রক্ত ফোঁটা প্রাণের যদি শিলায় পড়ে হৃদয় হয়,
মর্মে তখন বেজে ওঠে সঞ্জীবনী প্রাণের জয়।
দৃশ্য তোমার ভুবনমোহন, গানটি আমার মত্তপ্রাণ,
টানছ তুমি প্রাণকে—আমি বিশালতা করছি দান।
খোদার আরশ হতে কিছু কম কি মানব চিত্ত তার
যদিও দেহের ধূলার রাশি গগন–সীমা হয় না পার।
আলোক–বরণ ফেরেশতারা সিজদা করার সুযোগ পায়,
কিন্তু ব্যথা–মর্ম–ভরা সিজদা তারা কোথায় পায়?
হিন্দ দেশের প্রেমিক আমি, মত্ততা মোর দেখ্ চেয়ে,
প্রাণের দরূদ সালাম আমার কণ্ঠে তুফান তুলছে যে।
মত্ততা মোর স্বরের 'পরে মত্ততা মোর গানের 'পর,
আল্লাহু–এর ছন্দটি মোর শোণিত–শিরায় তুলছে ঝড়।

মহান তোমার সুন্দরতা, বিশ্বাসীদের প্রতীক সে,
অতুল তুমি, মহান তুমি তারাও মহান অতুল যে।
ভিত্তি তোমার শক্ত অতি, স্তম্ভ তোমার সংখ্যাহীন,
খেজুর বনের অজস্রতা যেমন মরুর প্রান্তে লীন।
তোমার দ্বারে অলিন্দে গো, তূরের জ্যোতিঃ চমকে চায়,
তোমার উঁচু মিনার হাসে জিব্রাঈলের পাখার ছায়।
ধরায় কভু মুসলমানের মিটবেনা গো, নাম নিশান,

আজানে তার জ্বলে ওঠে কলীম খলীল নবীর প্রাণ।
দুনিয়া তাহার অসীম যেগো, দিগন্তে তার ধূলার মিল,
সাগরে তার দজলা ফুরাত নীল দেনূবের ঊর্মি নীল।
অতুল তাহার ইতিবৃত্ত উপমাহীন তাহার গান,
অতীতকে সে দিয়ে গেছে অবিরত চলার দান।
প্রেম–আসরে সাকী সে যে মুক্ত মাঠে ঘোড়সওয়ার,
মদ্য তাহার স্বচ্ছ অতি, রুদ্র তাহার খড়্গধার।
সৈনিক সে বর্মটি তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'
তরবারির ছায়ার তলে সহায় তাহার 'ইল্লাল্লাহ্'।

তোমার মাঝে রূপ নিয়াছে মুসলমানের মহৎ প্রাণ,
তাহার দিনের চঞ্চলতা, তাহার রাতের মধুর গান।
উঁচু তাহার প্রাণের আসন, কল্পনা তার মুক্তধার—
আনন্দ তার আকাঙ্ক্ষা তার প্রণয় মধুর অহংকার।
মুসলমানের বাহুতে যে শক্তি দানে খোদার হাত,
তাই সে মহাশক্তিশালী কর্মকুশল দিবস রাত।
নূর ও মাটির মিশ্রণে তার সত্তা যে গো চমৎকার,
দুই জাহানের মিথ্যা মায়া লোভায় না গো নয়ন তার।
বাসনা তার বাঁধ মানেনা, লক্ষ্যটি তার মহত্তর,
ভঙ্গিটি তার মনোহরণ, দৃষ্টি তাহার স্বচ্ছতর।
মধুর মৃদু ভাষণ তাহার, শ্রান্তিবিহীন অন্বেষণ,
যুদ্ধ ভূমি হোক বা আসর পবিত্র তার হৃদয় মন।
সত্য–কাঁটার কেন্দ্র যে গো, তাহার বুকের ঈমান হয়।
বুদ্ধি তাহার মনের কাছে সকল কিছুর প্রমাণ নয়।
বুদ্ধি বোধের লক্ষ্য নিজেই, প্রেমের মধুর ফলটি সে,
গগন–পরিমন্ডলের ওই গ্রহতারার মর্ম সে।

সকল কলা–শৈলী তোমা পূজে তোমার গর্ব বয়,
তোমার তরেই আন্দালুসের মাটি কা'বার তুল্য হয়।
গগনতলে উপমা তোর কোথাও খুঁজে পাইনা যে,
থাকে যদি কোথাও কোন—মুসলমানের হৃদয় সে।

সত্য-সেবক হায়, কোথা সে আরব দেশের ঘোড়সওয়ার?
মহত্তম চরিত্রটি করত বহন ঈমান যার।
শাসন যাহার করেছিল ব্যক্ত নিগূঢ় তত্ত্ব এই—
'আহলে দিলের' রাজমহলে ধনের মস্তি গর্ব নেই।
দৃষ্টি যাহার অস্ত উদয় দেশ ও কালে অনির্বাণ,
প্রতিভা যার ইউরোপেরে করেছিল আলোক দান।
যাদের শোণিত শিরায় ধরি' নামায় আজো ব্যথার ভার,
হাস্যে মধুর আন্দালুসী ফুটিয়ে তোলে চিত্ত আর।
সেথায় আজো হেথায়-হোথায় হরিণ-আঁখি যায় দেখা,
মধুর দিঠির শায়ক যে হায়, পার করে গো হৃদ্‌রেখা।
ইমন দেশের গন্ধ আজো বাতাসে তার মিশিয়ে রয়,
হেজাজ দেশের সুরটি জাগায় তাহার গানের ছন্দ-লয়।

চোখের তারায় জাগে আহা, তোমার দেশের দিগ্বলয়,
কত বরষ ধরে হেথায় আজানবিহীন প্রভাত রয়!
কোথায় সে কোন্ উপত্যকায়, কোন্ মরুতে অস্ত যায়
বিশ্ব-বরণ প্রেমিক-পরান সে যাত্রীদল হায়রে হায়!
জার্মানীতে ধর্ম নূতন সংস্কারের বান-জলে,—
পুরাতনের চরগুলি সব তলিয়েছিল কোন্ তলে!
পূজ্য পরম গীর্জাপতি তূফানে যার কম্প্রকায়,
সূক্ষ্ম শোভন চিন্তা-তরী ভেসেছিল তারির বায়।
ফরাসীরাও দেখেছিল দারুণ সে এক উপপ্লব,
যাহার ফলে টলেছিল পশ্চিমেতে ভুবন সব।
পুরাতনের পূজায় রত রোমান জাতির বুড়োর দল,
নব যুগের পরশ পেয়ে—হয়েছিল প্রাণোচ্ছল।
মুসলমানের মর্মে আজি তেমনি প্রাণ ঢেউ খেলায়,
বিধাতারই বিধান ইহা, বলতে কথা মূর্ছা যায়।
এই সাগরের ঢেউয়ের থেকে জাগবে কি তা' দেখ্ চেয়ে,
নীল বরণী গগনখানি কি রঙনে রঙবে যে!
দিগন্তে ওই অস্তরাগে রঙ্গীন মেঘের দলগুলি,
বদখ্‌শানের 'লাল' তাহাতে ছড়িয়ে গেল কার তুলি!
সহজ কত গভীর তবু কৃষক-মেয়ের গানটি আজ,
প্রাণের তরী চলছে দুলে যৌবনেরি বন্যা আজ।
সাগর গামী কবীর নদী কে ওই তোমার তটের ছায়,

বসে বসে দেখছে আজি অনাগতের স্বপ্ন হায়!
নূতন জগৎ ঢাকা আজো প্রতিশ্রুতির অন্তরে,
আমার চোখের সাগরে তার উষার আলো সন্তরে।
আবরণ আজ সরাই যদি প্রকাশ করি মর্ম মোর,
ফিরিঙ্গী–চোখ ঝল্‌সে দেবে আমার উজ্জ্বলতার ভোর।
ইন্‌কিলাবের ঢেউ নাচেনা, জীবন সে নয়, মৃত্যু যে,
জাতির পরমাত্মা বাঁচে উপপ্লবের নৃত্যে হে !
কালের হাতে সেই সে জাতি মুক্ত তরবারির প্রায়,
কর্মকৃতির হিসাব যে গো, নিত্য করে সাঁঝের ছায়।
শিল্পকলা অপূর্ণ যে হৃদয়–শোণিত দান বিনা,
গান সে অসার মাতলামি গো, না বাজিলে প্রাণ–বীণা।

গজল–১

মনির উদ্‌দীন ইউসুফ

প্রলয় সৃজন উথাল পাথাল
তারাদের গতি দারুণ, সাকী!
প্রতিটি হৃদয়ে ব্যথা নিদারুণ
প্রলয়বিষাণ বাজিছে, সাকী!
ধর্ম–বুদ্ধি পালিয়ে গিয়েছে
আল্লাওয়ালার কোথায় আজ?
অনলবর্ষী কোন্ সে প্রিয়ার
কটাক্ষ ওই হানিছে, সাকী।
সেই পুরাতন ব্যাধির প্রকোপ
হৃদয়ের সেই অধীর জ্বালা,
প্রতিকার তার সেই পানীয়
মধুর মদিরা হায় গো, সাকী!
কাবার মরমে বাসনার জ্বালা
সৃজিত হয় না তেমন আর,
সৃজন–বেদন আজো হে তোমায়
যবনিকা–পারে রয়েছে, সাকী!
উঠিল না আর কোন রুমী সেই
পারস্য ফুল–বিতান হতে,

ইরানের সেই জল হাওয়া আছে
তাব্রিজ তুমি তেমনি, সাকী!
ব্যথিত আপন স্বদেশ হইতে
নহে ইকবাল নিরাশ আজো,
বারিপাত যদি হয় পরিমিত
এ ভূমি সুফলা বহত, সাকী!

গজল–২

এখনো তো তুমি প্রবাসী পথিক
স্থানের সীমানা ছাড়িয়া চল,
হেজায মিশর পারশ্য শ্যাম
পার হয়ে তুমি এগিয়ে চল।
লক্ষ্যবিহীন কর্ম কখনো
সফলতা কিছু আনে না জেনো,
খাইয়াম সাকী সুরা ও পাত্র
ছেড়ে মুসাফির ছুটিয়া চল।
স্বর্গ রচেছে য়ুরোপ যদিও,
ভুবন–মোহন রূপটি তাঁর
আকাশ–মুখীন বিহঙ্গ তুমি
পাখি–ধরা জাল এড়িয়ে চল।
পাষাণ–গলা আঘাত তোমার,
প্রতীচ্য প্রাচী খুলেছ তুমি;
বাঁকা তলোয়ার–নবচাঁদ তুমি,
খাপ–কোষ হতে বাহিরি' চল।
তোমার ইমাম উদাসীন আর
নমাজ তোমার প্রেরণাহীন,
এমন নমাজ নাইবা পড়িলে
এমন ইমাম ছাড়িয়া চল।

জীবন

মনির উদ্‌দীন ইউসুফ

লাভ ক্ষতি আশঙ্কার উর্ধ্বে রহে অমর জীবন,
প্রাণের রক্ষণে কভু-রক্তদানে তাহার স্পন্দন।
পরিমাপ করিয়ো না তুমি তার সময়ের মাপে,
অমর চলিষ্ণু সে যে চিরযুবা যৌবনের তাপে।
প্রাণ যদি আছে তবে সৃষ্টি কর আপন জগৎ,
'প্রকাশ'-র তত্ত্ব তুমি, সত্তা তব অতীব মহৎ।
জীবনের গূঢ় কথা জিজ্ঞাসিও ফরহাদের কাছে,
জীবন 'শিরের জল' 'কুঠার' ও 'শিলা' হয়ে নাচে।
ক্ষীণ স্রোত মুছে যায়, লুপ্ত হয় তাহার মহিমা,
মুক্ত জল রূপ ধরে সমুদ্রের বিস্তৃতি অসীমা।
বিজয় বাসনা হতে মূর্ত হয় সফল জীবন,
মৃত্তিকা মুষ্ঠির মাঝে যদিও সে রয়েছে গোপন।
অস্তিত্ব-সাগরে বন্ধু, জাগিয়াছ বুদ্বুদের মত,
অনিত্য সংসারে তুমি জীবনের পরীক্ষায় রত,
অপক্ক রহিবে হায়, থাক যদি মৃত্তিকারে চুমি,
ইস্পাত-কঠিন হও, কোষমুক্ত তলোয়ার তুমি।
সত্যের পিপাসা লাগি প্রাণ যার মরণ-ব্যাকুল,
পূর্বাহ্নে করুক সৃষ্টি দেহে তার বীর্য সে অতুল।
ফুৎকারে নিভাক সে এ ধার করা আকাশ-দুনিয়া,
মনোমত বিশ্বসৃষ্টি করে নিক সেই ভস্ম দিয়া।
অন্তর-নিহিত তেজ টেনে আন ওরে উদাসীন,
অমর স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করুক সে প্রয়াস নবীন।
প্রাচ্যের এ চক্রবালে দীপ্ত হও মহাসূর্য সম,
বদখ্‌শানে নিক পুনঃ মহার্ঘ সে-মানিক্য জন্ম।

দুরন্ত ক্রন্দন তব পান্থ হোক গগনের পথে,
অসংখ্য চলার সাথী করে নিক তারাদল হতে।
হাশরের লগ্নে তুমি আছ প্রভু বিচার অঙ্গনে,
কর্মের সঞ্চয় তবে তুলে ধর পরম সুক্ষণে।

রাজত্ব

'ইন্নাল মুলূক'   বাণী, শোন তার রহস্য গভীর,
রাজত্ব মায়ার খেলা যত সব শাসক জাতির।
জেগে যদি উঠে কভু পরাধীন টুটিয়া স্বপন,
রাজশক্তি কানে তার পড়ে মন্ত্র ঘুমের গহন।
সুলতান মামুদ রাজা করিয়াছে আয়াযে এমন,
গোলামীর রজ্জু তার মনে হয়, মালিকা মোহন।
অবশেষে ইস্রাফিল রক্তে উঠে দূরন্ত তুফান,
মূসার নেতৃত্বে ভাঙে সামিরীর জাদুর নিশান।
বল, সে পরম প্রভু সপ্ত বিশ্ব সৃজন যাঁহার
রাজযোগ্য তিনি শুধু মাটির প্রতিমা সব আর।
আত্মারে করোনা তব দাসতায় কলঙ্ক-মলিন,
সম্মানে সে হয় জেনো, ব্রাহমণের চেয়েও কুলীন।
পশ্চিমের গণতন্ত্র সে তো সেই সুরের ব্যঞ্জনা,
যে-সুরে জাগিয়া উঠে সীজারের অস্ত্রের ঝঞ্ঝা
জুলুম-দানব নাচে গণতন্ত্র যবনিকা ধরি,
আহা, তুমি ভাব তারে স্বাধীনতা-স্বপ্নের সুন্দরী।
প্রজাতন্ত্র পরিষদ সংস্কার দাবীদাওয়া আর,
ঘুমের আরক রচে পাশ্চাত্যের রসায়নাগার।
জাতিসংঘে জ্বালাময়ী পরস্পর বিরোধী ভাষণ,
পুঁজিবাদীদের সেও সুবর্ণ-সংগ্রাম সনাতন।
বর্ণ গন্ধ-মরীচিকা-এরে তুমি ভেবেছ কানন,
অবোধ, এ খাঁচাটিকে ভাবিয়াছ নীড়ের মতন।

পুঁজি ও শ্রম

শ্রমিকে শোনাও তুমি, প্রাণদ এ বাণীটি আমার,
খিজিরের বাণী নয়,–বাণী এ যে জগৎ-সত্তার।
কপট এ পুঁজিপতি করিয়াছে নিঃশেষ তোমারে,
শত শত বর্ষ ধরে ভাগ্য তুমি সঁপেছ যাহারে।
তোমারি সম্পদ তুমি এতদিন করিয়া যতন
ধনীদের হাত হতে লভিয়াছ ভিক্ষার মতন।
'আলমূতে'র জাদুকর দিয়াছে যে-হাশিশ তোমারে
আবেহায়াতের মত তুমি বন্ধু ভেবেছ তাহারে।
বংশ আর জাতীয়তা রাষ্ট্র ধর্ম বর্ণ ও সভ্যতা,
তোমার পানীয়ে তারা মিশায়েছে সর্ব মাদকতা।
বিলায়েছ আপনারে মিথ্যা যত আশা-দেবতায়,
জীবনের পুঁজি আহা, বিকায়েছ মাদক-নেশায়।
কপট পাশার চালে পুঁজিপতি জিতিয়াছে বাজি,
সারল্য করেছে তোমা, হে মজুর, সর্বস্বান্ত আজি।
দাঁড়াও, জীবন-বীণা সুরে আজ নূতন ব্যঞ্জনা,
হয়েছে পশ্চিমে পুবে তোমারই যুগের সূচনা।

মহতী পিপাসা যার সমুদ্রেও তৃপ্ত সে যে নয়,
হিমকণা পেয়ে তুমি করে যাবে চিরকাল ক্ষয়?
গণতন্ত্র-জাগরণী আনিয়াছে ভোগের সকাল,
সিকান্দার জামশিদের স্বপ্ন বল, আর কতকাল?
ধরিত্রী-উদর হতে নবসূর্য জন্ম লভিয়াছে,
তারাভরা রাত্রি লাগি বিলাপের দিন কি গো আছে?
মানব-প্রকৃতি আজ ভাঙিয়াছে যত না শিকল,
স্বর্গ লাগি কাঁদিবে গো কেন আজ মানব সকল?
বাগানের মালী-কানে কহিতেছে বসন্ত-সমীর,
পুষ্পের ক্ষতের লাগি আর কত রহিবে অধীর?
অবোধ পতঙ্গ! শিখা-রূপানল হতে মুক্ত হও,
স্বরূপ-জ্যোতির জালে জোনাকীর মত দীপ্ত রও।

আজান

মনির উদ্‌দীন ইউসুফ

একদা প্রভাতী তারা তারাদলে পুছে এ খবর,–
'তোমরা দেখেছ কেহ মানুষেরে কখনো জাগর?'
নিয়তি-গণক শনি কহে তবে নীরবতা ভাঙি,
'জাগৃতি শোভন নয় এই ক্ষুদ্র বিদ্রোহী লাগি।'
জোহরা তারকা বলে, 'কি প্রসঙ্গ তুলিলে প্রভাতী?
রাতকানা ক্রিমিকীট,–অতি তুচ্ছ এ মানুষ জাতি।'
পূর্ণচন্দ্র বলে 'শোন, জ্যোতিষ্ক সে ধরার আকাশে,
তোমরা দীপিত হও রজনীতে, সে দিনে প্রকাশে।
যদি সে বুঝিতে পারে কি মাহাত্ম্য যামিনী-জাগরে,
সুরাইয়া তারার চেয়ে উঠে যাবে আরো উচ্চস্তরে।
কোলেতে লুকানো তার জ্যোতি সেই অতি সমুজ্জ্বল,
মগ্ন হবে যাতে সব গগনের স্থানু ও সচল।'
সহসা দিগন্ত হোল পরিপূর্ণ আজান-সুস্বরে,
যাহা শুনি কম্প উঠে সুকঠিন পর্বত-পঞ্জরে।

সুলতান টিপুর শেষ উপদেশ

মনির উদ্‌দীন ইউসুফ

বাসনার লক্ষ্যে তুমি যাত্রী? তবে থেমো না নিখিলে,
স্বয়ং লাইলী যদি সঙগী হয় বসো না মহ্‌ফিলে।
তুমি ঝর্ণা বয়ে চল, তুর্যগতি নদী হও তুমি,
তীর যদি পাও তবু; ছুঁয়োনাক সেই তীরভূমি।
হারিয়ে যেয়ো না, তুমি এ বিশ্ব-মন্দির মাঝে কোথা,
চিরমুক্ত তুমি বন্ধু, আসরেতে বসো না অযথা।
অনাদি প্রভাতে মোরে জিব্রাঈল বলেছিল ডেকে,
হৃদয়েরে মুক্ত কর বুদ্ধির এ দাসত্বের থেকে।
ঊর্ধ্বে উঠ দ্বন্দ্ব হতে একত্বের মাঝে রও বেঁচে,
সত্য ও মিথ্যার মাঝে মধ্য পথ নিয়োনাক বেছে।

বাল্- ই- জিব্রীল

বেগম সুফিয়া কামাল

মেল আঁখি হের সুন্দর ধরা
হের নভতল, প্রকৃতি হের;
পূব–দিগন্তে উদিত সূর্য
ক্ষণিকের লাগি তাহারে হের।
গুণ্ঠনহীন উজ্জ্বল বিভা
গুণ্ঠন ঢাকা তাহারে হের,
বিরহ যুগের যাতনা মথিত
অত্যাচারিত হৃদয় হের।
অধীর হয়ো না। দেখ কী দ্বন্দ্ব
রয়েছে আশা ও ভীতির মাঝে,
তবু মেঘ হতে বরিষণ–ধারা
শীতল করিতে তোমারে যাচে।
গভীর মহান অন্তরীক্ষ
নীরব প্রকৃতি শ্যামল ধরা,
গিরি, মরু এই সিন্ধু–সলিল
বায়ুমন্ডল সুরভি ভরা।
সব সত্তার একদা যে ছিল
ফিরিশতাদের ব্যর্থ হাতে
কালের মুকুর স্বচ্ছ তোমার–
নিজেরই ছায়া পড়েছে তাতে।
বিশ্ব সূর্য আলোকের শিখা
তোমার প্রাণের শিখায় জ্বলে,
তোমার সাধনা সৃজন করেছে
নবীন ভুবন ফুল–ফসলে
অঙ্গীকৃত ফিরদৌস নহে
তুলনীয় সেই ভুবন সাথে,
সে শুধু রয়েছে হৃদয়–রক্তে
রাঙানো তোমার হিয়ার পাতে।
তুচ্ছ মাটির সৃজিত মানুষ
সাধনা তাহার তুচ্ছ নয়,
বিরামবিহীন সাধনায় হের
সে মানুষ লভে পূর্ণ জয়।

বালে জিবরিল

মোহাম্মদ সুলতান

তব কুঞ্চিত চিকন চিকুরে
আরও নবতম, সুষমা ভরি,
আমার নয়ন মন চঞ্চল
সব সম্বিত লহ গো হরি।
রহিবে সুষমা গুণ্ঠন আড়ে
প্রেমও রবে চির অন্তরীণ,
খোল আবরণ তব আননের
নহে হক প্রেম কুণ্ঠাহীন।
তুমি সুগভীর অসীম সিন্ধু
আমি যে বিন্দু তটিনীধারা,
তোমার অতলে কর মোরে লীন
নহে কর কূল–বাঁধনহারা।
মুকুতা অলস হই যদি আমি
দুলাও তোমার কণ্ঠহারে,
শূন্য শুক্তি হই যদি তবে
মণিময় তুমি কর গো তারে।
মাধবী কুঞ্জ কল–গুঞ্জন
ভুঞ্জন যদি নসিব নয়
দগ্ধ বিরহে কর বুলবুল
কণ্ঠমাধবী গীতিকাময়।
জান্নাত হতে ধরার ধূলায়
নির্বাসন যবে দিয়েছ হায়,
ফিকির দীর্ঘ কর্মঅন্তে
রহ পথ চাহি প্রতীক্ষায়।

২

আমার প্রেমের গীতি ধ্বনিত হইল যবে তোমার কাবায়;
সে কি কল–কলরোলে পানাহী–যাচিল তব শত প্রতিমায়।
আতসী–ফেরেস্তা, হুর মস্তিষ্ক কারায় মোর বন্দী শুধু নয়।
তোমার তজল্লী–তেজ আমার আঁখির তীব্র দৃষ্টি নাহি সয়।
মম লক্ষ্য খুঁজে ফিরি মন্দির মসজিদে যেথা তুমি মূর্তিমান,
কাবায় সোমনাথে তবু গুমরি উঠিছে মোর ব্যর্থতার গান।

ভেদিয়া সৃষ্টির ভেদ আমার আঁখির দীপ্তি কভু চলে যায়;
সংস্কার আঁধার পথে কভুবা স্তিমিত জ্যোতি আপনা হারায়।
বিশ্বের অন্তরতম সুগোপন মহাবাণী ছিনু অপ্রকাশ;
একি হেরি অঘটন আমারেও নগ্ন রূপে করিলে প্রকাশ?

৩

পাত্রে তোমার বলো প্রভু সিরাজী আর নাই বাকী
তৃষ্ণায় কাতর রইব আমি, তুমি কি মোর নও সাকী?
সিন্ধু হতে বিন্দু শিশির পায় যদি গো পিপাসু যে,
কৃপণতাই বলব তারে বদান্যতা নয় কভু সে।

বিপথে যদি গো ভ্রমে তারাদল
আসমান তব, নহেত মোর;
দুনিয়া তোমার চিন্তায় তার
কেন মিছে আমি রব বিভোর?
অসীম শূন্যে যদি কভু হায়
প্রেম গীতিকার না ওঠে শোর,
তুমি দায়ী তার হে, মহামহিম।
"লামকা" তোমার নহেত মোর?
সৃষ্টির দূর আদিম প্রভাতে
কেন আজাজিল পাপী সে ঘোর—
লংঘিল তব আদেশ চরম
সে ভেদ তোমার নহে ত মোর?
তব মোহাম্মদ, তব জিব্রিল,
শাশ্বত বাণী কোরআনও তোর,
সকলের মাঝে তোমারই বিকাশ
তোমারই প্রতীক নহেত' মোর?
তব নূরে আলো গ্রহতারাদল
করুণার তব নাহিত' ওর
মাটির আদম হইলে পতিত
ক্ষতি সে তোমার নহেত মোর?

জিবরিল ও ইবলিস

সৈয়দ আবদুল মান্নান

জিবরিল

পুরাতন হে বন্ধু আমার,
বর্ণ ও গন্ধের এই পৃথিবীর বল সমাচার।

ইবলিস

আকাঙ্খা, সন্ধান সেথা দুঃখ–জ্বালা দাগ বেদনার।

জিবরিল

তোমার বাচন–ভঙ্গি নভোমুখী বহে প্রতিপল,
জান না, কলঙ্ক তব কখনো কি হবে না নির্মল?

ইবলিস

এই তত্ত্ব তব কাছে এখনও অজ্ঞাত সংবাদ ....
আমার পেয়ালা ভেঙ্গে আমারে যে করেছে উন্মাদ।
এখানে আমার থাকা অসম্ভব একান্ত বে–মন,
কক্ষহীন এ পৃথিবী নিস্তব্ধ অচেতন।
যার আশাহীনতায় ধরণীর হৃদয়ে জ্বলন ....
নিরাশ হওয়া না হওয়া তার জন্য ভালো কি কখন?

জিবরিল

সমুচ্চ আসন–ভ্রষ্ট তুমি শুধু অস্বীকার দ্বারা ....
আল্লাহর নজরে তাই ফেরেশতা যে সমাদর–হারা।

ইবলিস

আমার দুঃসাধ্য কর্মে মৃত্তিকার চেতনার সঞ্চার ....
আমার ঔদ্ধত্যে মুক্ত জ্ঞান, স্পন্দ তারের ঝংকার।
দেখেছি দাঁড়ায়ে তীরে ভালো আর মন্দের সংগ্রাম ....
কে করে বেদনা সহ্য? তুফানের আঘাত উদ্দাম?
খিযর সহায়হীন, ইলিয়াসও জানি অসহায় ....
আমার তুফান চলে নদী থেকে সাগরে ঝর্ণায়।
গোপনে সুযোগ যদি হয় তবে পুছিও আল্লায় ....
আদমের কিস্‌সা কার রক্ত রঙে সুরঞ্জিত, হায়।
আল্লার স্মরণে আমি বিঁধে আছি কাঁটার মতন
যা হোক তবুও বলি, আল্লা আল্লা–সেই একজন।

কালাম-ই-ইকবাল

মুফাখ্খারুল ইসলাম

আমার প্রেমের গজলগীতির রোল উঠেছে
রোল উঠেছে এ প্রকৃতির হারম–ছায়ঃ
আল্–আমানের শোর উঠেছে
নানান্ গুণের বুত– খানায়।
হুর–মালায়েক রইছে আমার চিন্তাধারায় বন্দী ধীর;
আমার চোখেই পড়ল ধরা খলল্ তোমার তজল্লীর!
বুতখানা আর হারমশরীফ উভয় ছবি তৈরী যার
খোঁজ করি আজ যদিও তারে
সোমনাথে আর কাবায় সমান প্রলয় জাগায় সে চিৎকার
হুংকারে মোর গর্জে যখন আর্তনাদ।
তীব্র আমার দৃষ্টিপাত
করছে কখন হাস্তীরে জোর আক্রমণ,
কখনো বা কল্পনা মোর উচ্ছ্বসিতে করছে নাদ–
ছিঁড়তে নারি এই বাঁধন।
এ কি গযব করলে তুমি? – করলে প্রকাশ মোরে;
রহস্যে ত আমিই ছিলাম অপ্রকাশের ডোরে।

তোমার কুজায় শরাব যে আর রইল নাকো বাকী,
বলো, তবে এখন কি আর নও তুমি মোর সাকী?
সাগর থেকেও ফোঁটা ত পায় শিশির–নীর।
বখীলপনাই বল্‌ব এরে–
এ নয় ধারা রায্‌যাকীর।

আছর করুক,
চাই না করুক,
শুনে ত নাও নালিশ মোর;
প্রতিকারের নইক গুজার
আযাদ আমি গুলাম তোর!
এই যে মাটির মুষ্টি আমি,
আকাশ জোড়া আতশ–ঝড়, –
আবিষ্কারের মজা এ কি?–

– সিত্‌ম না কি মেহের–বর।
নসীম হাওয়ায় ফুলের খীমা
পারল না যে টিকতে আর,
মধুমাসের এই কি ফসল,
এই কি হাওয়া বয় আশার?

পাপী আমি বিদেশবাসী;
কিন্তু তোমার ধ্বংসশেষ
সেই দুনিয়া
করতে আবাদ
ফিরিশ্‌তা কি পারবে লেশ্‌?
সফীদ বিরাট সেই বিয়াবান–
বে–বুনিয়াদ সেই জাহান,
ওইত আমার পীড়ন–চাওয়া
দিল–কে করে আশিস দান।
শংকাগ্রাহী হৃদয় যাহার
নাইকো তাহার শান্তি–সুর,
গুলশানে তার
ওৎ পেতে রয়
কাল্‌শিকারী অনেক দূর।
শওক আমার নয় কামিলা
তোমার পাকিজার কাছে,
এসব হল কাজ তাদেরি
অনেক তাকত যার আছে।
জওয়ানদেরে
শুনাও আমার
ফজর বেলার এই বিলাপ,
শাহীন বাজের বাচ্চারে ফের
দাওগো ডানা–
ডানার তাপ।
আয় খুদা, এই আরজু আমার,
পেশ করে দেই তোমার ঠাঁই,
আমার দিলের নূরের নজর
আজকে যেন পায় সবাই।

খোদার সমীপে লেনিন

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

মনুষ্য ও প্রকৃতিতে তোমার অস্তিত্ব আছে ভরা,
সত্য এই তুমি আছ জাগ্রত ও অতন্দ্র প্রহরা।
কেমনে বুঝি আমি তুমি আছ কিম্বা তুমি নাই,
প্রতিক্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিয়াছি বুদ্ধি ভাষ্যভরা।
প্রকৃতির চিরায়ত আমাতে না আছিল অজ্ঞাত,
আকাশের তারাগণ কিম্বা নিম্নে শস্পের পসরা।
আজ আমি দেখি যবে ব্যর্থ ধর্মবাণী যত অর্থহরা।
মোরা বন্দী রাত্রিদিনে পাশবদ্ধ যেন ক্রীতদাস,
স্রষ্টা তুমি, দেহ দৃষ্টি অস্ত্র তন্ত্র তব হস্তে গড়া।
যতদিন ছিনু আমি আকাশের চন্দ্রাতপ তলে
কাঁটা হেন বিঁধিয়াছে হৃদয়েতে এ জিজ্ঞাসা ভরা।
আপনার বচনেতে আপনার নাহি রহে বল,
আপন অন্তরে যবে ওঠে ঢেউ চিন্তা নৃত্যপরা।
কেবা সেই নর যেবা করে থাকে তোমার পূজন
অম্বরের তলে এই ধরণীতে বিচরণ করা?
শ্বেতকায় ফিরিঙ্গিরা প্রাচ্যভূমে যেন খোদাবন্দ,
প্রতীচ্যের খোদাবন্দ্ ধাতু যত দীপ্ত জ্যোতিধারা।
ইউরোপে আছে বহু জ্যোতি জ্ঞান আছে শিল্পকলা,
সত্য এই তমিস্রায় যত পশু সব অন্ধ করা।
গির্জারে ছাড়িয়ে গেছে যত সব ব্যাঙ্ক-ইমারৎ,
উজ্বল নির্মাণে আর পরিচ্ছন্ন আলোকেতে ভরা।
বাহিরেতে তেজারতি, আসলে সে সবই জুয়া খেলা,
একে পায় সুদ আর লক্ষ লক্ষ অকস্মাৎ মরা।
এই জ্ঞান এই প্রজ্ঞা এই ভীতি এই এ শাসন–
রক্তপান করে এরা শিক্ষা দেয় সবে সাম্য করা।
বেকারি ও নগ্নতা ও মদ্যাসক্তি আর দরিদ্রতা–

কিবা কম এ ফিরিঙ্গি সভ্যতার দানের পসরা!
সেই জাতি রয়েছে যে ঈশ্বরের কৃপাতে বঞ্চিত
বাষ্প ও বিদ্যুৎ তার কামালের শেষ সীমাধরা।
যন্ত্রের শাসন সে তো হৃদয়ের মৃত্যুর সনদ,
বীরতার কল্পনার বিমর্দনে যত অস্ত্র ভরা।
কিছু কিছু যে লক্ষণ দেখিয়াছি মনে হয় তাতে
ভাগ্যের কৌশল কাছে হইয়াছে চেষ্টা মাৎ করা।
সরাবখানার ভিতে এরে দেখি প্রকম্পন জাগে,
খারাপের পীরগণ বসি আজি এই চিন্তা ভরা।
সন্ধ্যামুখে মুখ পরে দেখা দেয় সেই যে লালিমা,
কার কাজ? প্রসাধন? মদ্য আর মদ্যের পসরা?
শক্তিধর বিচারক তুমি, কিন্তু তব পৃথ্বী' পরে
পরাধীন মজুরের দিন বহু তিক্ততায় ভরা।
মূলধন পূজনের এই তরী ডুবিবে বা কবে,
প্রতিক্ষণে এ দুনিয়া আছে বসি এ প্রতীক্ষা পরা।

(বালে জিবরীল ১৯–৩৬ ও ৪৩–৪৪ লাইন)

মোল্লা ও স্বর্গ

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

আমিও সেথায় ছিলাম, নারিনু বন্ধ রাখিতে মুখ,
খোদা থেকে যবে পেল হজরৎ মোল্লা স্বর্গবাস।
কহিলাম আমি, প্রভু হে, আমার কসুর করুন মাফ,
হূর ও শতরা ও পেয়ালার এতে খুশীর নাহিক আশ।
নহে ফিরদৌস লড়াইয়ের ঠাঁই, বাদানুবাদের থান,
তর্ক ভাষণ আল্লার ঐ বান্দার অভ্যাস।
জাতিতে জাতিতে বৈরী বিবাদ স্পষ্টই এঁর কাজ,
নাই মসজিদ গির্জা বা পীঠ জিন্নতে আশপাশ।

মুসোলিনী

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

চিন্তা বর্মে সফলতা কিবা বস্তু? বিপ্লবেতে মন।
চিন্তা কর্মে সফলতা কিবা বস্তু? জাতিতে যৌবন।
চিন্তা কর্মে সফলতা মাঝে গুহ্য জীবনের বাণী,
চিন্তা কর্মে সফলতা মাঝে দৃঢ় চুনির রতন।
ওহে রোম ওহে শ্রেষ্ঠ, বহুতর বদলিলে তুমি,
যা দেখিনু নাহি জানি স্বপ্ন কিংবা বাস্তব দর্শন।
স্থবিরের নয়েনেতে ঝলকায় জীবনের আলো,
বাসনার উত্তাপেতে প্রজ্বলিত তব যুব জন।
এই প্রেম এ উত্তাপ এই আশা এ অভিব্যঞ্জনা,
ফুলের দিনেতে ফুল নাহি থাকে লুকায়ে বদন।
প্রেমের সঙ্গীতে আজি পরিপূর্ণ খুশী তব হলে,
রবাবের তব ছিল রবাবীর এক প্রয়োজন?।
সে নজর কার যার হেন দান, হেন সফলতা?
সেই নর দৃষ্টি খর যেন সূর্য জ্যোতির মতন।

নেপোলিয়নের সমাধিতে

গুহ্য বাণী এই– ভাগ্য কর্মের জগৎ,
ব্যক্তিবীর্যে খোলে গুহ্য সৌভাগ্যের পথ।
উত্তুঙ্গ ব্যক্তির বীর্যে সিকন্দর অসি,
অল্‌ওয়ান্দ্‌ তাপেতে যার হল দ্রববৎ।
ব্যক্তি বীর্যে সর্বত্র তৈমুরি জোয়ার,
জোয়ারের মুখে ব্যর্থ উচ্চাবচ পথ।
সমর অঙ্গনে হাঁকো, 'আল্লাহ্‌ আকবর;
ব্যক্তির বীর্যেতে সৃষ্ট ঈশ্বরের মত।
কিন্তু অবসর মাত্র দু'এক ক্ষণের,
অপেক্ষিছে শেষে কৃষ্ণ কবর বৃহৎ।
"আমাদের শেষ ঘর নিঃশব্দ খামোশ,
সকল শব্দের সীমা অসীমের পথ।"

আজান

আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী

এক নিশীথে শুকতারকা সিতারাদের কইলো ডাকি;
তোমরা কেহ আদমজাতে জাগার হালে দেখছ নাকি?
মঙ্গল কয় শুকতারাকে ঃ কেউ বুঝে কি মোর বরাত?
এমন ছোট উপদ্রবে ঘুমই শুতে দিবস রাত?
শুক্র বলে ঃ বলার কথা অন্য কিছু নাই কি আর?
মোদের সাথে সম্পর্ক কি তুচ্ছ একটি রাতকানার?
পূর্ণ শশী কইলো শাসি ঃ জ্যোতিষ্ক সে মাটির বটে
তোমরা জ্বলো আঁধার রাতে তাহার সত্তা দিনেই রটে।
রাত্রি জাগার আনন্দ কি, জানই যদি, শুনবে ফের
সপ্ত ঋষির উচ্চে আসন রহস্যময় এই খাকের।
সুপ্ত আছে ইহার বুকে দীপ্ত এমন জ্যোতির ধারা
লুপ্ত হবে বিশ্ব ভুবন চল অচল গ্রহতারা।
হঠাৎ শুনি আজান ধ্বনি গর্জি ওঠে গগন ভেদি'
যে সুর ধ্বনি কাঁপিয়ে তোলে পর্বতেরই পাষাণ-হৃদি।

যমীন ও আসমান

আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী

হয়তো যারে বসন্তেরি অনুপ শোভা ভাবছ তুমি
পরের চোখে পুষ্পবিহীন শীতের সে যে উষর ভূমি।
অবস্থারি পরম্পরা পৃথক ধারা নিমেষ প্রতি,
পথিক ওগো, ভাবনা কেন? সমান যত লাভ ও ক্ষতি।
হয়তো যারে আপন ধরার আকাশ বলে ভাবছ তুমি,
তা অন্য কোন বিশ্বধরার সত্যিকারের মৃত্তি-ভূমি।

নবীন বিশ্ব

আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী

ভাগ্য-লিপি গুপ্ত না রয় হৃদয় যখন জীবন্ত,
সে নবীন ধরার চিত্র দেখে স্বপ্নে যখন ঘুমন্ত।
আযান-ধ্বনি জাগায় যবে স্বপ্ন নেশা যায় টুটে,
সৃষ্টি করে স্বপ্নে দেখা বিশ্ব-নবীন জীবন্ত।
নবীন ধরার তরুণ শোভা তাহার হাতের মৃত্তিকা,
তকবীর তারি নবীন ধরায় আত্মা-মহান জীবন্ত।

প্রেম ও কামনা

আবুল কালাম মুস্তফা

মরু–প্রান্তরে উষার দৃশ্য? অতি মনোরম চমৎকার,
সূর্য–উৎস–তাই থেকে ওঠে আলোক–নদীর লহর–ধার!
সীমাহীন রূপ উচ্ছ্বসি' ওঠে স্বভাব–নেকাব করিয়া ভেদ,
হৃদয়–নয়ন ভরে আনন্দে, রহে না দুঃখ, রহে না খেদ!
রাত্রিতে বুঝি বৃষ্টি হয়েছে; 'কোহেস্ নামে'র বুকের পর
বিদায়ী মেঘেরা পরাইয়া গেছে জাফ্‌রানী আর নীল চাদর।
বায়ু বিশুদ্ধ, শান্ত শীতল, ঢলিয়া পড়েছে খেজুর–শাখ,
'কাজেমা'র প্রতি বালুকণা পেল ময়ূরের মতো উজল পাখ!
উনানের পাশে ছাই পড়ে আছে, ছেঁড়া রশি পড়ে আছে হোথায়,
তাহলে হেথায় কতো না কাফেলা এল আর গেল, জানে খোদায়
এই তো তোমার ঠাঁই–হেন কালে আওয়াজ আসিল জিব্রীলের,
'ক্লান্ত পথিক, উতারো সামান, এখানেই আছে শান্তি ঢের!'

হায়'কারে কই, সখা মোর আবে–হায়াত হয়েছে 'এনকোহল',
সৃষ্টি পুরানো, কিন্তু আমার অনুভূতি নব বক্ষঃতল।
বুত্‌খানা মাঝে রুদ্ধ নিশাসে মূর্তিরা রয় প্রতীক্ষায়,
গজনবী ফের আসিবে কখন ভাঙ্গিতে তাদের অসির ঘায়।
আরবের বাণী তার মাঝে নেই আর্‌বী–আঁখির স্বপ্ন–ঘোর!
আজমী–মগজ ঢুকিয়ে দেয় না স্বপ্ন আপন, বন্ধ দোর!
দজলা ফোরাত কবরী পিয়াসী পরিতে মোমেন খুন–কুসুম,
কিন্তু হিজাজ কাফেলায় নেই হোসেনের সাড়া, সব নিঝুম!
বুদ্ধি, হৃদয় দৃষ্টির গুরু? প্রেম ছাড়া আর নয় কিছুই,
ধর্ম–কর্ম সকলি ব্যর্থ, প্রেম–পূজা তাই ধররে তুই।
যেই মহাবলে খলিল ঝাঁপিয়ে পড়লি অগ্নি–কুণ্ড মাঝ,
যেই মহাবলে হোসেন ত্যাজিল আপন জীবন, তখ্‌ত–তাজ!

যে বলে ভক্ত সঁপিল আপন শির শত্রুর অসির তল,
সে তো কিছু নয়, আর কিছু নয়, সে যে শুধু প্রেম, প্রেম কেবল
বিশ্বের বুকে দুর্জ্ঞেয় তুমি, দুর্লভ তুমি, নবী আমার,
গন্ধ এবং রঙের কাফেলা বেরিয়ে পড়েছে খোঁজে তোমার!
আলিম সবার নয়ন অন্ধ, আকাঙ্খা মৃত, মুর্দা লাশ,
সুফীদের হৃদি? তাদেরও নাহি তোমার পাবার জোর উছাস!
মোর গীতিকায় পাবে নিবে-যাওয়া আগুন-জাগানো দীপক রাগ,
আমার কাহিনী? খুঁজিছে কেবল, চলে-যাওয়াদের পায়ের দাগ!
প্রভাতী সমীর করে গো যেমন গুলাব-নেকাব উন্মোচন,-
তেমনি আমার কাব্য-পরশে মুমিন-হৃদির উদ্বোধন!
হৃদয়ে তাদের জাগিবে সাহস, শক্তি, বীর্য দুর্নিবার!
সবল বাজুতে জাগিবে কুয়ৎ দুশমনকুল চূর্ণিবার!
কলিজা এবং হৃদয়-শোণিত পান করে বাঁচে মোর গজল,
বীণা তন্ত্রীতে বীণা-বাদকের তপ্ত লোহিত রয় কেবল!
এ অধীর হৃদে করো না দ্বিধার অবসর তুমি তিলেক দান,
আরো কুঞ্চিত করে তোলো বধূ উজ্জ্বল এই অলকদাম!

লওহ তুমিই, তুমিই কলম, মহান তুমিই আল-কোরান,
তব অনন্ত গভীরে অসীম আসমানে বুদ্বুদ-সমান!
মাটির পৃথ্বী পেলো যে মহিমা, সে শুধু তোমার মহিমা-ফল,
তুচ্ছ এ বালুকণিকারে তুমি দিয়েছ দৃপ্ত উদয়াচল!
সন্‌জর আর সলীম তাঁদের গৌরব শুধু তোমার দান,
নগ্ন তোমার 'জামাল' করেছে জনীদ-বাজিদে জন্মদান!

সন্‌জার, সলীল, জনীদ এবং বায়েজিদ হযরতের আদর্শ স্থানীয় উম্মৎ ছিলেন।

তোমার পাবার 'কামনা' নামাজে বন্ধু যদি না হয় ইমাম,
কিয়াম, রুকু ও সিজদা ব্যর্থ, ব্যর্থ আমার মনস্কাম!
তোমারি দয়ায় বুদ্ধি ও প্রেম- উভয়েরি আশা হল পূরণ,
বুদ্ধি পেয়েছে বিরহের খোঁজ, প্রেম অধীরতা আর মিলন!
আকাশের রবি বাহির-বিশ্ব উজ্জ্বল করে, বন্ধু মোর!

কিন্তু ভিতর? তাই খোলো তব আলো-প্রাসাদের তোরণ-দোর!
নয়নে তোমার নগ্ন-মুক্ত আমার অতীত রাত্রিদিন,
কিন্তু জানিনি, তব প্রেম ছাড়া সব কিছু হেয়, তুচ্ছ, দীন!'

অনেক দিনের অভিজ্ঞতা সে বলে, দিল মোরে 'শোন্ রে শোন্
প্রেমের অর্থ মুস্তফা আর বুদ্ধি আবু লাহাবের মন!'
প্রেম–সাধনায় আছে দুই সিঁড়ি–মুর্শিদ আর প্রেমের জোর,
'ইশকে'র আদি, অন্ত–উভয়ই বিস্ময়কর নিরন্তর!
প্রেমের জগতে বিচ্ছেদ? সে তো মিলনের চেয়ে মূল্যবান,
মিলনে কামনা হয় গো শহীদ, বিরহে লভে সে শতেক প্রাণ!
যদিও বধূর দর্শন আশে চোখে মোর ছিল চির অধীর,
মিলনের কালে ভুলে গেল, মন বলিল, 'দেখ হে,' চোখ বধির!
মিলন করে গো প্রেমের 'কত্ল', বিরহ তাহারে দানে জীবন;
সিন্ধুর খোঁজে ছোট নদী ছোটে, মিলন লভিয়া লভে মরণ!

গজল

আল মুজাহিদী

এই নক্ষত্রপুঞ্জের আগে আরও পৃথিবী আছে,
প্রেমের অন্বীক্ষা আরও রয়ে গেছে
এই সংকীর্ণ জীবনে বসন্ত প্রাপ্য নয়,
এখানে সহস্র কারাভাঁ হেঁকে চলেছে।
পৃথিবীর রঙ তামাশায় বুঁদ হয়ে থেকো না যেন,
আরও উদ্যান আরও আবাসস্থল রয়ে গেছে।
একটি নীড় হারিয়েছো তো কী দুঃখ তোমার,
আরও দুঃখ-আকরের সন্ধান পাবে তুমি।
তুমি বাজ পাখি, ওড়াই তোমার ব্রত
তোমার সামনে আরও নভমণ্ডল পড়ে আছে।
তুমি দিনরাত উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে থেকো না
তোমার কাল আর কূলা আরও রয়ে গেছে।
বিগত দিনে এই মাহফিলে একা ছিলাম আমি
এখানে তো আমার মতো রহস্যবিদ আরও আছে। (মূল উর্দু থেকে তরজমা)

খোশহাল খানের ওসিয়ত

হাস্‌নাইন ইমতিয়াজ

মিল্লাতেরই একাত্মতায় গোত্র–সকল বিলীন হলে
আফগানীদের মর্যাদা মান তখন শুধুই বুলন্দ হবে।

সেই যুবকের জন্যে আমার প্রেম–অনুরাগ সমর্পিত–
নক্ষত্রেরও পুঞ্জে যারা আপন হাতে ফাঁস পরাবে।

শৌর্য–বীর্যে মুঘল থেকে কোন রূপেই হীন তো নয়
পাহাড়-গিরি-শৈলদেশের এই সাহসী বালক সবে।

বন্ধু! আমি তোমার কাছে মনের কথা বলছি, শোন ঃ
সেই সমাধি খোশাল খানের নিজের জন্যে পসন্দ হবে

যেখানটাতে শৈলবায়ু কভুও মুঘল অশ্বারোহীর
অশ্বখুরের ধূলির কণাও উড়াবে না হীন্ গরবে।

যরবে কলীম

ضرب کلیم

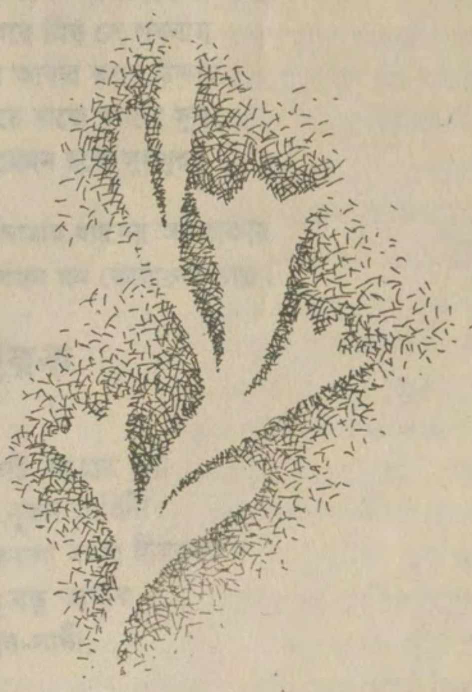

মরদে মুসলমান

গোলাম মোস্তফা

মুমিন যে—তার গৌরবেতে পূর্ণ প্রতিক্ষণ
কথায়-কাজে সে হ'ল ভাই খুদার নিদর্শন।
শৌর্য ক্ষমা পবিত্রতা- শ্রেষ্ঠত্বের জ্ঞান—
এ চার চিজেই তৈরী হ'ল মুমিন মুসলমান।
মাটির মানুষ সে, তবু তার হাম্‌ছায়া জিব্‌রিল্
বোখারা বা বদখ্‌শানে মজে না তার দিল্।
ভেদের কথা কেউ জানে না ঃ মুমিন মুসলমান
প্রকাশ্যে সে 'কারী'—কিন্তু আসলে কুর-আন্।
মুমিনের যা ইরাদা—তা খুদার ইরাদাই
দুনিয়াতে মিজান সে ভাই— কিয়ামতেও তাই।
লালাফুলের বুকের পরে স্নিগ্ধ সে শবনাম
সাগর-বুকে সেই সে আবার তরঙ্গ উদ্দাম।
বিশ্ববীণার তারে তারে বাজে তাহার সুর
'আর্-রহ্‌মান্' সুরা যেমন ছন্দে সুমধুর!

অনেক তারা আছে আমার ধ্যানের আলোকায়
বেছে নিও যেথায় যেমন মন তোমাদের চায়।

কয়লা ও হীরক

গোলাম মোস্তফা

এবার খুল্‌ব আর একটি সত্যের দ্বার
বল্‌ব তোমায় একটি নূতন কাহিনী।
খনির ভিতর থেকে কয়লা বলল হীরককে ঃ
ওগো চিরজ্যোতির্ময় বন্ধু আমার,
আমরা পরস্পর জীবন-সাথী,
আমাদের সত্তা এক;
একই উৎস-মূল থেকে বেরিয়েছি আমরা দু'জনে,

তবু আমি কাঁদি আমার নগন্যতার বেদনায়
আর তোমার স্থান হয় বাদশার মুকুটে!
অতি ঘৃণ্য আমি, মাটির চেয়েও কম মূল্য আমার!
অথচ তোমার জ্যোতিতে ফেটে যেতে চায় আর্শির বুক!
আমার কালো দেহ ক্ষণিক আলো দেয় আতশদানিকে
তারপর আমার সবটুকু যায় পুড়ে,
আর প্রত্যেক মানুষ তখন রাখে তার চরণ
আমার মস্তকে!
শুধু এক রাশি ভস্ম ঢেকে দেয় আমার খূদীকে।
আমার বদ্‌নসীব দেখে দুঃখ করতেই হয় সবাইকে!
বল্‌তে পার বন্ধু, আমার জীবনের সারবস্তু কী?
সে হ'ল একটা ধূম্রকুন্ডলী মাত্র–
তার পুঁজি হ'ল শুধু একটা আগুনের ফুল্‌কি!
কিন্তু স্বভাবে ও প্রকৃতিতে তুমি হ'লে তারকা তুল্য,
সবদিক থেকে ঠিক্‌রে পড়ে তোমার জ্যোতিঃ;
তখন তুমি হয়ে ওঠ বাদশার চোখের রোশ্‌নাই,
না হয় ত শোভা কর কারো তলোয়ারের বাঁট!
হীরক বল্‌লে ঃ
হে আমার আকল্‌মন্দ্‌ দোস্ত্‌,
কালো মাটিই যখন হয় কঠিন,
মর্যাদায় সে হয় তখন পাথর।
চারিপাশের সঙ্গে চলে তার সংগ্রাম।
সেই সংগ্রামের পরিপুষ্টি লাভ করে সে,
আর তাতেই হয়ে ওঠে সে কঠিন প্রস্তর।
এই পরিপক্কতাই ত দিল আমার আলোকের ঔজ্জ্বল্য
আর দীপ্তিতে ভরে দিল আমার অন্তর!
তোমার সত্তা হ'ল শিথিল,
তাই তুমি হ'লে লাঞ্ছিত-অবজ্ঞাত।
তোমার দেহ হ'ল কোমল,
তাই তুমি পুড়ে হ'য়ে যাও ছাই!

বু'আলী কলন্দর

ফররুখ আহমদ

মুহব্বতের কুঅতে যখন সত্তার পূর্ণতা
শক্তি তাহার মুষ্টিতে আনে সসাগরা ধরাতল,
তার কবজায় ঝলসিয়া ওঠে আল্লার দেওয়া বল
ধরা পড়ে তার মুঠিতে জলস্থল
ভাঙে রাত্রির নি'দ
নির্দেশ তার মেনে চলে ভরে দারিয়ুস জামশীদ।।

যাঁর কথা জানে সারা হিন্দুস্তান
জালালী ফকীর বু'আলী কলন্দর,
যাঁর পরশনে মরুভূমি হল জান্নাত সুন্দর,
নিয়ে এল ফের তাজা গোলাবের গান
তাঁর জামানার একটি কাহিনী শোনাবো অতঃপর
তামাম হিন্দে মশহুর যিনি—বু'আলী কলন্দর।

একদিন তাঁর সাগরিদ এক বাজারের পথে একা
চলেছিল নিয়ে সুপ্ত মনের নিবিড় চিন্তা লেখা।
বাদশার প্রিয় ওমরাহ্ তখন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে
চলেছিল, সাথে লশকর চলে তাঁর নির্দেশ বয়ে—
সমুখে যখন পড়িল তাদের ফকীর দিউয়ানা সেই
নকীব তখন ফুকারিয়া বলে ঃ এই
বেহুশ পথিক পথ ছেড়ে চলো আমীর ওমরাহের।
দুনিয়ার হাল ছিল না সে ফকীরের
আপনার ভাবে বিভোর হয়ে সে চলেছিল একমনে,
আমীরের এক উদ্ধত দাস গর্বিত সেই ক্ষণে
তীব্র আঘাত হানিলো তখন শিরে সেই ফকীরের।
আমীরের পথ ছাড়িয়া আহত ফকীর চলেন ফের।
জীর্ণ বস্ত্রে ক্ষতমস্তক বাঁধি
কলন্দরের জলসায় এসে ফকীর পড়িল কাঁদি।
গর্জি উঠিল নিমিষের মাঝে বু'আলী কলন্দর

গলিত লাভার বন্যা ভাসাল্যে প্রশান্ত কন্দর—
মিসমার করি' বজ্র যেমন পড়ে পর্বত চূড়ে
তেমনি আদেশ ধ্বনিয়া উঠিল কলন্দরের সুরে।
বলিল ঃ এখনি ফকীরের লিপি দাও শাহী দরবারে।
দরবেশী এই পত্র পাঠাও হিন্দের বাদশারে
"আমার খাদিমে মেরেছে তোমার আমীর অকস্মাৎ
ঢেলেছে সে তার জীবনে তীব্র জ্বলন্ত হুতাশন,
এখনি বন্দী করো তুমি সেই আমীর খবিস–মন,
নতুবা অন্য জনারে দানিব তোমার সুলতানাত।"
ফকীরের লিপি গেলে বাদশার কাছে
থর থর করি কাঁপিয়া উঠিল বাদশাহ বিষম ভয়ে,
সূর্য যেমন নিষ্প্রভ হয় রোশনি আসিলে ক্ষরে
বিবর্ণ হল বাদশাহ তেমনি ফকীরের লিপি পেয়ে।
হাতকড়া এক পাঠালো তখনি সেই বাদশাহ্র তরে
কলন্দরের কাছে মাফ চায় বাদশা বিষম ডরে।
বু'আলীর কাছে দূত হয়ে গেলো আমীর খসরু কবি
যার কাব্যের মাধুরী জাগাতো জ্যোছনা রাতের ছবি
যার সুরজাল জাগিত গভীর মৌলিক মন হতে
ভেসে যেত এই হিন্দের বুক সে সুর ধারার স্রোতে।
তার সঙ্গীতে বু'আলীর মন গলিয়া কাঁচের মতো
কাব্য–সূষমা রাখিল সেবার বাদশাহী অক্ষত।
পাহাড়ের মত সাম্রাজ্য সে তবু
বেঁচে গেল এক কাব্যের সরণীতে
আহত কোরো না ফকীরের দিল কভু
ফেলো না নিজেকে জ্বলন্ত বহ্নিতে।

জামানা

ফররুখ আহমদ

যা আছে এখন হবে না তো আর, ছিল যা কখনো
নাই নিশানা!
এ গোপন বাণী শুধু অনাগত নতুনের পথে
জাগে জামানা।
এ সুরাহি থেকে প্রতি ঘটনার কণিকা ছড়ায় সংগোপনে,
দিন-রজনীর এ তস্‌বী-দানা গণি আমি তাই
আপন মনে।।
সকলের সাথে আছে পরিচয়, তবু মোর প্রথা চির-নতুন,
কখনো সওয়ার, কখনো বাহন, করি যে আঘাতে সংশোধন।।
কার অপরাধ-মোর মহফিলে যদি নাহি চাও
মিলন-প্রীতি?
জানি না তো আমি রাতের শারাব ভোরে বিলানোর
আজব রীতি।।
বোঝে না কখনো জ্যোতিষীর আঁখি, বিনতি আমার
কোন ঠিকানা,
জানে না সে তার কোথায় শিকার, কোথায় যে তীর
নাই তো জানা।।
নয় রক্তিমা প্রতীচী গগনে রক্ত নদী ও লোহু স্রোতের!
আজ ও কালের কথা হল শেষ, করো প্রতীক্ষা নওরোজের।।
যার বিজ্ঞান এনে দিল ভালে বিশ্ব প্রকৃতি জয়ের টীকা,
নীড়ের শান্তি জ্বালালো যে তার চঞ্চল গতি
বিজ্‌লি-শিখা।।
মৌসুমী হাওয়া দরিয়া, কিশতী ওদেরি তো সব
রয়েছে জানা,
ফেরাতে কখনো পারবে কি তবু ভাগ্যলিপির
এই বাহানা।।
নতুন পৃথিবী জেগে ওঠে আজ, মৃত্যুমুখী এ
প্রাচীন ধরা
ফিরিঙ্গীদের চক্রে হয়েছে জুয়ার আড্ডা কলুষ-ভরা।।
এ ঝড়-তুফানে দীপ-শিখা তার রাখে প্রোজ্জ্বল
যে জন আজ
সেই দরবেশ-বান্দা খোদার পায় দৌলত শাহী মেজাজ।।

নমাজ

মনির উদ্দীন ইউসুফ

ছদ্মবেশ ধরি আসে বারে বারে আদমের কাছে,
লাৎ ও মনাৎ দেবী সযৌবনা প্রেম-পূজা আশে।
বোঝা তুমি ভাব যারে তেমন সিজ্‌দা শুধু এক,
হাজার প্রণতি হতে মুক্ত তব করিবে বিবেক।

হে মুহম্মদ (সাঃ)-এর আত্মা!

মনির উদ্দীন ইউসুফ

বিনষ্ট হয়েছে কবে মুসলিমের একতা-বন্ধন,
বল আজ মুসলমান কোন্ পথে করিবে গমন?
বেদনার স্বাদ আর নাহি মত্ত আরব সাগরে,
গোপন এ ঝঞ্ঝা মোর বল, যাবে কোন্ পথ ধরে?
কাফেলা ছাড়িয়ে গেছে, পাথেয় ফুরাল তাও হায়,
এখন এ মরু হতে হুদীখান বল, কোথা যায়?
সমস্যা এ সমাধান কর প্রিয় আত্মা রসূলের,
কোরান বুকেতে যার, কোথা আজ লক্ষ্য তাহাদের?

সমর্পণ ও নিয়তি

সৈয়দ আবদুল মান্নান

প্রতিটি শাখায় দেখ সমস্যার গূঢ় সমাধান—
আকাশে তুলিতে মাথা প্রতি তরু খুলে তার পাতা।
মাটির আধারে বন্দী থাকা তার মনোমত নয়,
প্রতিটি মুহূর্তে বীজ দেখ তাই বিকশিতে চায়।
প্রচেষ্টা করো না বন্ধ নিয়তির আশাপথ চেয়ে,
সমর্পণ ধর্ম জেনো, বাসনার অনন্ত ব্যঞ্জনা।
তোমার বিকাশ লাগি' দেখ মুক্ত গগন—প্রাঙ্গণ।
সংকীর্ণ নয় এ বিশ্ব, বন্ধু মোর, বিধাতা—সৃজন।

নিষিদ্ধ সঙ্গীত

আমার কথায় নেই সূফীদের আনন্দ ও জ্বালা,
আমার চিন্তায় নেই পাপ আর পুণ্যের নিদান।
আশা করি তবু নাহি তবে কোন কথার অমিল
শাস্ত্র—জ্ঞানী কিংবা কোন তত্ত্ববিদ সাথেঃ
যে গানে মিশিয়া আছে সংগোপন মৃত্যুর পয়গাম—
নিষিদ্ধ আমার কাছে—অনুষঙ্গ তার বীণাবেণু।

ইন্‌কিলাব

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

নয় এশিয়ায় নয় য়ুরোপে পূর্ণ হওয়ার লক্ষ প্রাণের,
রয়েছে এতে আত্মমৃত্যু ওতে আছে আত্মা-মরণ।
হৃদয় মাঝে টগবগিয়ে ইন্‌কিলাবের সৃষ্টি হল,
শেষের কাছে এল বুঝি এই দুনিয়া ঢের পুরাতন।

গণতন্ত্র

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

গুহ্য এ বাণী ফিরিঙ্গি এক করিয়া দিয়াছে ফাঁশ,
মর্ম ইহার প্রকাশে না কভু আছে যারা বুঝধরা ঃ
গণতন্ত্র সে শাসনের এক মূর্তি যাহার বলে
বান্দার দলে গোণা হয়, কভু ওজন হয় না করা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

হেথা ব্যাধি মূলে রয়েছে গোলামি অপরের পথে চলা,
হোথা ব্যাধিমূলে শাসনযন্ত্রে গণতন্ত্রের কলা।
পুবে পশ্চিমে এসবের থেকে কেহই মুক্ত নাই,
হিয়ার বেদনা দেখার বেদনা দুনিয়ার সব ঠাঁই।

পশ্চিমী রাষ্ট্র

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

ইয়া রব, তব সমানধর্মী বিলাইতি রাজপাট,
কিন্তু তাহার পূজারী যতেক আমীর লাট-বেলাট।
এক ইবলিস গড়েছিলে তুমি আগুনের থেকে, আর
মৃত্তিকা থেকে সে তো ইবলিস গড়ল দু'শ' হাজার।

কয়েকটি কবিতা
নূরুদ্দীন আহমদ

জ্ঞান ও প্রেম

জ্ঞান আমাকে বলিল, "প্রেম বাতুলতা মাত্র।"
প্রেম আমাকে বলিল,
"জ্ঞান অনুমান এবং ধারণা।"
"হে অনুমান এবং সংশয়ের দাস
গ্রন্থের কীট হইও না।"
প্রেম হচ্ছে আপাদ–মস্তক সান্নিধ্য
জ্ঞান আপাদ–মস্তক অবগুণ্ঠিত।

প্রেম দমনই হচ্ছে সৃষ্টির কোলাহল।
জ্ঞান হচ্ছে পরিচয়, প্রেম সত্তার লীলা
প্রেম শান্ত এবং স্থিত, প্রেম জীবন এবং মৃত্যু।
জ্ঞান হলো জিজ্ঞাসা,
প্রেম হচ্ছে গোপন সমাধান।

প্রেমের অলৌকিকত্ব হচ্ছে রাজত্ব,
নিরাসক্তি এবং ধর্ম;
প্রেমের দীনতম দাস মুকুট ও রাজ অঙ্গুরির অধিকারী।
প্রেম স্থান এবং অবস্থিতি, প্রেম কাল ও সৃষ্টি।

প্রেম আপাদ–মস্তক ধ্রুব বিশ্বাস
আর ধ্রুব বিশ্বাসই দ্বার উদঘাটনকারী।
প্রেম রাজ–পথে সুখ–বিশ্রাম অবৈধ,
তরঙ্গ বিক্ষোপ বৈধ, তীরের আনন্দ অবৈধ।
প্রেমে অশনি বৈধ, প্রেমে প্রাপ্তি অবৈধ।
জ্ঞান হচ্ছে পুঁথির সন্তান
প্রেম পুঁথির প্রসূতি।

নেতৃত্ব

জিজ্ঞাসা করেছে মোরে
নেতৃত্বের রহস্য কোথায়।
তোমাকেও দিক খোদা
সমতুল্য মূল-তত্ত্ব-জ্ঞান।
তোমার যুগের সেই
গীবৎকার ইমাম নিশ্চিত,
গড্ডালিকা থেকে তোমা
করে যেই বিমুখ বঞ্চিত।

দেখায়ে প্রেমের ছবি
মরণের নির্মল দর্পণে
আরো শংকা ডেকে আনে
সে ইমাম তোমার জীবনে।

বিঘ্ন-সচেতন করি
আনে রক্তে তপ্ত-স্রোতধার,
ফকিরী-শাণিত করি
করে তোমা তীক্ষ্ম তরবার।

মুসলিম সে জনে করে
শক্তি আর রাজস্ব-পূজারী,
শ্বেতাঙ্গ প্রভাব-দুষ্ট
যে নেতৃত্ব হবে অনাচারী।

মর্‌দ-ই-মুসলমান

মুমিনের প্রতি দণ্ড পল অপূর্ব অতুল,
বাক্য ও কর্মেতে তার আল্লাহর নিশ্চিত প্রমাণ,
শক্তি, ক্ষমা, পবিত্রতা, আর তার মাহাত্ম্য বিপুল;
এই গুণ চতুষ্টয় গড়ে তুলে খাঁটি মুসলমান।

মাটির মানুষ আর জিবরাইল পড়শী তাহার,
বোখারা আস্তানা নয়—মুমিনের নহে বদখ্‌শান
মুমিনের পরিচয়, এ রহস্য জানা আছে কার?
দৃশ্যতঃ সে 'কারী', কিন্তু মূলে সেই জীবন্ত কোরআন;
কুদরতের অভিব্যক্তি রূপায়িত তার অভিলাষ,
ধরাতে সে ভারসাম্য, আখেরাতে সেই তো মীজান!
সেই তো শিশির যাহা সিক্ত করে পুষ্পের হৃদয়,
সমুদ্র উত্তাল করে তোলে যাহা সিক্ত করে পুষ্পের হৃদয়,
সমুদ্র উত্তাল করে তোলে যাহা সেই তো তুফান,
প্রকৃতির সুরে তার গুঞ্জরিত দিবস নিচয়,
অপূর্ব সে সুরে তার মূর্ত হয় সুবা–ই–রহমান।।

দৃষ্টি

বসন্তের সমাগমে বাগিচার ফুলের কাফেলা,
উদ্দাম–জীবন–ধারা; আনন্দের–অপরূপ খেলা,
আঁধার রাতের বুকে তারকার ঝলমল আলো,
এ সমুদ্র আর ঐ নীলিমার অসীম বিস্তার,
ওই চাঁদ আর তার গতি–ধারা রাতের বেলায়,
সূর্যের উদয় আর দিবসের–স্থির–শান্ত গতি
বৃথা নহে, প্রকৃতির অফুরন্ত এ রূপ–সম্ভার,
গভীর দৃষ্টিতে আছে এ দৃশ্যের রূপ অনির্বাণ।

নারী

পৌরুষের অভিব্যক্তি মূর্ত হয় নিজ মহিমায়,
অপরের হাতে ঘটে নারীত্বের মহিমা বিকাশ।
ব্যথার রহস্য তার সঙ্গে গোপন সেই কামনায়,
সৃষ্টির 'দহন–স্বাদ' নারীত্বের চরম আভাস।
সে দহনে লভে মুক্তি জীবনের রহস্য গোপন,

জীবন ও মৃত্যুর লীলা মুখরিত সেই কোলাহলে।
নিপীড়িত নারীত্বের ব্যথা ক্ষুব্ধ আমারো এ মন,
কিন্তু এ' জটিল গ্রন্থি! সাধ্য নয় খোলা শক্তি-বলে।

শিশিরের প্রতি ফুল

হয়তো তুমি ভাবছো মনে সুদূর আমার দেশ,
আকাশ দূতি! নয়গো! আমার দেশ দূরে নয়!

ফুলের প্রতি শিশির

দূর কি নিকট—তখন তাহা বুঝবে পরিষ্কার
সুদূর আকাশ পাড়ি দেওয়ার সইবে যখন ক্লেশ!

শিশিরের প্রতি উষা

আমার মতো কোমল পায়ে আসবে গুলিস্তান!
নাজুক মোতি চূর্ণ না হও! আঘাত খেয়ে গায়—
পাহাড়, মরু সবার কোলে লুটাও আপন প্রাণ,
দূর—গগনের আঁচল যেন হাত থেকে না যায়।

এ যুগের মানুষ

প্রেম অস্তিত্বহীন তার মাঝে
আর বুদ্ধি করে তাকে দংশন
সর্পের মতো,
বুদ্ধিবৃত্তিকে আনতে পারেনি সে
সহজাত বৃত্তির বশে;
সফল হয়েছে সে সন্ধান করতে
তারকার চলাপথ,
তবু খুঁজে পায়নি সে তার পথ
আপন চিন্তার রাজ্যে;
এম্নি করে জড়িয়ে পড়েছে সে
তার বুদ্ধির ব্যূহে
বিচার করতে পারে না সে লাভ—লোকসানের।
গেরেফতার করেছে সে সূর্য—কিরণকে,
তবু পারেনি আলোময় করতে
তার জীবনের অন্ধকার রাত্রি।

আশার ঝিলিক

নেয়ামাল বাসির

সূর্য তার আলোক–ছটাকে সুসংবাদ জানিয়ে বলছে;
'অদ্ভুত' এই বিশ্ব, কখনো সকাল, কখনো সন্ধ্যে!
নভোমণ্ডলের বিস্তৃতিতে তুমি ছড়ায়ে রয়েছ
    এক যুগ ধরে,
যুগের কৃতজ্ঞতাও বেড়ে চলেছে অস্বাভাবিক ভাবে।
বালুকণায় ঝিলমিলিয়ে উঠেছে কতবার, তবু আরাম পাওনি,
শান্তি পাওনি ভোরের বাতাসের মতন গোলাপের
    পাপড়িতে বিচরণ করে।
অতএব কুঞ্জবন ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও মাঠ,
    দুর্গ–তোরণ অট্টালিকা,
আমার হৃদয়ের অগ্নিগর্ভে আত্মগোপন কর।

[দুই]

আকাশের উপত্যকায় সূর্যের কত আলোক–ছটা–
বিচ্ছিন্ন সূর্যের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের এ যেন কোলাকুলি।
বলছে 'পশ্চিম' কখনো পাবে না এ আলোক–ছটা,
কারণ, ফিরিঙ্গীদের মেশিনের ধোঁয়ায় সেখানের
    আকাশ আচ্ছন্ন।
'পূর্ব' যদিও দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা থেকে বঞ্চিত নয়,
কিন্তু তার তৌহীদের বিশ্বও তো কই মুখর নয়, মৌন।
হে সূর্য! আমাদের বিস্মৃত হয়ো না তুমি!
তোমার হৃদয়ের অগ্নিগর্ভে আমাদের লুকিয়ে নাও।।

[যরবে কলীম]

তিনটি কবিতা

আকাশ আর মাটি

হয়তো অপরের দৃষ্টিতে সেটাই শীতের মরসুম
তোমার দৃষ্টিতে যেটা বসন্ত।
পরিস্থিতির বিবর্তন সদাই বিপরীতমুখী–
অতএব, হে পথিকৃৎ, লাভ–লোকসানের
    চিন্তা করো না!

তুমি যেটাকে ভেবেছ এই পৃথিবীর আকাশ
আসলে সেটাই হয়তো অন্য পৃথিবীর মাটি।

কোন সুফী চিন্তানায়ককে

তোমার দৃষ্টিশক্তি অলৌকিক বিশ্বেই সীমাবদ্ধ
আর ঘটনা–দুর্ঘটনার বিশ্বকে নিয়েই আমার
গতিশীলতা।
কাল্পনিকতার বিশ্বটা আজ অবশ্য নিঃস্ব,
কিন্তু জীবন আর মৃত্যুর বিশ্বটা নিঃস্বতর।
তোমার দৃষ্টিতে তার পরিবর্তন ঘটতে পারে, আশ্চর্য নয়।
কারণ, সম্ভাব্যতার বিশ্ব তোমার আজও হাতছানি দেয়।

আলো ছিটকায় আজকে আবার পর্বতে প্রান্তরেঃ
আজকে আবার সুর–গীতিকার নতুন উদ্বোধন;
আজকে আবার ফুলের রাজ্যে আমার নিমন্ত্রণ।
সুরভি ফুলের? নাকি ওগুলো বনপরীদের সারি?
ঐ যে পরেছে যারা সুরঙিন সুনীল পীতাভ সাড়ী?

ভোরের বাতাস শিশির বিন্দু দিয়েছে ফুলের 'পরে,
সূরুজ দিয়েছে মুক্তামালার রশ্মি সোহাগ ভরে।
অপরের মন খুঁজে পেতে চাও জীবনের সন্ধানে
আগে ফিরে যাও আপনার মনে
পরে আর কোনখানে?
চাওয়া ও পাওয়ার নেশায় দীপ্ত মনের পৃথিবীখানা,
দেহের পৃথিবী প্রবঞ্চনার গ্লানিতে বেঁধেছে দানা।
মনের চিত্ত আসে যদি হাতে পায় না কখনো ফিরে,
দেহের চিত্ত ছায়ার মতন, আসে যায় চলে ধীরে।
মনের জগতে ফিরিঙ্গীদের দেখি না অনুশাসন,
মনের জগতে পাই না আমরা সৈয়দ বা ব্রাহ্মণ।

যরবে কলীম
ফারুক মাহমুদ

গণতন্ত্র

যদিও এসব গোপন বারতা বলবে না কোন দানেশমন্দ্,
ফিরিঙ্গী এক বে-খেয়ালভাবে ফাঁস করে দেয় অকস্মাৎঃ
গণতন্ত্র কি জানতে পেরেছো? এক ধরনের সে হুকুমত্,
মানুষের সেথা শুধু গোণা হয়, হয় না ভুলেও করা ওজন।

ইসলাম

ইসলামের রুহ্ হলো অগ্নি আর আলোক খুদীর;
আর সে খুদীর অগ্নি অস্তিত্ব ও আলো জিন্দেগীর।
যদিও প্রকৃতি আজো রেখেছে গোপন এ-বারতা,
তবুও এটাই সব বস্তুর আদি ও ইতিকথা।
ইউরোপ বিরক্ত হলে হোক শুনে ইসলামের নাম,
সংকটে স্ব-নির্ভতা, এই তো সে রুহুর পয়গাম।

আসমান ও জমিন

তুমি যাকে মনে করো মধুগন্ধা বাসন্তী প্রহর,
অন্যের দৃষ্টিতে সেটা হতে পারে ভাদ্রের দুপুর।
সর্বত্রই পরিপার্শ্বে মূর্ত পরিবর্তনের সুর;
কি ফায়দা, হে সালেক, ভালোমন্দ ভেবে' অতঃপর!
তুমি যাকে মনে করো নীলিম খিলান আকাশের;
জমিন তা' হতে পারে অন্য কারো দুনিয়াতে ফের!

তকদীর

অপদার্থ ব্যক্তিরাও অধিকারী হয় শক্তি আর ক্ষমতার,
এবং প্রতিভাবান গুণীরাও মাঝে মাঝে বে-ইজ্জত হন;
তবুও এদের মাঝে হয়তো রয়েছে কোন যুক্তি ক্ষুরধার।
যদিও বা মনে হয়, তক্দীর মানে না কোন যুক্তির বন্ধন!
পৃথিবীতে মানুষের উত্থান ও পতনের দীর্ঘ ইতিকথা
আমাদের দৃষ্টি হতে এই সত্য কথাটি তো রাখেনি গোপন,
কর্মধারা পানে সব কওমের-
নিয়ে তন্দ্রাহীন সতর্কতা-
তক্দীর তাকিয়ে আছে সূতীক্ষ্ম দু' ধারী মুক্ত
অসিরমতন।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ

আবদুল মান্নান তালিব

খুদীর গোপন রহস্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ
খুদী তরবারি শানপ্রস্তর তার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
এ যুগ সন্ধানে ফেরে তার ইবরাহীমের
সারাটা দুনিয়া হলো বুতখানা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
সওদা করেছো তুমি আত্ম-অহংকারের
লাভ-ক্ষতির প্রবঞ্চনা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ
পার্থিব ধন-সম্পদ এই সম্পর্ক আত্মীয়তা
সন্দেহ-সংশয়ের বুত এরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
স্থান-কালের উপবীত হয়েছে প্রজ্ঞা
অথচ স্থান-কাল অস্তিত্বহীন, লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ।
গুল্ ও লালা'র ঋতুর মুখাপেক্ষী নয় এ গীত
শীত ও বসন্ত সবেতেই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
জামাতের আস্তিনে যদিও মূর্তি সংগোপনে
রয়েছে লুকিয়ে
প্রচারের নির্দেশ তবু আমার প্রতি
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

ইজতিহাদ

আবদুল মান্নান তালিব

হিন্দের এ বুত্খানায়
কে শিখবে কোথায় থেকে দীনের হিক্মত?
কর্ম প্রবণতার আনন্দ-স্বাদ নেই কোথাও
নেই চিন্তার গভীরতা।
আকাঙক্ষার আবর্তনে কোথায় সে চিন্তার সাহস,

আহা পরাধীনতা, পরানুসৃতি ও সন্ধানী দৃষ্টির পতন!
নিজেরা পরিবর্তিত হয় না
কুরআনের পরিবর্তন করে চলে
হরমের ফকীহরা দেখো এ কেমন ক্ষমতাবিহীন।
ত্রুটিপূর্ণ আল্লাহর কিতাব বলে এ গোলামের দল
কেননা এতে শেখানো হয়নি মুমিনকে
গোলামীর কলাকৌশল।

জিহাদ

আবদুল মান্নান তালিব

ফতোয়া দিলেন শায়খ
কলমের যুগ এটা,
পৃথিবীতে আর কার্যকর নয়
অস্ত্রের তীক্ষ্নতা।
কিন্তু একথা অপরিজ্ঞাত কি শায়খের কাছে
মসজিদে এ বক্তব্য আজ প্রভাবহীন নিষ্ফল ?
মুসলমানের হাতে আজ কোথায়
বন্দুক ও তরবারি
আর থাকলেও
হৃদয় তার মৃত্যুর স্বাদ বঞ্চিত।
হৃৎপিন্ডের কেঁপে ওঠে যার কাফেরী মৃত্যুতে
কে বলবে তাকে ঃ মুমিনের মৃত্যুবরণ করো?
জিহাদ ত্যাগের বাণীতে দীক্ষিত করো তাকে
যার রক্ত লোলুপ নখরের ভয়ে
আতংকিত সারা দুনিয়া।
বাতিলের শান-শওকত রক্ষায় উদ্যোগী ইউরোপ
আপাদমস্তক সজ্জিত যুদ্ধাস্ত্রে,

আমার প্রশ্ন তাই
গীর্জাভক্ত শায়খের কাছে-
প্রাচ্যে যে যুদ্ধ হারাম
তা কি হারাম হয়েছে প্রতীচ্যেও?
সত্যের প্রতিষ্ঠা কাম্য হলে? কেমনতর কথা-
ইসলামের সমালোচনা আর
ইউরোপকে ছাড় দেওয়া ?

অহী

আবদুল মান্নান তালিব

বিত্তহীন নিঃস্ব বুদ্ধির নেতৃত্বের যোগ্যতা নেই
আন্দাজ-অনুমানের নেতৃত্বে বিপর্যস্ত জীবনের কর্মসূচি,
আলোকশূন্য চিন্তা তোমার
আর ভিত্তিহীন কর্মানুরাগ
জীবনের অন্ধকার রাত রওশন হবে-একথা কঠিনতর,
সৎ ও অসৎ কাজের গ্রন্থী খুলবে কেমন করে
যদি জীবন নিজেই না হয় জীবন রহস্যের ব্যাখ্যা !

কবর

আবদুল মান্নান তালিব

মৃত্তিকার নিচে তবুও , কলন্দর নেই সুখে
আকাশের স্তব্ধতা শুধু যদিও সমাধির বুকে
কবরের বিছানাটিও উপযোগী নয় তার
অবাধ মুক্তি নেই আকাশের বিপুল বিস্তার ।

তওহীদ তত্ত্ব

আবদুল মান্নান তালিব

কথায় প্রকাশ করা যায় তওহীদের গভীর তত্ত্ব
কিন্তু তোমার মগজে থাকে যদি মূর্তিমন্দির
তাহলে বলার কিছু নেই।
যে প্রেমাগ্নির রহস্য সমাহিত লা-ইলাহার বুকে
শায়খ্ যদি ফকীহদের পথাশ্রয়ী হয়
তাহলে বলার কিছু নেই।
যে আনন্দ উজ্জীবিত হক ও বাতিলের সংঘাতে
যুদ্ধ ও আঘাতের সাথে থাকে যদি অপরিচিত
তাহলে বলার কিছু নেই।
পৃথিবীতে আজাদ বান্দার দেখার আছে বহু
কিন্তু গোলামীর দৃষ্টি যদি লাভ করো তুমি
তাহলে বলার কিছু নেই।
ফকিরী বুলন্দ কতো বাদশাহী থেকে
কিন্তু কারোর প্রকৃতি যদি ভিক্ষাবৃত্তি হয়
তাহলে বলার কিছু নেই।

ইলহাম ও আজাদী

আবদুল মান্নান তালিব

স্বাধীন মানুষ যদি ইল্‌হাম লাভ করে
দৃষ্টি তার চালক হয় চিন্তা ও কর্মের,
উষ্ণ প্রশ্বাসের প্রভাবে তার
বাগিচার মৃত্তিকা হয় অগ্নিময়।
শাহীনের প্রকৃতি লাভ করে বুলবুল
কী মহাবিপ্লব আসে প্রভাত পাখির জীবনে !

আত্মসচেতন খোদাপ্রেমী সে মানুষের সংসর্গ
ভিখারীকেও দান করে
জামশেদ ও পারভেজের গরীমা।
পরাধীন মানুষের ইলহাম থেকে
বাঁচাও হে খোদা বিশ্ববাসীকে
চেংগীজের মতোই সে ধ্বংস করে সকল জাতিকে।

মক্কা ও জেনেভা

আবদুল মান্নান তালিব

এ যুগে জাতিদের সম্পর্কের বহু প্রচলন
মানুষের একক সত্তা তবু আজো দৃষ্টির অগোচরে।
জাতিদের অনৈক্যই পশ্চিমী হিকমতের লক্ষ্য
ইসলামের লক্ষ্য শুধু একসূত্রে গ্রথিত মানবতা।

পয়গাম শুনালো মক্কা জেনেভার মৃত্তিকারে
জাতিপুঞ্জের প্রয়োজন আজ অথবা মানব সংঘের?

মৃত্যু

আবদুল মান্নান তালিব

কবরেও সে অদৃশ্য ও দৃশ্যমান
জীবিত যে হৃদয় অস্থির সততই,
চন্দ্র ও সিতারা যতো
ক্ষণস্থায়ী স্ফুলিংগের মতো
খুদীর শরাবে তৃপ্তির অন্ত নেই।

মৃত্যুর ফেরেশতা যদিও স্পর্শ করে শরীর তোমার
তোমার অস্তিত্বের কেন্দ্র থেকে বহুদূরে অবস্থান তার।

রাষ্ট্র

আবদুল মান্নান তালিব

যদিও মুরীদান মেনে নেয় হক কথা
তিক্ত লাগে আলেম ও শায়খের কাছে ফকীরের বাণী।
নিস্তেজ হয় জাতির কর্মস্পৃহা তখন
বিতর্ক শুরু হয় যখন 'যাত' ও 'সিফাতের' দর্শনের।
যদিও প্রাচীন দেউলের এ নীতি প্রাচীনতর
স্থায়ী নয় পানশালা, পানপাত্র, সাকী এরা কেউ
তবুও শরাবের অধিকার একমাত্র সে জাতির
তিক্ত পানি যার যুবকদের কাছে হয় মধু সদৃশ।

ছাত্র

আবদুল মান্নান তালিব

আল্লাহ তোমাকে পরিচিত করুক
কোনো তুফানের সাথে,
আলোড়ন নেই কেননা তোমার
সাগর তরংগে।
গ্রন্থ পাঠ শেষ করা আর সম্ভব নয়
তোমার জন্য
গ্রন্থ পাঠক তুমি হে নিছক
নও যে গ্রন্থকার।

পরীক্ষা

আবদুল মান্নান তালিব

বললো পাহাড় নদী পাথর খন্ডকে ?
মৃত্তিকায় পরিত্যক্ত তুমি, পরিণতি ধ্বংস তোমার,

নিয়ত ধ্বংসের ব্যথায় ব্যথিত তোমার অংগ,
শ্রেষ্ঠত্ব দেখো চেয়ে মহানদী মুখাপেক্ষী আমার।

এখনো তোমার আঘাত পায়নি
পৃথিবীর কোনো প্রাচীর গাত্র
জানলো না তাই মানুষেরা কেউ
পাথর তুমি বা কাঁচের পাত্র।

শিক্ষক

আবদুল মান্নান তালিব

মুক্তো গড়ার উদ্দেশ্য থাকে যদি
বৃথা ও স্থানচ্যুত সূর্যের ছায়া!
চিরাচরিত প্রথার জালে বাঁধা এ পৃথিবী
শিক্ষায়তন ও শিক্ষকের প্রচেষ্টা সব কিছু ?
সমকালের ইমামতির যোগ্য হলো যারা
সে বলিষ্ঠ মস্তিষ্ক তার যুগের অনুগামী।

দীন ও শিক্ষা

আবদুল মান্নান তালিব

জানি আমি
হরমের পীরদের তরংগিত ভ্রূ ভঙ্গি,
আন্তরিকতাহীন দৃষ্টির দাবি
প্রতারণা ছাড়া নয় কিছু।
এবং এ গীর্জাবাসীদের শিক্ষাব্যবস্থা
ষড়যন্ত্র দীন ও মানবতার বিরুদ্ধে।
যে জাতি ইনসাফ করেনি
তার খুদীর সাথে

ভাগ্যে তার নির্ধারিত গোলামী ও মজলুমী।
ব্যক্তিকে ক্ষমা করা প্রকৃতির নীতি বিরুদ্ধ নয়
কিন্তু কখনো করেনি সে মিল্লাতের গুনাহ মাফ।

ফিরিংগী পুরুষ

আবদুল মান্নান তালিব

বিজ্ঞজনেরা সমাধান করলো এ সমস্যা সহস্রবার
কিন্তু এ নারী সমস্যা যেখানেই ছিল আছে সেখানেই।
এ অনিষ্টকারীতায় নারীর অপরাধ নেই
তার শিষ্টাচারের সাক্ষবহ চন্দ্র ও সপ্ত তারকা।
বিপর্যয়ের প্রকাশ হলো ফিরিংগী সামাজিকতায়
কেননা সরল পুরুষ তারা, নারী মানসের সাথে নেই পরিচয়।

একটি প্রশ্ন

আবদুল মান্নান তালিব

কে জিজ্ঞেস করবে ইউরোপের দার্শনিককে
গ্রীস ও হিন্দুস্তান দলভুক্ত যার ঃ
পুরুষ নিষ্কর্মা আর নারীর হৃদয় শূন্য
এই কি পূর্ণতা! সমাজ সভ্যতার?

পরদা

আবদুল মান্নান তালিব

উর্ধ্ব গগন বহু রং বদলালো।
এ দুনিয়া হে খোদা সেখানেই আছে যেখানে ছিলো।

নর ও নারীর মাঝে প্রভেদ দেখিনি
সেও নির্জনবাসী এও নির্জনবাসিনী।
এখনো পর্দায় ঢাকা আদমের আউলাদ
কারোর খুদীর প্রকাশ হয়নি অবাধ।

একান্তে
মহফিলের কামনা অপদস্থ করলো এ জামানাকে
দৃষ্টি উজ্জ্বল হলেও হৃদয় মুকুর ধূলিম্লান।
দর্শনেচ্ছা যখন ছাড়িয়ে যায় সীমা।
চিন্তাজাল হয় বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ততর।
ঝিনুকের বুকে প্রবেশের সৌভাগ্য হয়নি যার
সে বারিবিন্দু কখনো পরিণত হয় না মোতিতে।
একান্তে আত্মবিশ্লেষণ করে খুদী কিন্তু
নির্জনতা নেই আজ মসজিদে মন্দিরে কোথাও।

নারী
নারীর অস্তিত্বেই রঙীন বিশ্ব জাহানের ছবি
তারি সুরে উত্তপ্ত জীবনের হৃৎপিন্ড
তার এক মুঠো মাটি সম্মানিত সপ্তর্ষির চেয়েও
কেননা সব সম্মান ঐ সিন্দুকের মূল্যবান মোতির।

প্লেটোর থিওরী লেখার সামর্থ হয়নি তার এ কথা ঠিক
কিন্তু তারি অগ্নিশিখায় জন্ম নিল প্লেটোর স্ফুলিংগ।

নারী স্বাধীনতা
এ বির্তকের সুরাহা নেই আমার কাছে তবুও
নিশ্চিত আমি ঃ এটি বিষ ওটি মধু,
প্রয়োজন কি মন্তব্যে, আমি হই আরো বিরাগভাজন,
সভ্যতার বরপুত্ররা ইতিপূর্বেই বিক্ষুব্ধ আমার প্রতি,

নারীর অন্তরদৃষ্টিই এ রহস্য ভেদ করুক
অক্ষম বিজ্ঞজনেরা, নিশেষ তাদের শক্তি।

মূল্যমান ও সৌন্দর্যের নিরিখে গুরুত্ব বেশি কার
নারী স্বাধীনতার অথবা মুক্তামালার ?

নারীর সংরক্ষণ

আবদুল মান্নান তালিব

একটি জীবিত সত্য নিহিত আমার বুকে,
যার শিরায় প্রবহমান শীতল রক্ত সে
তা বুঝবে কেমন করে!
পরদা অথবা শিক্ষা
নতুন হোক বা পুরাতন
অক্ষম সবাই,
নারিত্বের সংরক্ষণ ও লালন
সম্ভব একমাত্র পুরুষের হাতেই।

যে জাতি পায়নি এ জীবন্ত সত্যের সন্ধান
তার সূর্য শিখা ম্লান হয়ে যাবে অচিরেই।

নারী ও শিক্ষা

আবদুল মান্নান তালিব

ফিরিংগী সভ্যতায় জাতির মৃত্যু যদি হয়,
তা ফলে মৃত্যু হয় মানুষেরও।

যে শিক্ষার প্রভাবে নারী তার নারিত্ব হারায়
মৃত্যু বলে তাকে প্রাজ্ঞ মানুষেরা

নারী শিক্ষায়তন যদি দীন থেকে দূরে থাকে
শিল্প ও শিক্ষা মৃত্যুর পয়গাম আনে প্রেম ও প্রীতির জন্য।

নারী সত্তা

আবদুল মান্নান তালিব

পুরুষ-সত্তার বিকাশ ঘটে অন্যের সাহায্য ছাড়া
নারীর সত্তা উন্মুক্ত হয় অন্যের হাতে।
এ প্রেম কথাই রহস্য তার দুঃখ-উত্তাপের
সৃষ্টি সুখের উল্লাসে তার অস্তিত্ব হয় অগ্নিময়।

জীবনতত্ত্ব উন্মুক্ত হয় এ অগ্নিতেই
এ অগ্নিতে উত্তপ্ত অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের প্রাণ।
নারীর মজলুমী দেখে শোকাহত আমারও হৃদয়
কিন্তু এ জটিল গ্রন্থী উন্মোচন সম্ভব নয়।

ধর্ম ও শিল্প

আবদুল মান্নান তালিব

কাব্য, সংগীত ও রাজনীতি, বিদ্যা, ধর্ম ও শিল্প
গ্রথিত সবাই তারা একটি মোতির মালায়,
মাটির মানুষের দিলে তাদের প্রকাশ
আকাশ ছাড়িয়ে গেছে সিতারার জাহান।

খুদীর সংরক্ষণ জীবনের স্রোতস্বিনী যেন
অন্যথায় মৃত্যুর শীতলতা তথা নিষ্করুণ কাহিনী,
জাতিরা লাঞ্ছিত সেদিন আকাশের গভীর প্রচ্ছায়
ধর্ম ও সাহিত্য যেদিন বিচ্ছিন্ন হলো খুদী থেকে।

সাহিত্য

আবদুল মান্নান তালিব

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অনুসৃতিই এখন প্রেমের কাজ
প্রেমিকার গলিতে ঢুকে ইজ্জত হারানোর প্রয়োজন নেই
পুরাতন দেহ-পিঞ্জির নতুন প্রাণ সঞ্চার করো
অথবা পুরাতন প্রাণকে অন্ধ অনুসৃতির
বাঁধনমুক্ত করো।

থিয়েটার

আবদুল মান্নান তালিব

খুদীর বদৌলতে উজ্জ্বল তোমার অস্তিত্বের পরিসর
জীবন কাকে বলে? তারি আনন্দ, উত্তাপ, স্থায়িত্ব।
মর্যাদা উচ্চ তার চন্দ্র ও সপ্তর্ষির চেয়ে
তারি আলোকে সৃষ্টি তোমার সত্তা ও গুণরাজি।
পরিসর তোমার, আর তার বুকে খুদী হবে অন্য কারো,

পুনরবার উজ্জীবিত করো না লাত ও মানাতের ব্যবসায়?
তোমার অস্তিত্ব না থাক, এই তো অভিনয়ের পূর্ণতা,
না থাকলে তুমি, থাকবে না খুদীর উত্তাপ ও জীবন রাগিনী।

শিল্পীদের প্রতি

আবদুল মান্নান তালিব

সূর্য-চন্দ্র-বৃহস্পতি কয়েক মুহূর্তের ঔজ্জ্বল্য তাদের
তোমার খুদীর অস্তিত্ব চিরন্তন প্রেমের বদৌলতে।
তোমার হরমের হৃদয়ে লাল-কালোর বিভেদ নেই
লাল, শাদা আর নীলের বিভেদ তোমার কলংক তাই।
তোমার খুদীর অনুপস্থিতি চিন্তা ও স্মরণের সংগ্রাম
তোমার খুদীর উপস্থিতি কবিতা ও সুরের জগত।
তোমার আত্মা যদি দাসত্ব দুঃখে পীড়িত হয়ে থাকে
তাহলে শিল্পের জাহানও তোমার
মন্দির প্রদক্ষিণ ও সিজ্‌দার সমাবেশ।
আর যদি রাখো তুমি নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি।
তাহলে তোমার সিপাহী মানুষ আর জিন
আর তুমি সিপাহ্‌সালার। (যরবে কলীম)

সংগীত

আবদুল মান্নান তালিব

বাঁশীর শব্দে কোথা হতে এলো সুরার মাদকতা
সুর শিল্পীর হৃদয়ে উৎপত্তি বা বংশ দণ্ডে?
হৃদয় কি? কোথা হতে আসে তার শক্তি ও মত্ততা?
একটি দৃষ্টি তার কেন উল্‌টায়
কায়খস্‌রুর সিংহাসন?
কেন তার জীবন থেকে সঞ্জীবিত জাতির জীবন?
কেন তার অবস্থার পরিবর্তন ঘন ঘন?
কি কারণে হৃদয়বান মানুষের দৃষ্টিতে
উৎরোয় না সিরিয়া, রোম ও 'রাই'য়ের সাম্রাজ্য?
হৃদয়-সংগীত রহস্য বুঝবে যেদিন গায়ক
শিল্পের সব পর্যায় অতিক্রান্ত সেই দিন জেনো।

শিল্পের সৃষ্টি

আবদুল মান্নান তালিব

শিল্পীদের সৃষ্টিগুলি জান্নাতুল ফিরদাউসের সমতুল্য,
উন্মুক্ত হলো অস্তিত্বের গোপন ভান্ডারের আবরণ।
খুদী নেই
আর নেই সকাল-সন্ধ্যার আবর্তন সে জাহাঁয়,
সে জীবনে
প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি।
আহা! হতভাগ্য কাফের সে,
বুতগুলো তার অতীত যুগের ভাঙা লাত-মানাত।
তুমি লাশ !
তোমার জানাযার ইমাম এ শিল্প সম্ভার
মুরদারের শয়নগৃহে যে দেখে
জীবনের আলামত।

চারুকলা

আবদুল মান্নান তালিব

হে চক্ষুষ্মান,
দৃষ্টির রুচি ভাল কিন্তু
বস্তুর আসলত্ব দেখে না যে
সে দৃষ্টি কেমন আবার!
শিল্পের উদ্দেশ্য হলো
চিরন্তন জীবনের উষ্ণতা,
দু-এক মুহূর্তের স্ফুলিংগের স্থান
এখানে কোথায়?
সমুদ্রের হৃদয় যাতে হিল্লোলিত না হয়

হে বারি বিন্দু,
কেমন সে ঝিনুক আর মোতি!
কবির কণ্ঠ হোক
অথবা গায়কের প্রশ্বাস
বাগিচা শুকিয়ে যায় যাতে
কেমন সে প্রভাত সমীরণ!
দুনিয়ায় জাতির উদ্ভব হয়নি
অলৌকিকতা ছাড়া
'কলীমুল্লাহর' আঘাত নেই যাতে
সে শিল্প কেমন আবার!

হালাল সংগীত

আবদুল মান্নান তালিব

গায়কের সুরধ্বনিতে হৃদয় উন্মুক্ত হয় যদিও
কিন্তু জীবিত ও চিরঞ্জীব না হলে
হৃদয়ের উন্মোচনই বা কি!
আকাশের বুকে এখানে প্রচ্ছন্ন সে সুর
যার উত্তাপে গলে যায় নক্ষত্রের দেহ,
যার প্রভাবে দুঃখ-ভীতি শূন্য মানুষের প্রাণ,
আর আয়াযের মর্যাদা হতে জন্ম নেয়
মাহমুদের মর্যাদা,
চন্দ্র ও নক্ষত্রের এ বিস্ময়কর জাহান বিলুপ্ত হোক
থাকো শুধু তুমি ও তোমার 'লা-মওজুদা' ধ্বনি!
খুদীর ফকীহরা যে সংগীতকে হালাল মনে করে
সে সংগীত এখনো প্রতীক্ষারত
কোনো বাদ্যযন্ত্রের।

হারাম সংগীত

আবদুল মান্নান তালিব

আমার যিকিরে নেই সূফীদের উত্তাপ-আনন্দ
আমার চিন্তা নয় শান্তি-পুরস্কারের মাপকাঠি।
আল্লাহ করুন, আমার সাথে একমত হয় যেন

হাদীস ও কুরআনের তত্ত্বজ্ঞানী ফকীহবৃন্দ।

সংগীতের বুকে যদি প্রচ্ছন্ন থাকে মৃত্যুর বাণী
আমার দৃষ্টিতে হারাম বাদ্যযন্ত্র, সংগীত সব।

কবি

আবদুল মান্নান তালিব

প্রাচ্যের কাব্য জগতে কবিতা প্রশ্বাসের মুখাপেক্ষী,
হে কবি, তোমার বুকে প্রশ্বাস আছে কিনা (সন্দেহ হয়)!
দাসত্বের প্রভাবে খুদী যার নরোম হলো
সে জাতির পক্ষে ভালো নয় অনারব সুর।
কাঁচের সুরাহী হোক অথবা মাটির পানপাত্র
তরবারির মতো ক্ষুরধার হোক সুরা তোমার।
আকাশের তলে এমন কোনো পৃথিবী কোথাও নেই
বিনা সংগ্রামে শাসন দন্ড যার আসে হাতের মুঠোয়।
প্রতি মুহূর্তে নয়া তূর পাহাড়, নতুন আলোক স্ফূরণ
হে আল্লাহ, প্রেমের পর্যায় অতিক্রান্ত না হয় যেন!

অনারব কবিতা

আবদুল মান্নান তালিব

অনারব কবিতা আনন্দদায়ী হৃদয়গ্রাহী হলেও
এ কবিতায় তীক্ষ্মধার হয় না খুদীর তরবারি।

যার সুরে শুকিয়ে যায় বাগিচার পুষ্প-পল্লব
সে প্রভাত পাখির নিরবতাই বেহতের জানি।
যে আঘাতে পারভেজের সাম্রাজ্য প্রকম্পিত নয়
সে আঘাতে পাহাড় বিদীর্ণ হলেও লাভ নেই তাতে।
ইকবাল, পাথর কাটার যুগ বলে জেনো একে!
যে সব কাঁচ দ্রব্য দেখানো হয় পরিহার করো।

সংগীত

আবদুল মান্নান তালিব

সে সংগীত গজল গায়কের
হিমশীতল রক্তের প্রমাণ
যা শুনে তোমার চেহারা ঝল্সে ওঠে না।
যে গায়কের হৃদয় পবিত্র নয়
গান তার বিষময় করে প্রশ্বাস তরংগকে।
পূর্ব ও পশ্চিমের পুষ্পোদ্যানগুলো পরিভ্রমণ করলাম
কোনো বাগিচায় দেখলাম না ক্ষতবিক্ষত ফুলের হৃদয়।

বিপ্লব

আবদুল মান্নান তালিব

এশিয়া ইউরোপে নেই জীবনের চাঞ্চল্য উত্তাপ,
এখানে খুদীর মৃত্যু আর ওখানে মৃত্যু হৃদয়ের,
বিপ্লবের উন্মাদনা নিয়েছে হৃদয়ে হৃদয়ে
ঘনিয়ে এসেছে বুঝি প্রাচীন পৃথিবীর মৃত্যুর দিন।

গণতন্ত্র

আবদুল মান্নান তালিব

এ রহস্য উদঘাটন করলো এক পাশ্চাত্যবাসী
যদিও প্রাজ্ঞজনেরা এ রহস্যন্মোচন করে না ঃ
গণতন্ত্র এক শাসন পদ্ধতি, যাতে মানুষের
মাথা গোণা হয় কিন্তু তাকে ওজন করা হয় না।

আসরারে খূদী

اسرار خودی

পূর্বাণী

ফররুখ আহমদ

দুরন্ত দস্যুর মত যখন প্রোজ্জ্বল সূর্য হানা দিল শর্বরীর 'পরে
আমার ক্রন্দন-ধারে শিশির সিঞ্চিত হ'ল গোলাবের মুখ,
নার্গিসের ঘুমঘোর মুছে নিল মোর অশ্রু-কণা,
উজ্জীবিত তৃণদল উল্লাসে ছড়ায়ে যায় আমারি সে একাগ্র আবেগ।

আমার বাণীর শক্তি পরখ করিয়া নিল মালঞ্চের মালাকর এসে,
মোর গীতিকার প্রাণ বপন করিল আর তু'লে নিল দুপ্ত তরবারি,
আমার অশ্রুর ধারা ছড়ায়ে গেল সে মালী মৃত্তিকার বুকে
তন্তুর ঊর্ণার মত অরণ্যের সাথে মোর আর্ত সুর করিল বয়ন।

যদিও কণিকা আমি তবু জানি খরপ্রভা সূর্য সে আমারি,
সহস্র উষার দীপ্তি সংগোপন মোর বক্ষ মাঝে,
জাম্‌শীদের পাত্র হ'তে উজ্জ্বল আমার ধূলি জানে সংজ্ঞা তার
জন্ম যে নেয়নি আজো ধূলিরুক্ষ ধরিত্রীর বুকে।
শিকার ক'রেছে মোর চিন্তাধারা সেই হরিণীকে
বাহিরে আসেনি আজো যে এখনো অনস্তিত্ব অন্ধকার থেকে।

সবুজে শ্যামলে মোর মনোহর অরণ্য সুন্দর,
আমার বসন-প্রান্তে সুপ্ত আজো সংখ্যাহীন গোলাব কুঁড়িরা
নীরব আমার সুরে সম্মিলিত গীতিকার দল!
আঘাত দিয়েছি আমি নিখিলের হৃদয় তন্ত্রীতে,
প্রতিভার প্রাণকেন্দ্রে সদ্য-বিকশিত এই গীতিকা দুর্লভ
অপরিচয়ের সূত্রে অজানা বিস্ময় আনে সহযাত্রী পথিকের প্রাণ।

তরুণ সূর্যের মত জন্ম মোর এ বিশ্বের বুকে,
আকাশের কক্ষপথ, বিচিত্র এ নভাঙ্গন পরিচিত নহে মোর কাছে,

আমার আলোক স্পর্শে জাগে নাই কক্ষপথে এখনো তারা-রা,
তাপমান যন্ত্রে মোর চঞ্চল হয়নি আজো পারদ কণিকা,
নৃত্যপরা রশ্মি মোর স্পর্শ করে নাই আজো সমুদ্রের বুক,
স্পর্শ করে নাই আজো ভোরের রক্তাভা মোর পর্বত শিখর,
অস্তিত্বের আঁখি আজো পরিচিত নহে মোর কাছে;
কম্পিত তনুতে জাগি ভীত আমি সত্তার প্রকাশে!

প্রাচীর দিগন্ত হ'তে উঠে এল প্রভাতের যে রশ্মি আমার,
সঞ্চিত রাত্রির ঘন অন্ধকার সহজে সে করিল লুণ্ঠন,
একটি শিশির-বিন্দু ঠাঁই নিল পৃথিবীর; গোলাবের বুকে।

তাদেরি প্রতীক্ষা করি শতাব্দীর রাত্রিশেষে জেগে ওঠে যারা
মোর অন্তরের বহ্নি নেবে যারা একদিন কত সুখী; কত সুখ তারা!
প্রয়োজন নাহি মোর আজিকার মানুষের বিমূঢ় কর্ণের
আমি বাণী অনাগত যুগের কবির।

আমার বাণীর গূঢ় রহস্য বোঝে না এই যুগ
মোর ইউসুফ নয় পণ্য মূক বিপণির;
প্রাচীন সঙ্গীর প্রজ্ঞা হতাশ্বাস ক'রেছে আমারে
আমার সিনাই জ্বলে অনাগত ভবিষ্যের মূসার আশায়!

ওদের বারিধি স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ শিশিরের মত,
আমার শিশির-কণা ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্র বিশাল,
আমার সংগীত-ধারা পরিচিত পৃথ্বী ছেড়ে সীমারেখা টেনেছে নূতন
এ বাঁশী ডাকিয়া ফেরে পথহারা শ্রান্তজনে মঞ্জিলের পথের আশ্বাসে
কত কবি জন্ম নিল সে মহাকবির মৃত্যু শেষে,
আমাদের রুদ্ধ আঁখি খুলেছিল যে নিজের দৃষ্টির আলোকে।
মাজারের মৃত্তিকায় যেমন গোলাব কুঁড়ি দীর্ণ করে সুপ্ত পর্ণাধার
নিঃসীম শূন্যতা থেকে নূতন দিগন্ত পানে যাত্রা শুরু হ'ল পুনর্বার।

অসংখ্য কাফেলা জানি পার হ'য়ে গেছে এই মরু
নিভৃতে;– উটের মত মিশে গেছে তারা দূরে শব্দহীন মৃদু পদক্ষেপে।
প্রেমপন্থী চিত্ত মোর এ ক্রন্দন প্রকৃতি আমার,
রোজ হাশরের মত্ত শব্দিত ঝঞ্ঝায় আমি শুনি একা নৈঃশব্দের সুর;

তন্ত্রীর শক্তিকে মোর অতিক্রম ক'রে যায় সুরের উচ্চাশা
তবুও নিঃশঙ্ক আমি এ বীণার দুর্জয় শক্তিতে।

সে বারিবিন্দুর যদি দেখা নাহি হ'ত মোর খরস্রোত সাথে
সেই ছিল ভালো!
ভয়ংকরী রূপ তার হয়তো উন্মাদ করি দেবে এ সিন্ধুকে!
কোন নদী পারিবে না ধারণ করিতে মোর ওমান দরিয়া
আমার উদ্দাম বন্যা চাহে আজ নিখিলের সব সিন্ধু; সমুদ্র ফেনিল।

যদি এ কুঁড়ির স্বপ্নে গোলাবের গুলশান না জাগে আমার
তবে এই ফাল্গুনের মেঘচ্ছায়া মূল্যহীন কৃপা তার ছায়া ব্যর্থতার।
বজ্র ও বিদ্যুৎ সুপ্ত, সম্মোহিত অন্তরে আমার;
শিলা আর সমতল পিষে ফেলে ব'য়ে যাই আমি।

যদি ভূমি মাঠ হও যুদ্ধ করো তবে মোর সমুদ্রের সাথে,
সিনাই পাহাড় যদি, তবে তুমি নাও মোর বিদ্যুৎ-বিভাস
আব-হায়াতের আমি অধিকারী, প্রাজ্ঞ আমি জীবনের গূঢ় রহস্যের
মোর অগ্নি-গীতি হ'তে করিয়াছে ধুলিতল জীবন সঞ্চয়,
বিস্তার ক'রেছে পক্ষ ঘনতর অন্ধকারে দীপ্তিময়ী স্ফুলিঙ্গের মত।
যে কথা জানাবো আমি খোলেনি কখনো কেউ সে অজ্ঞাত রহস্যের দ্বার।
চিন্তার দুর্লভ মুক্তা গাঁথিতে চাহেনি কেউ আমার মতন!
চিরন্তন জীবনের গূঢ় বার্তা যদি তুমি জেনে নিতে চাও
তবে তুমি এসো,
আকাশ মৃত্তিকা যদি জয় ক'রে নিতে চাও তবে এসো তুমি!
বন্ধুহারা যে আকাশ সেই শুধু এইগান শেখায় আমারে
এ গানের সুরজাল ঢাকিতে পারি না আমি বন্ধুর দুয়ারে।

ওগো সাকী! ওঠো; ওঠো ঢালো পাত্রে রঙিন শারাব;
কালের ভ্রূকুটি তুমি স্তব্ধ ক'রে দাও মোর অন্তর্লোক থেকে।
জমজমের ধারা হ'তে ভেসে আসে যে সুরা উজ্জ্বল,
সে সুরার পূজারী যে বিত্তশালী চিরদিন সম্রাটের মত!

আসরারে খুদী
সৈয়দ আলী আহসান

ইঙ্গিত পর্ব

শর্বরীর তিক্ত ক্লান্তি করিলো হরণ
অশ্রুর নীহারে কাঁপে নিষিক্তি পুষ্পের দল রক্তিম বরণ;
নার্গিস ফুলের তন্দ্রা মুছিয়া দিলাম আমি অশ্রুর প্রবাহে
জাগিয়া উঠিল অণু অচেতন ছিলো যাহা মৃত্যুর প্রদাহে।
আমার উচ্ছ্বাসে জাগে শীত শীর্ণ কিশলয় দল
আমার দীপ্তির রাগে মৃত–বীজ হ'য়েছে চঞ্চল।
আমার গানের সুর পরখ করিয়া নিলো বাগানের মূল আধিকারী
সে–সঙ্গীত সুষমায় গড়ে নিলো সেইজন বাঁকা তরবারী।
মাটিতে ছড়ালো সেই আমার অশ্রুতে সুপ্ত প্রাণবীজকণা
নূতন জগতে জাগে একসাথে একক্ষেত্রে
পুষ্পের লালিত্য আর আমার বেদনা।

পরমাণু আমি মাত্র, তবুও উজ্জ্বল সূর্য একান্ত আমার
আমার অন্তরে হাসে দীপ্ত ছবি অনেক উষার;
আমার ধূলার কাছে তুচ্ছ আজ জামশেদের পানপাত্রখানি
আমার মাটিরে আমি গ'ড়ে নিই পৃথিবীর সব স্বপ্ন আনি।
আমার চিন্তনে আজ অনেক কুরঙ্গদল হ'য়েছে সংহার
অলক্ষ্য আবাস হ'তে যাহরা নেয়নি খুঁজি প্রাণের অঙ্গার।
আমার পুষ্পের বীথি এনেছে প্রশান্তি এক অনেক উজ্জ্বল
যদিও সবুজবর্ণে তাহাদের পত্রগুলি হয়নি সজলঃ
নেকাব প্রচ্ছায়ে মোর আচ্ছন্ন র'য়েছে কত পুষ্প অপরূপ
আমার সুরের টানে বাদকের দল সব হইল নিশ্চুপ।

আমার আঘাতে কাঁপে ধরণীর সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলি–
বাহিরিয়া বিশ্বে এই তুলিলাম ওষ্ঠ'পরে নির্দেশ–অঙ্গুলি,
আমার বাঁশীতে আছে অপরূপ সুরের আভাস
মধুর নির্যাসে যা'র কেঁপে ওঠে সুনীল আকাশ।

জন্মেছি পৃথ্বীতে এই নূতন সূর্যের মতো নবীন উচ্ছাসে,
এখানের কোনো তত্ত্ব শিখি নাই নতুন উল্লাসে;
নতুন সেতারা আসি আমার ভাতিরে আজো করেনি মলিন
গলিত সোনার রঙ্গে আমার পর্বত চূড়া হয়নি রঙ্গিন।
সৃষ্টির সৌন্দর্য আজো মোর কাছে পরিচিত নয়;
নেহারিয়া বিশ্বলোক ত্রস্তপ্রাণে আপনারে লুকাইতে হয়।

পূর্বের সীমান্ত হ'তে আমার উজ্জ্বল উষা
রাত্রির তমসা যবে করিলো হরণ
নতুন শিশিরে কাঁপে নিষিক্ত পুষ্পের দল রক্তিম বরণ।
ব'সে আছি তা'র লাগি' মধুর প্রভাতে যা'রা করিবে বন্দনা
প্রশান্তি পেয়েছে সেই আমার অগ্নিকে যেই ক'রেছে অর্চনা।
অধুনা উচ্ছল দিন শুনিবে না মোর কোনো গান,
আগামী দিনের কবি আমার সুরের লাগি' পেতে আছে কান।
আমার গভীর তত্ত্ব ব্যর্থ হ'ল এ-যুগের কাছে
আমার য়ুসুফে তা'র অতীতের দোসরেরা যাচঞা করিয়াছে।
পুরোনো বান্ধব লাগি' গড়িলাম অশ্রুর সাগর
আমার মুসার লাগি, সিনাই পর্বত চূড়া র'য়েছে ভাস্বর।

তাহাদের সুন্দর র'য়েছে আজি শিশিরের মতো
আমার নীহারে জাগে তরঙ্গ-বিক্ষেপ আজ সাগর-সঙ্গত।
এই ধরণীর নয় আমার এ-রোমাঞ্চিত বাণী
তাহাদের সঙ্গীতের কল্লোলে পড়িলো ধরা
পৃথিবীর সূক্ষ্ম স্পর্শখানি।
মৃত্যুর অনেক পরে অনেক কবির ভাষা
রূপ দিলো নীল আকাশেরে
নতুন আকাঙক্ষা দিলো ব্যাকুলিত শেষ নিমেষেরে,
আমাদের চোখে দিলো নতুন আলোর রশ্মি
যদিও তাহারা সবে মৃত্যু-অচেতন
পুনরায় তাহাদের যাত্রার দীপ্তিতে যেন

প্রাণ পেলো অজানার নিশ্চল কেতন;
গোলাব জাগিলো চাহি কবরের বুকের উপর
সবুজ ছায়ায় হাসে মরুভূ ধূসর।

অনেক কারাভাঁ যাত্রা শেষ হ'লো স্তব্ধ পরিচয়ে
আমার কণ্ঠের সুর তৃপ্ত কোনই সঞ্চয়ে–
প্রণয়–প্রমত্ত কণ্ঠে আমার বক্তব্যগুলি জানাইবো
বন্ধুসবাকারে
হাশরের উচ্চকিত ব্যাকুলিত কলরোল
রূপ দেবে আমার ভাষারে।
যন্ত্রের সংগতি নাই আমার গানের সুর
ধ'রে রাখিবার

তবু জানি আমি এই বেহালার তন্ত্রী মোর
ছিঁড়িবে না উচ্ছ্বাসে আমার।
আমার উদ্দাম স্রোত সাগর প্রবাহগুলি
করিবে উন্মাদ
একবিন্দু জলকণা আপন অন্তরে তাই
ব্যর্থতার আনিবে সংবাদ।
আমার ওমান কভু কোন শান্ত নহরের
বুকে জাগিবে না
আমার চঞ্চল বন্যা সসীরের প্রান্তে আসিবে না;
হাযারো সাগর মিলি গ'ড়ে নেবে আমার প্রবাহ
নতুন পল্লব মেলি নবীন বিস্ময়ে প্রাণে
জাগিবে উৎসাহ।

যদি না ফুলের কুঁড়ি বিকশিত হয়ে গড়ে
গোলাব–বিতান
আমার সজল মেঘে পাবে না খুঁজিয়া কেহ
প্রাণের সন্ধান।

বজ্রও নিশ্চিন্ত হ'য়ে আবাস ল'ভেছে আজ
 আমার আত্মায়
পর্বত–প্রান্তর ত্যাজি' চলিয়াছি নব–মূর্ছনায়
সমতলভূমি যদি তোমার দোসর হয়,
 আমার সমুদ্র সাথে ঘটাও সংঘাত;
সিনাই পর্বত যদি তোমার আবাস হয়
 বক্ষ পাতি' লও মোর বজ্রের সম্পাত।
প্রাণের নহর হ'তে অধিকার পাইয়াছি
  পান করিবার
জীবনের গূঢ়তত্ত্ব মিশিলো প্রজ্ঞায় মোর ইঙ্গিতে আত্মার

গানের প্রভাবে মোর ধূলার নগণ্য কণা প্রাণ পেলো আজ
মেলিয়া উধাও পাখা প'রে নিলো দেহোপরি খদ্যোতের সাজ।
জানে না কেহই হেথা কোন্ গূঢ় সত্য আমি শোনাব এখন
চিন্তার মুকুতা দিয়া যে সঙ্গীত রচিয়াছি,
  অনবদ্য তা'র আবেদন।
অনন্ত প্রাণের তথ্য যদি পেতে চাও তুমি
  এসো মোর কাছে।
মর্ত্য ও স্বর্গের তথ্য তাও মোর আছে!
জান্নাত শিখালো মোরে বিজ্ঞতার নব সংবেদন
স্বজন বান্ধবে আমি জানালাম আত্মার চেতন।
 হে সাকী! ঢালিয়া দাও স্বর্ণময় পানপাত্রে
  রঙ্গিন নিঝর
আমার অন্তর হ'তে বিমুক্ত হউক আজি
  অশান্ত প্রহর।

যমযমের উৎস হ'তে এক কাত্‌রা পানি যদি
  কেহ করে পান–
যদিচ সে সর্বহারা, সার্থক হইবে তা'র
  অমৃত–সন্ধান।
সুগভীর হবে চিন্তা, দৃষ্টি হবে সুতীক্ষ্ণ করুণ,
কণিকা হবে পর্বতের শৃঙ্গে দীপ্ত নতুন অরুণ।

শক্তিহীন জীব হবে নবীন সামর্থ্য নিয়া সিংহের সমান
যমৃযমের এই তো এক নিত্যস্ফূর্ত প্রাণবন্ত দান,
ধূলার কণিকাগুলি প্রাণ পেয়ে উড়িবে আকাশে
পানির একটি বিন্দু সাগরের কলোল্লাস আনিবে আভাসে,
গভীর প্রশান্তি ভাঙ্গি' দিন হবে মথিত উত্তাল
ঈগলের রক্তে হবে তিতিরের পদনখ লাল।

হে নবযৌবনা সাকী ঢেলে দাও মোর পাত্রে
ফেণোচ্ছল পানীয় রঙ্গিন
চন্দ্রের সুস্নিগ্ধ রূপে চিন্তার তিমির মোর
হ'য়ে যাক্ ক্ষীণ,
বিভ্রান্ত পথিকে' যেন দিতে পারি পথের নির্দেশ
অশান্তি আনিতে পারি ক্লান্তক্লিষ্ট মানসে বিশেষ
নূতন সন্ধানে আমি হব অগ্রসর
নব-বোধনায় যেন উচ্ছ্বসিত হয় আজি প্রাণের নহর।

অক্ষির অন্তরে দীপ্ত তারকার সম
প্রজ্ঞাবান মানুষের আমি হব বন্ধু অনুপম;
পৃথিবীর কর্ণরন্ধ্রে ঢেলে দেব সঙ্গীতের সুধা
যাহার আবেশে তৃপ্ত হবে জানি আমার বসুধা।
নতুন আনন্দে মোর কাব্যের সমৃদ্ধি হবে একান্ত নিশ্চয়,
আমার অশ্রুতে সিক্ত হবে কত শুষ্ক কিশলয়।
রুমীর প্রতিভা মোরে ক'রেছে লালন
তাঁহার ইঙ্গিতে আমি বহু সুগোপন তথ্য করিব জ্ঞাপন।
অগ্নির লেলিহ-শিখা অন্তর তাহার
সে-অগ্নির কণা হ'তে গড়া হ'ল প্রতিভা আমার।

সামান্য পতঙ্গ আমি পুড়িলাম তাঁর দীপ্ত অগ্নির রেখায়
আমার সঙ্কীর্ণ পাত্র উচ্ছ্বসিত হ'ল তাঁর মদের ফেনায়,
রুমীর ইঙ্গিতে মোর মাটি হ'ল সোনার সমান
এক বিন্দু ভস্ম পেলো লেলিহান শিখার সম্মান।

ক্ষীণকায় বালুকণা মরুভূ হইতে তার যাত্রা শুরু করে
সূর্যের প্রখর ভাতি তাহার সুহৃদ হয় নতুন প্রহরে।
উদ্বেল তরঙ্গ আমি তাঁহার সাগর বুকে লভিব বিশ্রাম
একান্ত আমার হবে অগণন মরকৎ নয়নাভিরাম।

তাঁহার সঙ্গীত–সুধা পান করি, হ'য়েছি উন্মাদ
তাঁহার ভাষণ হ'তে আহরণ করিয়াছি জীবন–সংবাদ।
নিশীথ হ'য়েছে ঘন নব–প্রাণ বোধনায় আমার অন্তর আজ
করিলো ক্রন্দন।
ক্রন্দন–উচ্ছ্বাসে মোর ভেঙ্গে গেল স্তব্ধতার অতীত বন্ধন
অনুযোগ–পূর্ণ সুরে পৃথ্বীর ব্যথার কথা
আল্লার হুযুরে আমি কাতরে জানাই
পাত্রের নিঃস্বতা ছিলো, দুঃখ মোর তীব্র হ'ল তাই।

বেদনা বিষাদে মোর নিমীল নয়ন
তন্দ্রায় জড়িত হ'য়ে দেখিলো কল্যাণময় মধুর স্বপন;
সত্যের গৃহীতা যিনি লিখেছেন ফোর্‌কান ইরাণী ভাষায়
কহিলেন তিনি মোরে জাগাইয়া চিত্ত মোর নবীন আশায়–
"হে প্রেমিক নবীন প্রভাতে
প্রেমের অমৃতে পূর্ণ পাত্র তুমি তুলে লও হাতে।
হৃদয়ের সব গান একতালে কল্লোলিয়া তুলুক উল্লাস
একটি আঘাতে শুধু হৃদয় তন্ত্রীতে তব জাগুক উচ্ছ্বাস
পাত্রের কার্ণিস যেন আঘাত আঁকিয়া দেয় মস্তকে তোমার
অক্ষির সান্নিধ্যে তব দীপ্ত হোক্ বাঁকা তলোয়ার।

তোমার হাসির আলো উৎস হোক্ বহু বেদনার,
তোমার চোখের পানি রক্তাক্ত করিয়া দিক্ অন্তর সবার।
ঘুমন্ত কুঁড়ির মতো কতদিন রবে তুমি শান্ত অপ্রতুল?
প্রমুক্ত গোলাব সম ব্যর্থভাবে উড়াইবে সৌরভ অতুল!
ব্যথায় মুমূর্ষু হ'য়ে বাক্যহীন রহিয়াছ তুমি!
রক্তিম অঙ্গারে জ্বলি' চঞ্চল হউক আজি তব মনোভূমি।

শান্তিরে লাঞ্ছিত করি' কলকণ্ঠে জানাও বারতা
দেহের প্রতিটি রন্ধ্রে জানাইবে অন্তরের তীব্র আকুলতা।
পুঞ্জীভূত অঙ্গারের তুমি দীপ্ত–প্রাণ
পৃথ্বীতে প্রশস্ত হোক্ আলোর সন্ধান।

তোমার জ্বলন্ত ছবি অন্যের অন্তরে দিক্ দাহন্ পিপাসা
মিথ্যা হোক্, মিথ্যা হোক্ অতীতের অনেক নিরাশা
মদ্য বিক্রেতার যত সুগোপন তথ্যগুলি জানাইয়া দাও
ভীতির মুকুরগুলি সম্পূর্ণ বিচূর্ণ করি ধূলায় ছড়াও।
সুরার উচ্ছ্বাসে তব মুহূর্ত রচনা করি স্ফটিক ভাতিতে
গড় অঙ্গ আবরণ
পুনর্বার পথপ্রান্তে সুরার পেয়ালাগুলি
করিও না, কভু আহরণ।
লাইলির গোত্র হ'তে সংবাদ আনিয়া দাও মজনুর দ্বারে
সঙ্গীতে লাবণ্য আনো,–নবছন্দ এনে দাও তারে;
সমবেত জনগণে প্রাণময় ক'রে তোলো সঙ্গীত সুধায়
প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণ আশ্রয় লভুক আজ আলোক গুহায়।

বল তুমি, 'উত্তিষ্ঠত'–সে কণ্ঠ শুনিয়া যেন
সকলেই হয়গো চঞ্চল
নতুন পথের প্রান্তে দেখিতে পাইবে তুমি
দ্যুতিমান সবুজ অঞ্চল
অতীতের উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন ভুলিয়া যাও
দেখো এলো কিনা
সঙ্গীত সুরভিগুলি,–যাহার উৎসেতে আছে নব মনোবীণা,
কারাভাঁ যাত্রার তুমি প্রাণদ ইঙ্গিত
নতুন উল্লাস প্রাণে জাগ্রত করিয়া দিক্ তোমার সঙ্গীত।"

রুমীর আদেশ শুনি' উচ্ছ্বসিত হ'ল বক্ষ নব চেতনায়,
প্রাণবন্ত হ'ল কণ্ঠ নব–দ্যোতনায়।
তন্ত্রীর আকুতি হ'তে সুর হ'য়ে জেগে উঠিলাম
কর্ণের গ্রহণ লাগি স্বর্গ রচিলাম।

ব্যক্তিত্বের নব সূত্র রহিলো না মোর কাছে আর অপ্রকাশ
অন্তর্গূঢ় তথ্য তা'র রচিলো উচ্ছ্বাস।
অসমাপ্ত মূর্তি আমি শ্বেত মর্মরের
রূপহীন, ভাতিহীন ব্যর্থ ছবি মলিন স্বপ্নের।
প্রণয় আবর্তে পড়ি' ব্যক্তিরূপ হইলো উজ্জ্বল
পৃথ্বীর জ্ঞানের পথে চূর্ণ হ'ল আড়ষ্ট শৃঙ্খল।
আকাশের গতি-রেখা দেখিয়াছি আমি বহুবার,
চন্দ্রের শিরায় আমি দেখিয়াছি রক্তের সম্ভাব।
ধরার মানুষ লাগি অনেক নিশীথে আমি
করিয়াছি অনেক ক্রন্দন
কামনা শুধুই ছিলো-ধরণীর সব তথ্য
নবরূপে হয় উদঘাটন।

জীবনের গোপনতা বস্তুর আবেশ হ'তে
কামনা করিলো এক মুক্তি অনুপম
অহেতুক স্বপ্নমায়া অনাকাঙ্ক্ষী প্রাণপুঞ্জে আনেনি সম্ভ্রম।
তামসী নিশীথে আমি এনেছি সৌকর্য, আর
এনেছি সৌরভ
ক্লেদহীন বিশ্বস্তিতে মৃত্তিকারে দিয়াছি গৌরব-
সে বিশ্বাসে ধন্য হ'ল পর্বত প্রান্তর আর উপত্যকাভূমি
মৃত্যুহীন সঙ্গীতের স্পর্শের লালিতা আজ
ধন্য হল মানবের প্রাণকেন্দ্র চুমি ঃ
মাটিতে বপন করি একবিন্দু পরমাণু
নূতন সূর্যের লাগি, রুচিলো আসন
রুমী ও আত্তার সম অনেক করিবে তাহা করিলো লালন।
দীর্ঘশ্বাস আমি মাত্র ঃ স্বর্গের সীমান্তে মোর গতি বহমান;
ভস্মের প্রতিভূ আমি ; তবুও অগ্নিরে আমি করেছি মহান।

উত্তুঙ্গ চিন্তার গতি আমার লেখনী হতে নিঃসরিত ক'রে নিলো
জীবনের ছায়া
নেপথ্যের তথ্য তাই নয়ন সম্মুখে আসি রচে নব-মায়া,-

যাহার ইঙ্গিত পেয়ে একবিন্দু জলকণা বারিধির এনেছে আভাস
নিঃসঙ্গ বালুকা সাথে সাহারায় উড়েছে বাতাস।
আমার এ মসনভী কাব্যের সুঠাম ছাদে চরণেরে করেনি সুন্দর
শিল্পের একান্ত সুরে প্রেমের মধুর রাগে কণ্ঠ মোর হয়নি মুখর।
আমি ভারতের কবি ঃ আমার দেশের ভাষা
ইরানের ভাষা কভু নয়
সুবঙ্কিম চন্দ্র আমি, পূর্ণ নয় আমার লেখন।
মাতার সুকণ্ঠ হ'তে যে ভাষা নিত্যই শুনি'
যদিও অমৃত সম লালিত্য তাহার,
উজ্জ্বল মধুর ছন্দে ইরানের ভাষা রচে কাহিনী আমার–
আমার মানসকক্ষে সুন্দরের অগ্নি জ্বলে তাহার পরশে
আমার লেখনীমুখ শিখা হ'ল জ্বলন্ত হরষে।
উত্তুঙ্গ ভাবের জ্যোতি চিন্তনের ক্ষেত্র মোর ক'রেছে উজ্জ্বল

তাইতো ইরানী সুরে কণ্ঠ মোর হইলো সজল।
পাত্রের স্বরূপ ল'য়ে তুলিও না বিতর্ক বৃথাই
সুরার সুরভি চাও–প্রয়োজন আজ শুধু তাই।

প্রথম পর্ব

অস্তিত্বের ব্যঞ্জনায় ব্যক্তি–রূপ র'য়েছে উজ্জ্বল
প্রকাশ্য সকল তথ্যে আত্মার রহস্যকণা র'য়েছে চঞ্চল
যখন জাগিলো আত্মা উচ্ছল আনন্দরূপে চেতন–প্রবাহে,
চিন্তনের ধরণীতে আত্মার আলোক জ্বলে রক্তিম–প্রদাহে।
শতেক বাক্যের প্রাণ জেগে থাকে অন্তরে তাহার
ব্যক্তিত্ব–স্বীকৃতি আনে আত্ম–হীনে আলোকে আবার।

আত্ম দেয় সংঘাতেরে নব–আমন্ত্রণ
দ্বৈতরূপে আপনারে এনে দেয় নব–আকর্ষণ,
আপনার একরূপ, অন্যরূপ কল্পিত আত্মার
আত্ম হ'তে গ'ড়ে তোলে অপরের সুষমা–সম্ভার ;

সংঘাতের তৃপ্তি চাই, তাই তার এ পরিকল্পনা
জীবনের রহস্যের নব–অভ্যর্থনা

আপনারে হত্যা করা আপনার হাতে–
সেইতো শক্তির লভ্য জীবনের ব্যাপ্ত আঙ্গিনাতে–
অনুভব ক'রে–নেওয়া আপনার সামর্থ্য–নিচয়
আনন্দের, আলোকের, সত্য–সন্ধ জীবনের সেই হ'ল নব–পরিচয়।
জীবনের তথ্য পায় আপনারে করি' প্রবঞ্চনা
গোলাবের মতো গ'ড়ে রক্তিম আলোকে তা'র জীবনের প্রমুক্ত কল্পনা
একটি গোলাব লাগি' ভেঙ্গে ফেলে উদ্যানের পূর্ণাঙ্গ আস্বাদ
একটি সুরের লাগি' আদি–পথে গড়া হয় বহু আর্তনাদ।
একটি আকাশ লাগি' কত না নতুন চাঁদ
  গড়া হয় নতুন প্রভায়
সহস্র বিতর্কজাল শুধু এক সঙ্গহীন বাণীর সহায়।
কেন এই অপব্যয়–নিষ্ঠুর ধরার মাঝে ব্যথার সঞ্চয়–
ধ্বংসের সঙ্কট গড়ে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের নব–পরিচয়।

ব্যাকুলিত ফর্‌হাদ কেঁদেছিলো শিরীনের লাগি'
কত না বেদনা স'য়ে তৃপ্তিহীন রাত্রি ছিলো জাগি'–
তা'র সে বেদনা কভু ব্যর্থ নয়, যেহেতু শীরিন
অপরূপ সৌন্দর্যের স্বপ্ন মাঝে র'য়েছে বিলীন।
শতেক কস্তুরি–মৃগ ম'রে যাক্, তাতে ক্ষতি নাই
এককণা মৃগনাভি যদি কভু লভিবারে' চাই।
পতঙ্গ জ্বলিয়া মরে লেলিহান অগ্নির শিখায়
সে–মৃত্যু আনন্দময় অফুরন্ত প্রাণের ইচ্ছায়।

আত্মবিকাশে দীপ্ত হ'য়েছে বর্তমানের দিন
আগামী উষার দিগ্ বলয়ের ছবি হ'ল রঙ্গিন
ইহার শিখায় জ্ব'লে ছাই হোল ইব্রাহীমের কায়া
তাই দেখিলাম মুহম্মদের নব–প্রদীপের মায়া
কর্মের লাগি' আত্মা নিয়েছে কত বিচিত্র রূপ–

কভু বা কর্তা, কভু বা বস্তু, উপায়, কারণ
কখনো বা নিশ্চুপ।
ব্যক্তিস্বরূপ জাগিয়া উঠিয়া আপনারে দেয়
ছড়ায়ে আকাশময়
প্রজ্বলন্ত তা'র রূপরাশি মাটিতে জাগায় অপরূপ বিস্ময়
তা'র পথে পথে স্বর্গ নেমেছে ধুলার আঙিনা গড়ি'
নিরবধি কাল তাহার মাটিতে আসিয়াছে সন্তরি'।
নিকুঞ্জে তা'র গোলাব জাগে,
তাহা শুধু তার নয়
তারি' মাঝে আছে সারা বিশ্বের কুসুমিত পরিচয় ;
রাত্রি তাহার তন্দ্রা হইতে,
জাগ্রতরূপে দিবস মেলেছে আঁখি–
দিনের বিলাস অঙ্গে জড়ায়ে ডানা মেলিয়াছে পাখী।

শিখা হ'তে তা'র ছড়ায়ে পড়িলো কত না অগ্নিকণা
প্রজ্ঞা শিখেছে তা'র কাছ থেকে বিশেষের অর্চনা।
আপন সত্তা বিচূর্ণ করি' গ'ড়েছে অণুর হাসি
ক্ষণেকের লাগি' ব্যাপ্ত হইয়া সৃজিছে বালুকা রাশি।
ক্লান্ত–মধুর সুরভিত তনু রূপ নিলো এইবার
মর্মরময় পর্বত হ'ল পূর্ণ স্বরূপ তা'র।
আপনারে শুধু প্রকাশের লাগি' আত্মা চেয়েছে প্রাণ
বস্তুকণায় তা'র রূপরাশি জ্বলিছে অনির্বাণ।

নিরাসক্ত সামর্থ্য যা রহিয়াছে আজো গতিহীন
শৃঙখলিত করি' কৃত্য, কর্মমাঝে রহিবে বিলীন–
যেমতি বিশ্বের প্রাণ দীপ্তি পায় আত্মচেতনায়
সে–প্রাণ শক্তির চিত্তের দোসর, সহায়।
যখন জলের বিন্দু ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনায় হইবে উচ্ছল
আপনার ব্যর্থরূপ মুক্তাসম হইবে উজ্জ্বল।
সুরার আকৃতি নাই, কেন না সে ম্লান, আত্ম–হীন
পাত্রের অন্তরে গিয়া হইবে রঙ্গীন।

যদিও মদের পাত্র অতি রূপময়
মূল্য তা'র তখন অক্ষয়
ওষ্ঠের সান্নিধ্যে যবে পরিচয় যাবে তার জানা
তন্ময় মানব–চিত্তে স্বপ্ন দেবে হানা।

আপনি বিচূর্ণ হয়ে ধূলা হবে পর্বত যখন
লাঞ্ছিত মানস তা'র অভিযোগ আনিবে তখন–
সাগরের জল তা'র বক্ষোপরি' করে আনাগোনা
চিররাত্রি–দিন সেই কলোল্লাস যায় যেন শোনা ;
সাগর–তরঙ্গ যদি আত্মরূপ রাখি' অব্যাহত
নৃত্যোন্মাদ রূপে তা'র সমুদ্র–বক্ষকে যদি করে গো আহত–
তখন বলিব তা'রে আরোহী উদ্দাম
চঞ্চল সমুদ্র সাথে ক'রেছে সংগ্রাম।

আলো হ'ল অক্ষিতারা সুন্দরের মধু অন্বেষণে,
কিশলয় পেল প্রাণ পুষ্পময় বনে
বিকাশের শক্তি পেয়ে চঞ্চল অস্থির
নবীন আকাঙ্ক্ষাদীপ্ত প্রাণবন্ত জীবন অধীর।
মোমের প্রদীপখানি সীমাতীত অণু দিয়ে ভরা
যাহারা সম্পৃক্ত হ'য়ে গড়ে নিলো আলোর পসরা–
তারপর ক্রমান্বয়ে আপনি গলিয়া গিয়া আত্ম
হ'তে করে পলায়ন
সর্বশেষে দেখি তা'র অশ্রুর বিন্দুর মতো নব–রূপায়ণ।

অঙ্গুরীয়ের প্রস্তরাধার সংরক্ষিত নয়
তাইতো তাহার মনে জাগে সংশয়
হয়তো বা কভু নবীন আঘাতে দেহ হবে ভাতিহীন
যখন কাহারো নামের বোঝায় হবে সে ক্লান্ত দীন।
যেহেতু পৃথিবী আপন বক্ষে চিরকাল গতিমান
বন্দী চন্দ্র চারিদিকে তার অনন্ত অভিযান

চালায়ে আসিছে অনন্তকাল হ'তে--
শৃঙ্খলময় আপন প্রবাহ নিরবধি কালস্রোতে।

আবার দেখেছি এই পৃথিবীর সূর্য–পরিক্রমা
আবার দেখেছি নব–দিগন্তে জীবন–সম্ভাবনা
শক্তিমান সে সৌরবলয়, পৃথ্বীরে তাই ক'রেছে আকর্ষণ
নব–প্রভাতের আলোকে তাদের নবীন সম্ভাষণ।
দেখেছি আমরা বীচবৃক্ষের মহিমা সে রঙ্গিন
আঁখিতে মোদের দীপ্ত হয়েছে সুতীক্ষ্ম সঙ্গিন
পর্বত হল গরীয়ান ত ারে বুকেতে লালন করি'
আবরণ তার অগ্নিতে বোনা রক্তিম মঞ্জরী;
বীজের গভীরে রয়েছে তাহার প্রত্যয়শীল প্রাণ
সে–প্রাণপুঞ্জ নব–কামনায় জ্বলিছে অনির্বাণ।
জীবন যখন আত্ম হইতে সামর্থ্য নিলো
অপরূপ উল্লাসে
জীবনের স্রোতে ব্যাপ্তি পাইল
সাগরের উচ্ছ্বাসে।

দ্বিতীয় পর্ব

জীবন উদ্দেশ্য দ্বারা সংরক্ষিত আবদ্ধ মধুর
নির্দিষ্ট আদর্শ লক্ষ্যে পৌছিয়াছে কারার্তার সুর
অনুসন্ধানের মাঝে রহিয়াছে জীবনের পূর্ণ পরিচয়
তার মূলীভূত তত্ত্ব সংগোপনে রাখিয়াছে আকাঙ্খা–নিচয়!
বাসনা প্রদীপ্ত রাখ অন্তরের রুদ্ধ দ্বার খুলি'
তোমার ধূলির কণা মৃত্যুর দু'হাতে যেন
আপনারে নাহি দেয় তুলি'।

অন্তরের অন্তরীক্ষে যে কামনা পুঞ্জীভূত
সেই হ'ল ধরণীর প্রাণ
বস্তু–প্রকৃতির মাঝে নিভৃতে লুকায়ে আছে

আকাঙ্খার নব বাসস্থান।
হৃদয়ে চপল হয় কামনার স্পর্শ পেয়ে
প্রাণ বীজকণা।
তাহার উজ্জ্বল বিভা হৃদয়ে গঠন করে
দীপ্ত অগ্নিকণা।

নভোপানে উথানের সামর্থ্য পেয়েছে বিশ্ব
আকাঙ্খার কাছে।
সে হ'ল খিজির আর তুলনায় স্বল্প হ'ল
মূসা তার কাছে।

আকাঙ্খার অগ্নি হ'তে গড়া হয়
প্রাণের সম্ভার।
অসত্য মরিয়া যায় যখন প্রদীপ্ত হয়
মানস–অঙ্গার।
মেলিতে পারে না পাখা আর কভু এ পৃথিবী
পরিত্যক্ত হয় যবে আকাঙ্খার দান,
লুণ্ঠিত ধুলায় থামে তাহার উদ্দাম গতি–
রহিত উথান।

চিরজাগ্রত রহিবে আত্ম-কামনার শিখা জ্বালি
আত্মার মহা জলকল্লোলে অশান্তি দিলো ঢালি'।
আদর্শ যত রয়েছে বিশ্বে–কামনাই সব করেছে অন্বেষণ
কর্মগন্থী বেঁধে রাখিয়াছে চঞ্চল তার মন!
আকাঙ্খার মৃত্যু হ'লে, মৃত্যু হয় মানব–জন্মের
উষ্ণতা কমিয়া গেলে নিভে যায় শিখা সব তাপিত বিশ্বের।

কোথা আছে উৎসমুখ আমাদের জাগ্রত চক্ষুর?
কোথা আছে প্রাণতপ্ত বস্তুর অঙ্কুর?
দেখার আনন্দ আজ প্রকাশিল বস্তুরূপে
দৃষ্টির গোচর।

তিতিরের দ্বৈত পদ রাখিয়াছে উৎস তার
চলার প্রেক্ষণ মাঝে অতি মনোহর;
বুলবুল গাহিলো গান, আনন্দ উদ্বেল কণ্ঠে নব মূর্চ্ছনায়
চঞ্চু তার গড়া হ'ল সে–আনন্দ মূল হ'তে নব ব্যঞ্জনায়।
নলবন হ'তে এসে একাকী একটি নল হইল বাঁশরী
সঙ্গীতের উৎস হ'ল বেদনা–আবরি।

মানসের মূল কোথা, যে মন খুঁজিয়া ফেরে
নব প্রাণভূমি আর মৃত্তিকা আকাশ?
আশ্চর্য আবেশে কেন্ প্রাণপুঞ্জে সন্ধানের এহেন আভাষ?
জীবন উন্নত হয় কামনার পরশে নবীন
কামনা–জঠরে মন নব–সৃষ্ট ভ্রূণ–সম রয়েছে রঙ্গিন
সামাজিক নীতি আর নিয়ম–শৃঙ্খলগুলি
কোন্ বাক্য ক'রেছে প্রচার?
বিজ্ঞানের তথ্যগুলি কোন্ মহাজীবনের
আনে অঙ্গীকার?
–কামনাই হোল সেই সত্যবাক্য–সত্যদীপ্ত বাণী
অন্তর–বাহির আসি' অন্তরের শুশ্রূষায় আনন্দকে
আনিয়াছে টানি।
দেহের প্রতিটি অঙ্গ. সেই সঙ্গে আর
চিন্তন, কল্পনা আর ভাবনার পূর্ণ সমাহার
আত্মসংরক্ষণ লাগি' সৃষ্টি হইয়াছে–
রূপহীন সংঘাতের বার্তা আনিয়াছে।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য নয় জ্ঞান–আহরণ
শিল্পের উদ্দেশ্য নয় তথ্য আমন্ত্রণ,
নিকুঞ্জ চাহেনি কভু কুঁড়ি ও কমল
বস্তুর লাবণ্য তা'রে করেনি চঞ্চল।
বিজ্ঞানের লক্ষ্য হ'ল জীবন গড়িয়া তোলা নব রূপায়নে
বিজ্ঞান আনিয়া দেয় দীপ্তিকণা মানুষের মনে
নির্বাণ মনের কোণে শিল্প রচে বাক্যের বাঁধুনি
শিল্প আর বিজ্ঞানের সুষ্ঠু সমন্বয়ে আমি জীবনের পদধ্বনি শুনি।

জীবন–তথ্য অজ্ঞাত আছে যদি কভু মনে হয়
জাগ্রত হ'য়ে অন্তরে আনো আনন্দ সঞ্চয়
নব–চেতনায় বলীয়ান হ'য়ে পান কর সেই পানি
ন্যায়ের পাত্রে আদর্শময় জীবনের সন্ধানী–
এই আদর্শ আলোকোজ্জ্বল উষার দ্যুতির মতো–
জীবনক্ষেত্রে অগ্নিকন্যার প্রকাশ ইতস্ততঃ
স্বর্গ থেকেও আরো মহীয়ান
এ–আদর্শের দান
মানুষের মন জয় করিবে সে, মুগ্ধ করিবে
আনিবে–সে কল্যাণ;
অতীতের যত মিথ্যা র'য়েছে
সে তা'র ধ্বংসকারী
সংক্ষোভে তা'র পরিপুর মন
সংঘাত–সঞ্চারী।
জাগুক তোমার চেতনার মূলে প্রাণের অঙ্গীকার
জাগুক তোমার রাতের স্বপ্নে আনন্দ–ঝঙ্কার
পান কর তুমি পানীয় সে রঙ্গীন
পানপাত্রের উচ্ছলতায় সজল হউক দিন।

যদি তুমি কভু রাতের আঁধারে
একান্ত নিরালায়
নির্বাক মনে জেগে থাকো কোথা
জীবন–প্রত্যাশায়
আদর্শ বাণী জীবন্ত করো তুমি–
উষার আলোতে উজ্জ্বল হোক মনের ধূসর ভূমি।
আল্লার কাছে সে আদর্শের ভাতি হয়তো বা ম্লান
প্রকৃতির কাছে দীপ্তি তাহার আনিয়াছে কল্যাণ;

স্বর্গ থেকেও আলোকোজ্জ্বল রূপে
মানুষের মনে মোহন–স্বপ্ন আনিয়াছে চুপে চুপে।
বিজিত হ'য়েছে মানুষ তাহার কাছে

বশীকরণের যাদু তার জানা আছে
আকর্ষণের ক্ষমতা তাহার একান্ত সঞ্চয়;
অতীত কালের জমানো মিথ্যা আর নয় অক্ষয়;
সে ভেঙেছে সেই মিথ্যার কুহেলিকা
পৃথ্বীতে সেই জ্বেলেছে এবার প্রাণের নবীন শিখা।
সংঘাতে তার মনের আবর্তন
শেষ বিচারের রুদ্র দিনের জানালো আমন্ত্রণ।

ন্যায়–স্বচ্ছ নীতি আজ গড়িতেছি মোরা বারবার
এইতো জীবন বন্ধু, কামনার সূর্যালোকে
  গড়িয়াছি আদর্শ সবার।

তৃতীয় পর্ব

মোদের মৃত্তিকাতলে যাহা আছে প্রাণের স্পন্দন
সে হ'ল আত্মার বিন্দু, প্রতিক্ষেত্রে যা'র সঞ্চরণ
আয়ু তার দীর্ঘ হয়
  অনেক জীবন্ত হয়–
অনেক জ্বলন্ত আর অনেক উজ্জ্বল
প্রেমের পরশে তা'র বারবার এত রূপায়ণ
প্রেমের অন্তর হ'তে শুরু হয় অস্তিত্বের চঞ্চল যাত্রার
নেপথ্যে অজ্ঞাত ছিলো নবতম সম্ভাবনা
  প্রেমের আবর্তে তা'র দীপ্ত উদ্ভাসন।

প্রণয়ের ক্ষেত্র হ'তে আগুন জ্বলিয়া উঠে আত্মার ইঙ্গিতে
প্রণয় কহিলো তা'রে প্রভাময় কর তুমি বিশ্বের প্রান্তর,
বঙ্কিম কৃপাণে কভু প্রেম ত্রস্ত নয়
পানি হ'তে, বায়ু হ'তে অথবা মৃত্তিকা হ'তে তা'র জন্ম নয়।
শান্তি আনে অথবা সংঘাত হানে
জীবনের উৎস গড়ে
অথবা তুলিয়া ধরে মৃত্যুর সঙ্গিন
প্রেমের দৃষ্টিতে কাঁপে পাষাণের সুদৃঢ় প্রাঙ্গণ

বিভুপ্রীতি সর্বশেষে হ'য়ে যায় স্রষ্টা সর্বময়।
শিখে নাও প্রণয়ের রীতি।
সান্নিধ্যে পাইবে প্রিয়তম ঃ
আয়ূবের মতো হোক্ তোমার অন্তর
নূহের মতোন হোক্ তোমার নয়ন!

তোমার মুষ্টিতে বদ্ধ মৃত্তিকার কণাগুলি
    হোক্ সর্বময়
আদর্শ সাধকে তুমি প্রণতি জানাও।
রুমীর মতন তব প্রদীপ জ্বালাও
তাব্রিজের অগ্নি যে অঙ্গার করিয়া দেয় রুমের শহর।

তোমার অন্তরতলে প্রিয়তমা রয়েছে গোপনে
যদি তব দৃষ্টি থাকে
আর তাহা তীক্ষ্ণ হয়–
তবে সে দাঁড়াবে আসি নয়ন সম্মুখে।
যারা তা'র প্রীতিকামী তা'রা কান্তিময়
তাদের মোহন রূপ এড়ালো সংশয়!
তার প্রতি রহিয়াছে সেই ভালোবাসা
তাহার প্রভাবে হবে হৃদয় সুন্দর
আকাশ আনত হ'য়ে বরিবে পৃথ্বীরে।
সে–প্রভাবে দীপ্ত হ'ল সেই দেশ সেই তরুলতা
যেথা লাইলির প্রেমে আবেশে বিমুগ্ধ হ'ল
    বিরহী মজ্নুন।

যাহারা বিশ্বাসী আর যারা ধর্মানুগ
তাদের অন্তর হ'ল রসূলের ছায়া,
'মুহম্মদ'–শুধু এই নাম
আমাদের গৌরবের উৎস রচিয়াছে।
সিনাই পর্বত তাঁর গৃহাঙ্গন হ'তে আনা
    ধূলি দিয়ে গড়া।

কাবার গৃহের তীর্থ তাঁর বাসভূমি।
নিরবধি কাল তাও স্বল্প তাঁর সময়ের কাছে
অন্তরের ব্যাপ্তি হয় তাঁহার ইঙ্গিতে।
দূর্বাদল ছিল তাঁ র শয্যার আসন—
কত খসৃরুর তাজ তাঁ র অনুগামীদের পায়ে
হেলায় লুটায়।

রাত্রির গভীরে প্রভু রচিলেন ধ্যানাসন হেরার গুহায়
একটি রাজত্ব আর নিয়ম–শৃঙ্খলা আর ন্যায়ের ভাষ
গড়িলেন সহজ প্রয়াসে।
কত রাত্রি কেটে গেল বিনিদ্র নয়নে—
অশেষ অনেক রাত্রি
ইরানের সিংহাসন যেন হয় বিশ্বাসীর
এই ছিলো তাঁহার সাধনা।
যুদ্ধের মুহূর্তে তাঁর তরবারী আলোড়নে
লৌহ হ'তে গলিত তরল;
ধ্যানের মুহূর্তে তাঁর নয়নের কেন্দ্র হ'তে—
ঝরিত বৃষ্টির মতো অশ্রু অবিরল।
আল্লার সাহায্য চেয়ে তাঁহার প্রার্থনা শুনি'
তরবারী উচ্চারিল আমিন, আমিন
সংহার করিল তাহা বহু নৃপতির শির
যা'রা ছিলো ন্যায়হীন অন্ধ ধর্মহীন।
অনেক নতুন নীতি—
অনেক নিয়ম
মৃত্তিকার পৃথিবীতে এলো তাঁর বাণী নিয়ে
রচিল অক্ষয় দাবী;
প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলি শেষ হ'ল তাহার ইঙ্গিতে।
বিশ্বের গবাক্ষ তিনি খুলিলেন ধর্মের আভায়
ধরণীতে আসে নাই কেহ তা'র সমকক্ষ সমান আসনে
তাঁহার দৃষ্টিতে কভু উচ্চ নীচ ভেদাভেদ নাই,
একাসনে ব'সেছেন গোলামের সাথে।

হাতেম তায়ের কন্যা যুদ্ধে বন্দী হ'য়ে
আসিলেন প্রভুর সম্মুখে;
পদদ্বয় শৃঙ্খলিত শিরোদশ আবরণহীন
মস্তক আনত তা'র লজ্জার প্রশ্রয়ে।
আপনার উত্তরীয়ে নবী সেই বিনীতা কন্যার
রচিলেন আবরণ।
তায়ের কন্যার চেয়ে আমরা আরও নগ্ন,
বিশ্বের সবার সম্মুখে
আমাদের আভরণ নাই–
নাই কোন আচ্ছাদন লজ্জা ঢাকিবার।
শেষ বিচারের দিনে প্রভু আমাদের
রক্ষা করিবেন।
এ বিশ্বেও তিনি আমাদের
প্রথম, শেষের আর একান্ত আশ্রয়।

তাঁর ভালোবাসা আর তা'র ঘৃণা ক্রোধ–
সব তাঁর করুণার দান;
কোনোটা বর্ষিত হয় বন্ধুদের প্রতি
কোনোটা প্রযোজ্য হয় শত্রুদের প্রতি।
শত্রুর জন্যও প্রভু খুলিলেন করুণা–কপাট
কাবার শহর মক্কা রক্ষা পেল রোষবহ্নি হ'তে।
আমরা দেশের কোন সীমা চিনি নাই
দুইটি নয়ন হ'তে একক রশ্মির মতো আমরা সবাই।
হেজাজ, ইরান, চীন সব আমাদের
আমরা তা'দের,
তবুও আমরা সবে শিশির বিন্দুর মতো
হাস্যময় একটি উষার।
আমরা আচ্ছন্ন সবে মক্কার পাত্রধারীর দৃষ্টির ছায়ায়
আমরা একতাবদ্ধ মদ্য ও পাত্রের মতন।
প্রত্যেকের ভিন্ন সত্তা, বিশিষ্ট বংশের ভারা
সব তিনি চূর্ণ করিলেন

আঁহার অগ্নিতে জ্বলি' ভস্ম হ'ল জীবনের
তুচ্ছতম জীবনের সকল সঞ্চয়।

আমরা ফুলের মতো অনেক পাপড়িযুক্ত
অথচ মোদের প্রাণে একটি সুরভি;
তিনি এই সমাজের ছিলেন অনন্য আত্মা
তার তিনি যাপিলেন সর্বরূপে একক জীবন।
মোরা তার অন্তরের সুগোপন গূঢ়তথ্য;
দ্বিধাহীন কণ্ঠে তিনি জানালেন আপন ভাষণ,
আর এই পৃথিবীতে পরিব্যাক্ত হইলাম আমরা সবাই।
আমার নীরব বাঁশী পরিপূর্ণ তাঁর জন্য
তাঁর প্রতি নির্দেশিত প্রণয়-সঙ্গীতে,
আমার অন্তরে কাঁপে সহস্র সুরের রেশ।
নিবেদিত চিত্ত হ'তে যে-ভক্তি উচ্ছ্বিত হয়
ব্যক্ত তাহা হইবার নয়।
একটি নীরস কণ্ঠ কেঁদেছিলো তাঁর জন্য বিয়োগ ব্যথায়।
সত্যাশ্রয়ী মুসলিম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়
রসূলের গৌরবের বিচ্ছুরিত রশ্মিগুলি নিয়ে;
অনেক সিনাই চূড়া গড়া হ'য়েছিলো
তাঁহার পথের ধূলি নিয়ে।
তাঁহার দর্পণ হ'তে গড়া হ'ল আমার মূরতি
তাঁহার বক্ষের সূর্যে দীপ্ত হ'ল আমার প্রভাত।

আমার বিশ্রামে আছে অনন্ত সংঘাত,
আমার সন্ধ্যায় আছে অনেক উষ্ণতা
শেষ বিচারের ঊষা যার কাছে অনেক মলিন
তিনি দিবসের মেঘ আর আমি নিকুঞ্জ তাঁহার
আমার দ্রাক্ষার কুঞ্জ সিক্ত হ'ল তাঁহার বর্ষায়।
প্রেমের ভূমিতে আমি রোপিলাম আমার নয়ন
অন্তরের দৃষ্টি মোর তীক্ষ্ণ হ'ল

খুব তীক্ষ্ণ হ'ল।
দুইটি জগত হ'তে মদিনার মাটি মধুময়
যেখানে তাঁহার বাস ধন্য সে নগরী!

জামির রচনারীতি আমারে অনেকবার মুগ্ধ করিয়াছে
আমার আচ্ছন্ন ভাষা বিশুদ্ধ হ'ল
তাঁহার কৃপায়।
উচ্ছ্বসিত আদর্শের অনেক ইঙ্গিত আছে
তাঁহার বাণীতে
প্রভুর প্রশংসা করি গেঁথেছেন কাব্যের মালিকা–
"মুহম্মদ এ–বিশ্বের মহাগ্রন্থে' ভূমিকাস্বরূপ
সমস্ত জগৎ–ভূমি বিনীত তাঁহার কাছে
দাসের মতন–
তিনি সকলের প্রভু।"
প্রেমের শরাব হ'তে উচ্ছ্বসিত হয় বহু আত্মিক ক্ষমতা;
প্রেমের নীতিতে আছে অন্ধ উপাসনা।
বোস্তামের বায়েজিদ একটি বিশেষ ফল গ্রহণ করিতে
নিরত হ'লেন
কেননা তাঁহার মনে এ–সন্দেহ দৃঢ়তর হ'ল
হয়তো বা এই ফল আসেনি প্রভুর প্রয়োজনে।

দ্বিধাহীন উপাসক হও তুমি প্রিয়ার নিকট–
স্রষ্টার সান্নিধ্য পাবে নিশ্চিন্ত এ–বন্দনার পথে।
অন্তরের হেরা–গুহা হোক ক্ষণিকের লাগি তোমার আশ্রয়
আত্ম পরিহার করি 'যাও তুমি স্রষ্টার সন্ধানে।
স্রষ্টার প্রভাব হ'তে শক্তিমান হইয়া আবার
ফিরে এসো আপনার অন্তরের কাছে;
ভেঙ্গে ফেলো তাহাদের শির
কামনার অন্ধকূপে যাহারা আচ্ছন্ন রহিয়াছে।
প্রেমের সামর্থ্যে তুমি যোদ্ধৃ বৃন্দ কর সংগঠন
আপনারে ব্যক্ত কর প্রণয়ের কাছে
যে প্রেম আকাশচুম্বি পর্বতের মতো।

আমাদের মহাপ্রভু স্রষ্টা জ্যোতির্ময়
তোমারে উদ্দেশ্য করি জানালেন মহাগ্রন্থে ভাষণ অক্ষয়,
"আমার প্রতিভূ আমি ধরণীতে করিব নিয়োগ।"

আস্‌রারে খোদী

সৈয়দ আবদুল মান্নান

[কাব্যের সত্যিকার প্রকৃতি ও ইসলামী সাহিত্যের সংস্কার সম্বন্ধে।]

আকাঙক্ষা মানব-দেহে প্রবাহিত করে উত্তপ্ত শোণিত,
আকাঙক্ষার প্রদীপে প্রজ্বলিত হয়
এই ধূলি-কণা।
আকাঙক্ষা দ্বারা জীবনের পিয়ালা পূর্ণ হয়
সুরা-রসে কানায় কানায়,
যেনো জীবন চঞ্চল হয়ে ওঠে,
চলমান হ'য়ে ওঠে চপল গতিতে।
জীবন পূর্ণ হ'য়ে ওঠে শুধু বিজয়ে,
আর বিজয়ের আকর্ষণ হোল আকাঙক্ষায়।
জীবন হোল শিকারী আর আকাঙক্ষা তার ফাঁদ,
আকাঙক্ষা প্রেমের সুসংবাদ
সুন্দরের কাছে।

কি কারণে আকাঙক্ষা জাগিয়ে তোলে
জীবন-গীতির সংগীত-রাগ?
যা' কিছু শ্রেয়, যা' কিছু মনোরম, যা' কিছু সুন্দর,
তা'ই আমাদের পথ-প্রদর্শক
আকাঙক্ষার গহন অরণ্যে।
মূর্তি তার অংকিত হয় তোমার অন্তরে,
সৃষ্টি ক'রে তোলে আকাঙক্ষা
তোমার অন্তর-তলে।
সুন্দর হোল আকাংখার ভরা জোয়ারের স্রষ্টা,
আকাঙক্ষা লালিত হয়
সৌন্দর্য-প্রকাশে।
সৌন্দর্য অবগুণ্ঠন-মুক্ত হয় কবির অন্তরে,
সৌন্দর্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়
তার সিনাই থেকে।

দৃষ্টিতে তার সুন্দর হ'য়ে ওঠে সুন্দরতর,
প্রকৃতি প্রিয়তর হয়
তার যাদুতে।
বুলবুল্ শিখেছে তার সংগীত তার মুখ থেকে,
রঙে তার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে
গোলাবের গণ্ডদেশ।
অনুরাগ তার দগ্ধ করে পতংগের অন্তর,
সে-ই তো লাগিয়ে দেয় উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা
প্রেম-কাহিনীতে।
সমুদ্র ও পৃথিবী আছে লুক্কায়িত
তার জল ও কর্দমে,
শতেক নবীন বিশ্ব আছে লুক্কায়িত তার অন্তরে।
যখন প্রস্ফুটিত হয়নি তার মস্তিষ্কে কুসুম-রাজি,
শ্রুত হয়নি কোনো আনন্দ বা ব্যথার সংগীত।
সংগীত তার এনে দেয় এক অপূর্ব সম্মোহন
আমাদের উপর,
লেখনী তার টেনে আনে পর্বতকে একটি মাত্র চুলের সাথে।
চিন্তাধারা তার বিরাজ করে
চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজির সাথে,
সে সৃষ্টি করে সৌন্দর্য আর জানে না
কুৎসীত কি।
সে একজন খিজ্‌র,
অন্ধকারের ভেতরে আছে তার
আবে-হায়াত :
অশ্রুতে তার আরো জীবন্ত ক'রে তোলে
অস্তিত্বশীল পদার্থকে।
ধীর পদক্ষেপে চলি আমরা অনভিজ্ঞ নবিশের মতো,
হোঁচট খেতে খেতে গন্তব্য পথের উপর।

বুল্‌বুল্‌ তার বাজিয়েছে একটি সুর
আর পেতেছে মন্ত্রণাজাল আমাদেরকে প্রতারিত করতে
যেনো সে চারিত করতে পারে আমাদেরকে
জীবনের ফির্‌দাউস্‌-ভূমিতে,
আর যেনো জীবনের ধনুক হোতে পারে
একটি পূর্ণ চক্র।

কাফেলা অগ্রসর হয় তার ঘন্টাধ্বনিতে
আর অনুসরণ করে তার বংশীর আওয়াজ,
যখন তার মন্দবায়ু প্রবাহিত হয় আমাদের বাগিচার উপর দিয়ে,
প্রবিষ্ট হয় তা' গুল্ম ও গোলাবরাজির বুকে
ধীরে সন্তর্পণে।
তার যাদুমন্ত্র জীবনকে ক'রে তোলে আত্ম-বর্ধিষ্ণু,
সে হ'য়ে ওঠে আত্মজিজ্ঞাসু ও চঞ্চল।
সে সারা বিশ্বকে করে নিমন্ত্রণ
তার জিয়াফতে ;
সে অপব্যয় করে তার অগ্নি,
যেনো তা' সুলভ বাতাসের মতো।
ধিক্‌ সেই সব জাতিকে,
যারা আত্মসমর্পণ করে মৃত্যুর কাছে,
আর যাদের কবি তাদেরকে সরিয়ে নেয়
জীবনের আনন্দ থেকে।
দর্পণ তার প্রকাশ করে সৌন্দর্যকে
কুৎসীতরূপে,
মকরন্দ তার দিয়ে যায় শতেক দংশন
অন্তরের মাঝে।
চুম্বন তার বিনষ্ট করে গোলাবের সজীবতা,
বুল্‌বুলের অন্তর থেকে সে ছিনিয়ে নেয়
উ'ড়ে বেড়ানোর আনন্দ।
স্নায়ু তোমার দুর্বল হ'য়ে আসে
তার অহিফেন নেশায় ;

তোমার জীবনের বিনিময়ে
দেও তুমি তার সংগীতের মূল্য।
সে আনন্দের সাইপ্রেস্ বৃক্ষকে করে
সৌন্দর্য–বঞ্চিত,
শীতল নিশ্বাস তার শিকারে পরিণত করে
শ্যেনপক্ষীকে।

মৎস্য সে,
বক্ষ থেকে উপর তার মানবাকৃতি,
সমুদ্র–বিলাসিনী নারীর মতো।
সংগীত সে যাদু করে নাবিককে,
আর টেনে নেয় তরণী
সমুদ্রের তলদেশে।
দুঃখ–সংগীত তার হরণ করে দৃঢ়তা
তোমার বুক থেকে,
যাদুমন্ত্র তার জানিয়ে দেয় তোমায়,
মৃত্যুই জীবন।
তোমার অন্তর থেকে সে হরণ করে নেয়
অস্তিত্বের আকাঙক্ষা,
বাহির ক'রে নেয় অত্যুজ্জ্বল 'লাল'
তোমার খনি থেকে।
লাভকে সে সজ্জিত করে ক্ষতির পরিচ্ছদে
প্রশংসাভাজনকে ক'রে তোলে সে নিন্দনীয়।
নিমজ্জিত করে সে তোমায় চিন্তার সমুদ্রে,
সরিয়ে দেয় তোমায় কর্ম থেকে দূরে।
পীড়িত সে,
কথায় তার বর্ধিত হয় আমাদের পীড়া ঃ
যতোবার তার পিয়ালা আসে ঘু'রে,
পীড়াগ্রস্ত হয় সব পানকারীরা।
বসন্তে তার নেই কোনো বিদ্যুৎচমক, আর বৃষ্টি,
বাগিচা তার বর্ণ ও গন্ধের মরীচিকা।

সৌন্দর্যের তার নেই কোনো সম্বন্ধ সত্যের সাথে,
নেই কিছু ভগ্ন মুক্তা ছাড়া
তার সমুদ্রে।
তন্দ্রাকে সে মনে করতো মধুরতর,
নিশ্বাসে তার নির্বাপিত হ'য়েছিলো
আমাদের অগ্নি।
তার বুল্‌বুলের সংগীতে
বিষাক্ত হ'য়েছিলো আত্মা ;
তার গোলাবের আস্তরণের নীচে
লুকিয়েছিলো এক ভূজংগ।
সতর্ক হও তার সোরাহী আর পিয়ালা সম্বন্ধে!
সাবধান তার অত্যুজ্জ্বল সুরায়!
ওগো, তোমরা–যারা অবনমিত হয়েছো
তার সুরা–রসে,
আর যারা নিবদ্ধ করেছো দৃষ্টি তার গেলাসে
নব পূর্বাশার আশায়,
যাদের অন্তর হিম করে দিয়েছে
তার দুঃখ–সংগীত,
তোমরা পান করেছো তীব্র হলাহল
কর্ণ দিয়ে।
তোমার জীবনের গতিধারাই হচ্ছে প্রমাণ
তোমার অধঃপতনের,
যন্ত্রের তন্ত্রী তোমার সুর–হীন!
পেটুকের শান্তিপ্রিয়তা ক'রে তুলেছে তোমায় হতভাগ্য'
একটা অবমাননা ইস্‌লামের
সারা বিশ্বের বুকে।
অন্ধ ক'রে দিতে পারে তোমায় কেউ
একটা গোলাবের শিরা দিয়ে,
মৃদু বায়ে করতে পারে তোমায় আহত।
প্রেম লজ্জিত হয়েছে তোমার বিলাপে,
সুন্দর ছবি তার বিকৃত হয়েছে

তোমার তুলিতে।
তোমার পীড়া বিবর্ণ করেছে তার গণ্ডস্থল,
তোমার শীতলতা হরণ করেছে ঔজ্জ্বল্য
তার অগ্নির।

সে হয়েছে অন্তর–পীড়াগ্রস্ত
তোমার অন্তর–পীড়া থেকে;
আর দুর্বল হয়েছে তোমার দুর্বলতায়।
পিয়ালা তার পূর্ণ শিশুর অশ্রুতে ;
গৃহ তার ভরপুর দুর্ভাগ্যের হতাশ্বাসে।
মাতাল সে, ভিক্ষা মাগছে মদ্যশালার দ্বারে,
চুরি ক'রে সুন্দরীদের দৃষ্টি,
জাফরীর ফাঁক দিয়ে'
অসুখী, অবসন্ন আহত,—
প্রহরীর পদাঘাতে মৃত্যুর দ্বারে পতিত,
নলের মতো বিনষ্ট দুঃখে,
মুখে তার সহস্র অভিযোগ
খোদার বিরুদ্ধে।

তোষামোদ আর আক্রোশ হোল উপাদান তার দর্পণের
অসহায়তা তার পুরাতন সংগী ;
এক শোচনীয় নীচ তাবেদার,
নেই যার কোন মূল্য, আশা অথবা উদ্দেশ্য,
বিলাপ যার অপহরণ করেছে তোমার আত্মার সার
আর বিদূরিত করেছে শান্তির নিদ্রা
তোমার প্রতিবেশীর আঁখি থেকে।
দুর্ভাগ্য সেই অগ্নির যা' গেছে নির্বাপিত হ'য়ে,
প্রেম—যা' জন্ম নিয়েছিলো পবিত্র ভূমিতে
আর মরেছে বোৎ–খানায়!

ওগো, কবিত্ব–ধন থাকে যদি তোমার ভাণ্ডারে,
ঘর্ষণ করো তা' জীবনের পরশ–পাথরে!
অনাবিল চিন্তাধারা প্রদর্শন করে
কর্মের পথ,
যেমন বিদ্যুৎ–চমক অগ্রগামী হয় বজ্রের!
যোগ্য কর্‌বে তা' তোমার সুষ্ঠু সাহিত্য–সৃষ্টির,
যোগ্যতা দেবে ফি'রে যেতে আরব–ভূমিতে ;
অন্তর তোমার দিতে হবে
সাল্‌মা আরাবীকে,[১]
যেনো হেজাযের পূর্বাশা জন্ম নেয়
কুর্দিস্তানের তিমির–রাত্রি থেকে।[২]

গোলাব আহরণ করেছ তুমি
পারস্যের গুল্‌–বাগিচা থেকে
আর দেখেছো হিন্দুস্তান আর ইরানের ভরা জোয়ার
এখন অনুভব করো একবার
মরুভূর প্রচণ্ড তাপ ;
পান করো একবার প্রাচীন খর্জুর–সুরা!

পেতে দাও একবার তোমার মস্তক
তার তপ্ত বক্ষে,
পেতে দাও তোমার নাঙা দেহ তার উত্তপ্ত হাওয়ায়!
দীর্ঘকাল শায়িত ছিলে তুমি
রেশমের আস্তরণে ;
অভ্যাস করো এবার অমসৃণ তুলার বিছানা!

১· আরবী কাব্য সাধারণতঃ একটি প্রস্তাবনা নিয়ে শুরু করা হয় এবং তা'তে কবির প্রেমাস্পদের উল্লেখ থাকে, অনেক সময় তার নাম দেওয়া হয় সাল্‌মা। এখানে 'সাল্‌ম আরাবী' বল্‌তে ইস্‌লামী সাহিত্যের ও ধর্মের আদর্শ বোঝায়।

২· এক অজ্ঞ কুর্দ ছাত্রদের কাছে সুফিবাদ সম্বন্ধে উপদেশ চেয়েছিলো। তারা বল্‌লো যে, তাকে একটা দড়ি উপরে বেঁধে তার অপর দিকে পা' বেঁধে ঝুল্‌তে হবে এবং তাদের শেখানো কথা আবৃত্তি কর্‌তে হবে। সে বুঝ্‌লো না যে, তাকে প্রতারিত করা হয়েছে। সে তাদের কথামতো কাজ কর্‌লো। আল্লাহ্‌ তার ঈমানকে পুরস্কৃত কর্‌লেন। তার অন্তর আলোকিত হোল। সে এমন জ্ঞান লাভ কর্‌লো যে, বহু উচ্চ আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা করতো। সে বল্‌তো,—"সন্ধ্যায় আমি ছিলাম কুর্দ পরদিন প্রভাতে হোলাম আরব।"

পুরুষানুক্রমে তুমি নৃত্য করেছো
সবুজের বুকে
আর ধৌত করেছো তোমার গণ্ডদেশ শিশির-জলে
গোলাবের মতো।
এখন নিক্ষেপ করো আপনাকে
জ্বলন্ত বালুরাশির উপরে,
নিমজ্জিত হও জম্‌জমের ঝরণায়!
আর কতোকাল বৃথায় চীৎকার করবে তুমি
বুল্‌বুলের মতো?
কতোকাল গড়বে তোমার আবাস বাগিচায়?
ওগো, ফাঁদে যাদের ধরা দেবে কল্পিত অমর পক্ষী,
বাঁধো নীড় উচ্চ পর্বতের শিখরে,
যে নীড় হবে বিদ্যুৎ আর বজ্রে ভরা
উচ্চতর ঈগলের নীড় অপেক্ষাও,
যেনো তুমি যোগ্য হোতে পার জীবন-যুদ্ধের,
যেনো তোমার দেহ আর আত্মা দগ্ধ হোতে পারে
জীবন-অনলে।

নবীপ্রেম

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

এক

প্রেম শেখ্ আর পরাণপণে প্রেমপাত্র এক কর্ সন্ধান,
সন্ধান কর্ নূহের চক্ষু, আইয়ুব নবীর হৃদয়খান।
একটি মুঠা ধূলিরে তুই দে বানায়ে পরশ পাথর,
পূর্ণ নরের আবাসখানি ভক্তিভরে চুম্বন কর।
আমিত্বের ঐ প্রদীপটিকে রুমীর মত দে জ্বালায়ে,
তব্রীযেরী আগুন দিয়ে রূমেরে তুই দে পোড়ায়ে।
হিয়ার মাঝে প্রেমপাত্র এক গুপ্ত আছে তোর যে ওরে,
থাকে যদি চক্ষু দুটি দেখিয়ে দিতে পারি তোরে।
তাহার তরে প্রেমিক যে জন সুশ্রী হতে সুশ্রীতর,
রম্যতর, সুন্দরতর, প্রিয় হতে প্রিয়তর।
প্রেমেতে তাঁর হৃদয় সকল হয়ে ওঠে শক্তিমান,
ধূলির কণা উর্ধ্বে গিয়ে মৃত্তিকারই হয় সমান।
নজ্‌দের ধূলি প্রসাদে তাঁর হয়ে গেল বুদ্ধিমান,
ভাবাবেগে ছড়িয়ে গেল উর্ধ্বদিকে সাত আসমান।
মুসলেমেরি হৃদয়খানি মুস্তফার যে বাসস্থল,
মুস্তফারি নামে তাদের মুখ হয়েছে সমুজ্জ্বল।

কালামে ইকবাল

মুফাখখারুল ইসলাম

ছাড় ভয়, ছাড় দুঃখ, ছাড় অনুতাপ,
পাথরের মত হও তুমি কঠিন—
তা হ'লেই হ'বে তুমি হীরক।
যে-ই করবে কঠিন সংগ্রাম
আর বজ্রহাতে ধরবে তলোয়ার
দোনো জাহান আলোকিত হবে তার নূরে।
'সঙ্গ্-ই-আসোয়াদ'-যা শোভা পাচ্ছে কাবা'র ঘরে
সে ত কিছুই নয়!– মূলে সে ত এই মাটি!
অথচ দেখ তার মর্যাদা!
সিনাই পাহাড়ের চেয়েও বেশি তার মান।
সাদা-কালো সব মানুষই দেয় তারে চুম্বন!
কঠোরতার মধ্যেই নিহিত আছে জীবনের গৌরব।
দুর্বলতা আর অপরিপক্কতা—
এই হ'ল জীবনের ব্যর্থতার মূল কারণ।

তিনটি কবিতা

আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী

ঈমান

'লা–ইলাহা ইল্লাল্লার' রশ্মি আছে বুকে যতক্ষণ
পারবে সহজে তুমি পিষে যেতে অনায়াসে সকল
ভীতির আক্রমণ।
নিষ্কম্প আত্মার মতো আল্লাতে বিশ্বাস যার পরিপূর্ণ;
তনুর মাঝারে
হয় না সে নত শির, হয় না সে ত্রস্ত কোন
বিভ্রান্ত শক্তির অহংকারে।
পত্নী আর সন্তুতির মোহ থেকে মুক্ত সেই জন
সংযত, খোদার রাহে পারে সে কোরবানী দিতে
পুত্রকে আপন।
হয়তো সে সঙ্গীহীন, শক্তিমান তবুও সে পূর্ণ
এক বাহিনীর মতো—
মূল্যহীন তার কাছে প্রশ্বাস বায়ুর চেয়ে জিন্দেগানী
মুক্ত, অনাহত।

শৃঙ্খলা

সুরভিত হয় বায়ু বন্দী হলে কুসুমের বুকে,
সুরভিত হয় মেশ্‌ক বন্ধ হয়ে নাভিমূলে কস্তুরী মৃগের,
আকাশে সিতারা চলে প্রাকৃতিক বিধানের নিচে নতমুখে,
জেগে উঠে তৃণদল মেনে পন্থা ক্রমবর্ধনের।
অশেষ দহনে জ্বলে আলোক বিলায়ে চলা ধর্ম প্রদীপের,
শিরায় শিরায় চলা নৃত্যপরা ধর্ম শোণিতের,
ঐক্যের বিধানে ক্ষুদ্র বারিবিন্দু হয় এক সমুদ্র উত্তাল;
ঐক্যের বিধান মেনে ক্ষুদ্র বালুকণা হয় অন্তহীন সাহারা বিশাল।

আইনের আনুগত্য যদি আনে এইভাবে শক্তি অফুরান,
শক্তির উৎসকে তবে কেন করো অবহেলা ক্লান্ত ভীরু প্রাণ।

মর্দে মোমিন

নেমে এসো তুমি আজ অদৃষ্টের আরোহী–সওয়ার!
নেমে এসো দীপ্ত শিখা যুগান্তের, পরিবর্তনের;
দীর্ঘ করে যাও তুমি আমার সঘন অন্ধকার;
আলোকিত করে তোল দৃশ্য অস্তিত্বের।
স্তব্ধ করে দাও তুমি সমস্ত জাতির কোলাহল,
জান্নাতের মাধুরীতে উঠুক সম্পূর্ণ হয়ে সুরধারা মুক্ত
প্রাণোচ্ছল।
ওঠো, জাগো মুক্ত প্রাণ আবার বাজিয়ে যাও
সুমহান ভ্রাতৃত্বের সুর,
প্রেমের সে পাত্র দাও ফেরায়ে সবার হাতে
(সুরার সুরাহি ভরপুর)
প্রশান্তির দিন ফের বয়ে আনো পৃথিবীতে আর একবার,
শান্তি–বাণী দিয়ে যাও যুদ্ধকামী মানুষের জীবনে আবার।
সমগ্র মানব জাতি শস্যক্ষেত্র যেন আর তুমি তার
পূর্ণাঙ্গ ফসল
জীবন যাত্রার পথে সংখ্যাহীন কাফেলার মঞ্জিল;
তুমি সে লক্ষ্যস্থল!
হৈমন্তী শাসনে ঝরা পত্র দলে এসো তুমি বসন্তের মত,
নিয়ে যাও আমাদের প্রেমপ্রীতি হৃদয়ের, মুক্ত, অনাহত।
যে সম্মান আমাদের সে শুধু তোমারি ঋণ—
(ওগো অন্যমনা),
নীরবে আনত মুখে বয়ে যাই আজ মোরা জীবনের
ব্যথা ও বেদনা।

সাকী

জাহানের রূপ ফিরেছে দেখো গো সাকী
তারকার গতি হয়েছে তীব্রতর;
হে সাকী, প্রতিটি অণুর মনেতে জাগে
চারিভিত ভরে কিয়ামতি একস্বর।
আল্লাহওয়ালার দান্ ও ইলেম–ধন
বিল্‌কুল বুঝি লুপ্ত হয়েছে, হায়!
হে সাকী, এ কোন্ ইশারা যে মাশুকের
রক্ত–ঝরানো,–বুঝা যে হইল দায়!
সেই যে আমার পুরানো বিমার ফের–
মনের খেয়াল, চিত্তের চপলতা,
হে সাকী, তাহার ওষুধ নাহিক কিছু
আনন্দ–ঢালা রঙিন মধুর ব্যথা।
হেরেমের দিলে আরজুর জ্বালা কভু
জাগে না জীবনে, নাহি তা'তে সংশয়;
হে সাকী, তোমার পয়দায়ী আজো হায়
রহস্য মাঝে কোথা যে মিশিয়া রয়।
আজমের লালা ফুলের বাগান হতে
ফের কোন রূমী জাগিল না আজো, হায়
সাকী, হায়, আছে ইরানের পানি মাটি–
সেই তাবরীজ এখনো ত আছে তায়।
না–উমেদ নহে ইকবাল কোনোদিন
নিজের বিরানা জমিন হইতে কভু,
হে সাকী, একটু আর্দ্রতা যদি লভে
এ মাটি অনেক উর্বর হবে তবু।
পথের ভিখারী কে তারে বলিল, হায়!
শাহানশাহীর গূঢ় রহস্যমূল,
হে সাকী, তোমার রাগিণীর মাধুরিমা–
ভে পরভেজের দৌলৎ সমতুল।

[আসরারুর খুদী]

আসরার-ই-খুদী

আঃ কাঃ শঃ নূর মোহাম্মদ

দীর্ঘতনু সাইপ্রাস গাছের মতনঃ
তরুণ যুবক এক 'মরড' নগর হতে লাহোরে এলেন,
দুশমনের বাহুবলে উৎপীড়িত মন,
প্রাণের মুর্শিদে তার দেখতে গেলেন।
মনের আঁধার মুছে প্রাণময় সূর্য রশ্মি জাগে,
"শিক্ষা দাও ওগো গুরু"– মুর্শিদে বলেনঃ
"আমি আছিঃ কাঁচের মতোন একা পাথরের মাঝে,
বলো বলো, কিভাবে কাটাব আমি এ মোর জীবন?"
বিশাল আয়ত আঁখি, প্রেম যার চরিত্র গৌরব,
জ্ঞানী, পথপ্রদর্শক–
চারিদিক ছেয়ে যার সৌন্দর্য সৌরভ,
নয়ন পল্লব তুলি কহিলেন যুবকের প্রতিঃ
তুমি তো জান না এই জীবনের সংগীতের গতিঃ
তুমিতো ঘুমন্ত শক্তি–
জেগে ওঠো শুধু একবার।
তুমিতো পাথর হয়ে কাঁচ বলে দাও পরিচয়
তাই তুমি কাঁচ আমি–ভঙ্গুর, বিভ্রান্ত, পেলে ভয়।
হে পথিক। নিজেকে দুর্বল বলে–
করো না, করো না কভু দস্যু হাতে আত্মসমর্পণ,
পানি আর কাদা বলে নিজেকে ভাবছো কেন
কেন ছোট করে ফেল মন?
এই হীনমন্যতায় কতকাল কাটাবে জীবন!
তোমার কর্দম হতে সৃষ্টি কর জ্বালাময় নতুন সিনাইঃ
শক্তিমান মানুষের প্রতি তুমি ক্রুদ্ধ কেন হও?
শত্রুর বিরুদ্ধে কেন অভিযোগ–বাণী মুখে বও?
'দুশমন' তোমার বন্ধু সত্য কথা তোমাকে জানাই
হামেশা অস্তিত্ব তার
গৌরবের শাহী তাজ তোমারে পরায়।
যে জন পেয়েছে কভু আত্মার সংগ্রাম থেকে স্বাদ;
সেই জন মনে করে–
শক্তিমান দুশমনেরে
আল্লার অপূর্ব আশীর্বাদ।

রমূযে বেখূদী

رموز بیخودی

নির্বাচিত রুদাকি

[illegible]

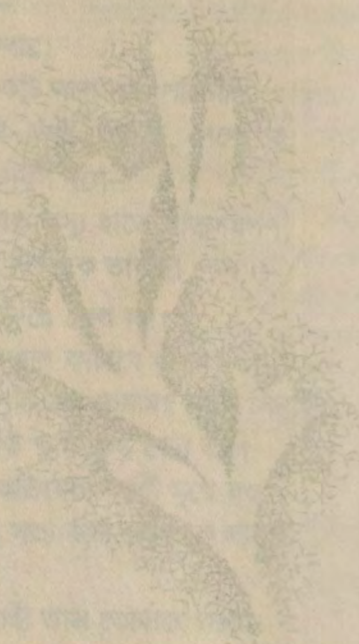

খুদী ও মিল্লাত
গোলাম মোস্তফা

রহমৎ সে–মিল যদি হয় খুদীর সাথে মিল্লাতের
মিল্লাতেতেই সার্থকতা খুদীর আপন জওহরের।
জামাত সাথে মিল রাখ তাই যে–তক তোমার সাধ্য হয়,
আযাদ মুসলমানের শোভা এই মিলনেই–সে নিশ্চয়ই।
মুহম্মদের বাণী শোনো–যাদুর কালাম জিন্দিগীর;
শয়তান সে জামাত দেখে পালায় দূরে–নোয়ায় শির।
ব্যক্তি এবং সমাজ এরা পরস্পরের আর্শি ভাই,
ছায়াপথের তারার মত একই সাথে রয় সবাই।
ব্যক্তি লভে সমাজ থেকেই আসন তাহার মর্যাদার,
সমাজ লভে ব্যক্তি থেকেই শৃঙ্খলা ও শক্তি তার।
ব্যক্তি যখন সমাজ মাঝে গুম হয়ে যায়–বিলায় প্রাণ,
সিন্ধু–মাঝে বিন্দু সম হয় সে বিশাল শক্তিমান।
অতীত দিনের কীর্তিমালা রক্ষা করে এই সমাজ,
অতীত এবং ভবিষ্যতের মুখ দেখা যায় এর–ই মাঝ।
অতীত এবং ভবিষ্যতের মিলন ঘটে মিল্লাতে,
ইবতিদা ও ইনতিহা–হীন রয় সে আবাদ তাই তাতে।
মিল্লাতই দেয় খুদীর মনে নূতন আশার স্বপ্ন সাধ,
খুদীর কাজের জবাবদিহি মিল্লাতই লয় যে নির্ঘাৎ।
দেহ এবং আত্মা তাহার মিল্লাতেতেই পুষ্ট হয়,
জাহির–বাতিন কিছুই তাহার কওম থেকে ভিন্ন নয়।
কওমেরই ভাষায় খুদী জানায় তাহার মনের ভাব,
পথ চলো সে লক্ষ্য করি বাপ–দাদাদের পায়ের ছাপ।
কওমেরই সংবেদনে ব্যক্তি লভে কুয়ৎ–বল,
ব্যক্তি এবং কওম তখন এক হয়ে যায়–রয় অটল।
ব্যক্তি নিজে মজবুত হয় সমষ্টিরই মাঝখানে,
সমষ্টি–সেও পুষ্টি লভে ব্যক্তিত্বের কল্যাণে।
ছন্দে–গাঁথা কাব্য হতে শব্দ যদি বেরিয়ে যায়,
ভাব–ভাষা তার থাকে কি আর–অর্থ কিছুই হয় কি তায়?
শাখা হতে সবুজ পাতার দল যদি হয় ছিন্নমূল
সেই বাগিচায় ফুল–ফাগুনে বসন্ত কি ফোটায় ফুল?
জামাতের জমজমের পানি পান করেনি কণ্ঠ যার
সুরের আগুন নিভবে তাহার–বাজবে না আর বীণার তার।

একলা পথিক চলে যে, গাফিল সে ত' লক্ষ্যহীন
শক্তি তাহার ঝিমিয়ে পড়ে–ব্যর্থতাতে হয় বিলীন।
কওম থেকেই ব্যক্তি তাহার শৃঙ্খলা ও দীপ্তি পায়,
স্নিগ্ধ–নত হয় সে তখন–ঠিক যেন সে ভোরের বায়।
বিশাল তরু 'শামশাদ'–তার শক্ত শিকড় রয় তলে,
আযাদীরও পা বাঁধা ভাই তেমনি নিয়ম–শৃঙ্খলে।
পা বাঁধা যার শৃঙ্খলা ও আইন–কানুন–রজ্জুতে
হরিণ–সম হয় সে চপল মৃগনাভির খুশবুতে।
খুদী এবং বেখুদীতে ভেদ কোথা সে জানল না,
আঁধার তাহার কাটল না আর–আপনাকে সে চিনল না।
তোমার মাটির দেহের তলে রয়েছে ভাই দীপ্ত নূর,
সেই নূরেরই প্রকাশ তুমি–বাজাও তোমার আপন সুর।
সুখে সুখী দুখে দুখী তুমি যে ভাই মিল্লাতের,
তোমার জীবন ফল–স্বরূপ তোমার সমাজ বিপ্লবের।
আল্লাহ সে এক–অদ্বিতীয়–নাই শুবা তার তৌহীদে,
আমি–তুমি পাচ্ছি প্রকাশ তারই নূরের রোশনীতে।
নিজেই তিনি আশিক আবার নিজেই তিনি মাশুক হন,
কখনো প্রেম দান করেন, আর কখনো প্রেম ভিক্ষা লন।
তারি নূরের দীপ–শিখাতে মোদের জীবন দীপ্ত হয়,
একটি আগুন–ফুলকি পারে ছড়িয়ে যেতে জগতময়।
আযাদ তিনি–স্বয়ং স্বাধীন–বন্দী রূপেও প্রকাশ তার,
অংশ তাহার অংশ হয়েও শক্তি রাখে পূর্ণতার।
নিজের ভিতর দ্বন্দ্ব তাহার চলছে নিতুই–বেশ দেখি,
একই সাথে বাঁধা তাহার খুদী ও জিন্দেগী।
নিরাকারের মধ্য হতে রূপ ধরে–যেই অরূপ
বিরোধ এবং হাঙ্গামাতে ঠিকরে পড়ে তাহার রূপ।
'তিনি'–র মোহর অন্তরে তার পাচ্ছে প্রকাশ রাত্রি দিন,
শেষ কালেতে 'তুমি'ই থাকে 'আমি'ই নিজেই হয় বিলীন।
বাধ্য–বাধকতায় তাহার খর্বিত হয় ইখতিয়ার,
মুহব্বতের পুঁজিপতি হয় সে তখন চমৎকার।
অভিমান না ঘুচলে পরে প্রেমিক হওয়া যায় না ভাই,
আমার 'আমি' বিলিয়ে দিলেই হয় তখনি প্রেমের ঠাঁই।
জামাত মাঝে খুদী যখন বিলীন করে সত্তা তার,
গুলবাগে তার অমনি তখন ফুটে' ওঠে নওবাহার।
অসির মতো তীক্ষ্ম ধারাল আমার মুখের এই কালাম,
বুঝতে যদি না পারত' বিদায় বন্ধু লও সালাম।

রমূযে বেখূদী থেকে

আ. ক. ম. আব্দুল হক

[মাতৃত্বের উপরেই মানবজাতির সংরক্ষণ নির্ভরশীল : মাতৃত্বের সংরক্ষণ ও সম্মান ইসলামের নির্দেশ]

পুরুষ–যন্ত্র নারীর পরশে মধুর বাজে,
নরের গর্ব নারীর পূজায় দ্বিগুণ সাজে।
বসন–ভূষণ রমণী, নগ্ন নরের তরে,
প্রিয়ার সুষমা সজ্জা বোনে প্রিয়ের তরে।
শাশ্বত প্রেম লালিত তাহার অঙ্ক 'পর,
সুমধুর সুর বাজায় নারীর নীরব কর।
বিশ্ব যাহার সত্তা নিয়ে গর্ব করে,
নমায, সুরভি, নারীর সংগে স্মরণ করে।
সেই মুসলিম রমণীকে দাসী গণ্য করে,
কুরআনের জ্ঞান–বঞ্চিত দুর্ভাগ্য ভরে।
মাতৃত্ব সে আশীষ, যদি সত্য দেখ,
সংযোগ তার পয়গাম্বরীর সংগে দেখ।

মমতা মাতার, নবীর স্নেহ পুণ্যময়,
জাতির স্বভাব গঠন–কর্ত্রী সে অক্ষয়।
মাতৃত্ব সে পোখ্‌তা করে গঠন মোদের,
তার ললাট–রেখায় লিখিত থাকে ভাগ্য মোদের।

যদি অভিধান তব সত্য অর্থ ব্যাখ্যা করে,
'উম্মত' কথা নিগূঢ় মর্ম ধারণ করে।
'হও' 'তবে হলো' বাণীর লক্ষ যেজন বলে
উচ্চকণ্ঠে, "স্বর্গ মাতৃ–চরণ তলে।"
মাতৃ–গর্ভ সম্মানেতে সত্তা জাতির,
নচেৎ জীবন–ব্যাপার শুধু মিথ্যা ফিকির।
মাতৃত্ব সে তপ্ত রাখে জীবন–গতি,
মুক্ত করে জীবন–পথের গুপ্ত নীতি।
মাতৃ হ'তে মোদের স্রোতে বক্র গতি,
রচে আবর্ত ও উর্মি, বিম্ব তীব্র গতি।
ঐ যে মূর্খ চাষীর কন্যা গ্রাম্য নারী,
নিম্ন–বক্ষা, স্থূলাঙ্গিনী, কুরূপ–ধারী,

অমার্জিত, অশিক্ষিত স্বভাব যাহার
ইতর-দৃষ্টি, বাক্য-হীনা সরল-ব্যাভার
মাতৃত্বেরই বেদন-ঘায়ে রক্ত ক্ষরে
হৃদয় হতে, চোখের কোলে চক্র পড়ে।
মিল্লত যদি নেয় শিশু তার অংক হ'তে—
মুসলিম এক গর্বিত, ধীর সত্য পথে
বেদন তাহার অক্ষয় করে সত্তা মোদের,
সন্ধ্যা তাহার, বিশ্ব-দীপক প্রভাত মোদের।
শূন্য-ক্রোড়, তন্বী-দেহ অপর নারী,
ঘর-দুলালী, দৃষ্টি যাহার বিভ্রমকারী;
প্রতীচি প্রভায় ঝলসিত চিত, চিন্তা যাহার,
বাহ্যত নারী, নারিত্ব-হীন অন্তর যার,
দীপ্ত জাতির পুণ্য বাঁধন ছিন্ন করে,
ভুরু-বিভ্রমে কান্তি কলা ব্যক্ত করে।
ধৃষ্ট নয়ন, বিপদ ঘটায় মুক্তি তাহার,
লজ্জা-শরম-কুণ্ঠাবিহীন মুক্তি তাহার।
মাতৃত্ব-দায় পরিহার করে জ্ঞান তাহার,
দীপ্ত না হয় তারকা একটি সন্ধ্যায় তার।
এমন বিফল কুসুম কুঞ্জে মোদের না ফোটা শ্রেয়,
কুল-কলংক ধৌত করিয়া শুদ্ধি শ্রেয়।
তওহীদ-বাদী অসংখ্য ওই তারকা সম,
যুগের তিমিরে বন্ধ নয়ন অন্ধ সম।
নাস্তি হইতে করেনি বাইরে পদার্পণ,
'কেমন' 'কত'-র তিমির হতে বহির্গমন।
বর্তমানের অন্ধকারে লুপ্ত তারা,
মোদের যত দৃষ্টি-অতীত দীপ্তি-ধারা।
শিশির-বিন্দু রচেনি মুক্তা ফুল-পাতায়,
বিকশিত নয় পুষ্প-কোরক মলয়-ঘায়।
পুষ্পিত হয় সম্ভাবনার এ কুঞ্জবন।
মাতৃ-ক্রোড়ে ফুল্ল শিশু হাসে যখন।
সত্যদর্শী, নয় কো জাতির সত্য ধন
স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, মুদ্রা, অর্থ, পণ।
সুস্থ-সবল মানব তাহার শ্রেষ্ঠ ধন,

পরিশ্রমী, শক্তিশালী সরস মন।
ভ্রাতৃ বাঁধন–তত্ত্ব–রক্ষী মাতৃগণ,
জাতি ও কুরআন শক্তি–উৎস মাতৃগণ।

কেবলমাত্র 'ঈসার কারণে মরিয়ম–খ্যাতি
ত্রিবিধ কারণে মহিমান্বিতা ফাতিমা–খ্যাতি[১]
বিশ্ব–আশীষ পয়গাম্বরের নয়ন–মণি,
নবীন–প্রাচীন নবী–ওলীদের ইমাম যিনি।
বিশ্বে যেজন নূতন জীবন করেন দান,
সৃষ্টি করেন যুগের জন্য নব বিধান।
'এসেছে কি?'–এর মুকুটধারীর সহধর্মিনী,[২]
খুদার কেশরী, বিঘ্ন–নাশক, বাঞ্ছিত যিনি।
সম্রাট তিনি, পর্ণ কুটির প্রাসাদ তাঁর,
একটি অসি, একটি বর্ম সম্পদ তাঁর।
প্রেম–বৃত্তের মধ্য–বিন্দু–জননী তিনি,
প্রেম–পন্থীর যাত্রী–নায়ক–জননী তিনি।
পুণ্য হরম্–প্রদীপ শিখা তিনি অনন্য।
শ্রেষ্ঠ জাতির ঐক্য রক্ষী তিনি অনন্য।
যুদ্ধ–হিংসা–বহ্নি প্রবল নির্বাণ তরে।
রাজমুকুট ও আংটিকে সে বর্জন করে।

বিশ্বের সব সাধু–সজ্জন–শ্রেষ্ঠ তিনি,
স্বাধীন বিশ্ববাসীদের বাহু–শক্তি তিনি।
জীবন–গানের সংগীত রাগ হুসেন হ'তে,
সত্য–সাধক মুক্তি শিখে হুসেন হ'তে।
সন্তানদের স্বভাব–নীতি জননী হ'তে,
পবিত্রতা ও সত্যের মূল জননী হ'তে।
আত্ম–ত্যাগের ক্ষেত্র–ফসল ফাতিমা সতী,

১· ফাতিমা যাহ্‌রা (রা) হযরত মুহাম্মদ (স)–এর কন্যা, হযরত আলী (রাঃ)–এর স্ত্রী এবং ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের (রাঃ) মাতা।
২· সূরায় আল–ইনসান বা 'পূর্ণ মানব'–এর প্রতি ইঙ্গিত। কুরআন ৭৬ ঃ ১

জননীকুলের পূত আদর্শ ফাতিমা সতী।
অভাব-গ্রস্ত দুঃখীর ব্যথায় এতই কাতর
য়াহূদীর কাছে বিক্রয় করে নিজের চাদর।
যদিও জ্যোতির্ময়ী, বহ্নি-দেহী আজ্ঞাধীন,
সন্তোষ তার পতির সুখে পূর্ণ লীন।
শিষ্টতা তাঁর ধৈর্য-তুষ্টি লালন করে,
হাত পেষে যাঁতা, কণ্ঠ কুরআন পঠন করে।
তাঁর ক্রন্দন-বারি শিরোধান নাহি যাঞ্চা করে,
নমায আঁচলে মুক্তা-বিন্দু বর্ষণ করে।
মৃত্তিকা হ'তে জিব্‌রীল উহা সঞ্চয় করে'
খুদার 'আরশে শিশির-অর্ঘ্য অর্পণ করে।
খুদার কঠিন বিধান চরণ-শৃংখল মোর,
মহান নবীর কঠোর আদেশ, বারন ঘোর ;
নচেৎ করি পরিক্রমা সমাধি তাঁর,
সিজ্‌দা দিতুম পুণ্য সমাধি-ধূলায় তাঁর।

পর্দানশীন মুসলিম নারীদের প্রতি ভাষণ

আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী

ওগো আবরণ যার রক্ষা করে আবরু মোদের,
দীপ্তি তোমার মূলধন বটে ফানুসে মোদের।
নির্মল তব পুণ্য স্বভাব মোদের বর,
ধর্মের বল, জাতির ভিত্তি শক্তিধর।
যবে সন্তান তব দুগ্ধে ওষ্ঠ সিক্ত করে,
লা–ইলাহা কলেমা প্রথম শিক্ষা করে।
তোমার স্নেহ গঠন করে স্বভাব মোদের
চিন্তা মোদের, বাক্য মোদের, কার্য মোদের।
যে বিজলী মোদের জ্বলছে তব সুপ্ত রয়,
পর্বতে জ্বলি' বন–প্রান্তর দীপ্ত হয়।
খুদার বিধান–আশীষ–রক্ষী, ওহে আমীন,
নিঃশ্বাসে তব দীপ্তি লভে সত্য দীন।
আজকের যুগ বঞ্চনাময় অহংকারী,
যাত্রী উহার ধর্মের ধন লুণ্ঠনকারী।
অন্ধ, চেনে না খুদাকে কভু সংবিৎ তার,
নগণ্য সব, বন্দী জটিল শৃংখলে তার।
ধৃষ্ট নয়ন, তীক্ষ্ণদৃষ্টি বেপরোয়া তার,
শিকার–দক্ষ অতিশয় আঁখি–পদ্ম তার।
শিকার তাহার স্বাধীনগণে সত্তা আপন,
যিন্দাগণে নিহত জনও সত্তা আপন
জাতির ঐক্য–ক্ষেত্রে পানির আইল তুমি,
মিল্লাতেরই মূলধনরাশি–রক্ষী তুমি।
লাভ ও ক্ষতি খতিয়ে সওদা করো না তুমি,
পূর্বপুরুষ–পন্থা ছেড়ে' চলো না তুমি।
কালের কুটিল চক্র হতে সাবধান হও,
সন্তানে স্বীয় বক্ষপুটের আশ্রয়ে লও।
এ সব কুঞ্জ–ছানার আজো খোলেনি পাখা,
অসহায় দূরে রয়েছে ছেড়ে' নীড়ের শাখা।
আকাশ–চুম্বী বাসনা রাখে স্বভাব তব।
রেখ শ্রেষ্ঠ নারী যাহ্‌রা 'পরে দৃষ্টি তব।
হুসায়ন সম ফল ধরে যেন শাখায় তব,
হবে প্রাচীন পুষ্প–ফলেতে ধন্য কুঞ্জ তব।

রমুযে বেখুদী
আ. ন. ম. বজলুর রশিদ

মানুষের মিলনের বিচিত্র কাহিনী,
অজানা রহস্য বুকে আজও যে বন্দিনী।
জামাতের বুকে ব্যষ্টি আর কিছু নাই,
চমনের মধ্যে যেন ফুল শুধু তাই।
তাহার প্রকৃতি এক-একের স্বভাব,
রক্ষণ দলের রূপে মিলের প্রভাব।
তাহার বিরহ যেন দূর রাজপথ,
জীবন যুদ্ধের শত অগ্নিকণাবৎ।
একের অভ্যাস অন্যে হয় সংক্রমিত,
এক সূত্রে বহু মুক্তা হয় যে গ্রথিত।
বাস্তব জীবন ক্ষেত্রে বন্ধু সকলেই,
সহকর্মী সহমর্মী কোন ভেদ নেই।
মহফিলে রূপের বৃদ্ধি বন্ধুর মিলনে,
তারার অস্তিত্ব দৃঢ় তারার বন্ধনে।
কারাভাঁর তাঁবু-স্থান পর্বত দুস্তর,
শ্যামল সবুজ মাঠ চূড়া ও প্রান্তর।
কার্যের গাঁথন তার হয় যে শিথিল,
প্রাণহীন সর্ব চেষ্টা নিষ্প্রভ নিখিল।
ধারণার পুষ্প তার মেলেনি ক' দল,
শিখাহীন শুভ-ইচ্ছা বিদ্যুৎ চঞ্চল।
প্রজ্বলিত নহে প্রাণ নিষ্ঠুর পর্দায়,
আহত সুরের ধ্বনি ক্লান্ত মূর্ছনায়।
সন্ধানের ব্যথা-তিক্ত অভিজ্ঞতা তার,
এখনো পায়নি সে যে জখম আশার।
নও-মহফিলের কোন নাই যে সমান,
তার খাস খবরের মেলেনি সন্ধান।

তাহার মাটির বুকে শ্যাম তৃণদল,
তাহার শিরায় খুন শান্ত অঞ্চল।
দেও দৈত্য পুরী জাগে তার আন্দেশায়,
আত্মচিন্তা পরিহার যাহার পেশায়।
অপক্ক অস্তিত্ব তার সংকীর্ণ ময়দান,
তার চিন্তা পাই নাই ভাষার সন্ধান।
গুলাব পানির পুঁজি, তার প্রাণে ভয়,
প্রচণ্ড বায়ুতে মন কম্পিত নিশ্চয়।
আহত–মানব দৃশ্যে পলায়িত প্রাণ,
স্বভাবতঃ স্বল্প তার পরিচয় দান।
বলিষ্ঠ পাঞ্জার যত উত্থানের আশা
আপনি বিলীন হয় নিম্নে বাঁধে বাসা।
তখন আল্লাহ সৃষ্টি করে একজন,
দরাজ তাঁহার দিল শান্ত মুক্ত মন।
প্রাণবন্ত যিনি এক হরফে নির্ঝর,
রচনা করেন এক বিরাট দফতর।
বিচিত্র ছন্দে ও তালে সঙ্গীতে তাহার,
মৃত পৃথিবীতে করে প্রাণের সঞ্চার।
তাঁহার নিকট থেকে আলোর আস্বাদ,
পৃথিবী গ্রহণ করে নূতনের স্বাদ।
নবীনের স্পর্শ নব প্রতি বস্তু তার,
অন্তরে গ্রহণ করে বাসনা দুর্বার।
তাঁহার বিপুল শক্তি সজীব অধীর,
শত জড়ে প্রাণ দেয় মহফিলে সাকীর।
একই সাকীর দ্বারা করেন রঙিন
—বিরাট জনতা–সভা চক্ষু বাধাহীন।
ওষ্ঠ প্রাণ মুক্ত দৃপ্ত–নিঃসঙ্গ একাকী,
দ্বিতীয়ের প্রয়োজন তাঁর কাছে ফাঁকি।
আত্মীয় বন্ধন তাঁর সর্বোচ্চ আকাশে,

জীবনের প্রতি অংশ একত্র বিকাশে।
দৃষ্টিক্ষেপ নতুনের করে আবাহন,
উদ্যানে সজ্জিত করে প্রান্তর গহন।
তাহার প্রভাবে সৃষ্ট সমাজ যাহার,
হাঙ্গামা বিলীন শেষ অরাজকতার।
নিক্ষেপ করেন এক স্ফুলিঙ্গ অন্তরে,
দীপ্তি তার রচে পুষ্প রঙের নির্ঝরে।
তার পদচিহ্নে দৃষ্টিমান হয় মাটি,
কণামাত্রে দৃষ্টি তার করে শুদ্ধ খাঁটি;
সুপ্রশস্ত বীর্যবান বুদ্ধিহীন জনে
সজ্জিত করেন তিনি, পুঁজিহীন গণে।
দান করে পুঁজি শত আপন অঞ্চলে,
নিক্ষেপ করেন তাঁর অগ্নিকণা–দলে।
স্বর্ণ হয় খাদহীন উজ্জ্বল নিখাদ,
ক্লেদ গ্লানি দৈন্য মুক্ত ক্লান্তি অবসাদ।
শৃঙ্খলিত ক্রীতদাস মুক্ত তাঁর হাতে,
অত্যাচারী প্রভু থেকে—তাঁর বাক্য পাতে।
তুমি শুধু বান্দা এক, আর কিছু নহ,
বাক্‌হীন জীব থেকে উচ্চ অহরহ।
একই দাবি করে থাকে নিত্য আকর্ষণ,
এক লক্ষ্য পানে টানে শৃঙ্খলবন্ধন।
তওহীদের মূল–সূত্র তাঁহার শিক্ষায়,
তাঁহার নিয়ম পূর্ণ শৃঙ্খলা–প্রথায়।

পায়ামে মাশরিক

پیام مشرق

কবীশ্যাম দোয়াং

عشق و لب

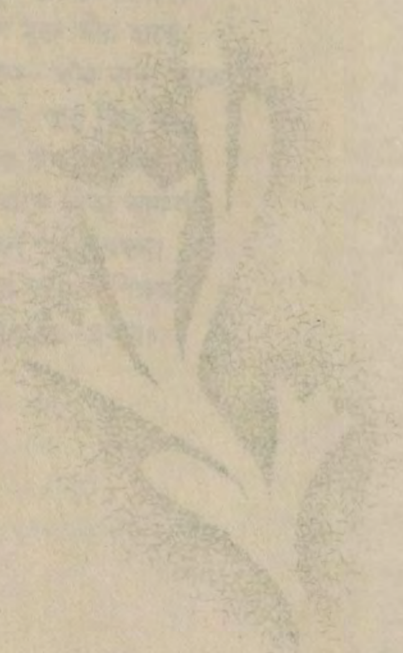

জু-ই-আব

গোলাম মোস্তফা

দেখ চেয়ে ঐ ঝর্ণা–ধারা কেমন বয়ে যায়
ঝিকমিকিয়ে মাঠের 'পরে ছায়া পথের প্রায়।
ঘুমিয়ে ছিল সে এতদিন মেঘের স্বপন–লোক
বনগিরির শীর্ষে নেমে খুল্‌ল তাহার চোখ।
পথের নুড়ির সংঘাতে তার বাজে গানের সুর
আর্শিসম পেশানি তার স্বচ্ছ–সুমধুর।
সাগর পানে যায় ছুটে সে দুরন্ত দুর্বার।
চলা ছাড়া জানে না সে অন্য কিছুই আর।।
পথের মাঝে সিক্ত করি অনেক পতিত ভুঁই–
ফুটালো সে কতই না ফুল–নার্গিস আর যুঁই।
কুলেরা সব কয় ইশারায় ঃ সামনে এস ভাই।
কুঁড়িরা সব এগিয়ে এল, উঠলো হেসে তাই।
তৃণ–ভূমির উপর দিয়ে আনন্দে সে যায়
কুলু–কুলু গানের ধ্বনি বাজে তাহার পায়।
সাগর পানে যায় ছুটে সে দুরন্ত দুর্বার।
চলা ছাড়া জানে না সে অন্য কিছুই আর।
ছোট ছোট ঝর্ণারা কয় ঃ বন্ধু, কোথায় যাও?
একটু দাঁড়াও, আমাদেরো সঙ্গে করে নাও।
অল্প পানির অভিশাপে চলার তাকত্ নাই
মাঠের বালুর অত্যাচারে কোথায় বল যাই?
ঝর্ণা তখন দু'পাশ থেকে বাড়িয়ে দিল হাত–
আদর ক'রে সবাইকে সে নিল আপন সাথ।
সবার সাথে তাল মিলিয়ে ছুটল্‌ সে দুর্বার।
চলা ছাড়া জানে না সে অন্য কিছুই আর।।
সব বাধা সে পেরিয়ে এল সাগর–মোহনায়–
পাহাড় ও মাঠ পারল না তার বাঁধন দিতে পা'য়।
বন্যাবেগে ভাসিয়ে নিয়ে দালান–কোঠা–ঘর,
পার হয়ে সে গেল কতই নগর ও প্রান্তর।
সাগর সাথে মিলন তরে এখন সে চঞ্চল
সফলতার আনন্দে তার বক্ষ সমুজ্জল।
সাগর পানে যায় ছুটে সে দুরন্ত দুর্বার।
চলা ছাড়া জানে না সে অন্য কিছুই আর।

উট চলার গান
(মূল ছন্দের অনুসরণে)

গোলাম মোস্তফা

ওরে পথিক উট আমার–
তাতার হরিণ ক্ষিপ্রতার;
তুই দিরহাম, তুই দিনার–
কম–বেশী হয় হোক না তার,
জীবন্ত দান তুই খোদার!
জোর–কদমে চল্‌রে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের।।

দিলরুবা তুই রূপ–মধুর,
তোর তরে মোর প্রাণ–বিধুর;
পাগল করা তুই যে হুর–
লায়লা–সে তোর ঈর্ষাতুর।
মাঠের মেয়ে–পায় নূপুর।
জোর–কদমে চল্‌রে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের।।

প্রখর যখন রবির কর
মরুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়
চন্দ্রা–রাতে–হে সুন্দর।
উল্কা বেগে নিরন্তর
সম্মুখে হও অগ্রসর।
জোর–কদমে চল্‌রে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের।।

উড়ন্ত মেঘ আস্‌মানের,
পাল–হারা নাও সমুদ্রের,
খিজির তুমি জুল্‌মাতের,
ভয় করো না সংকটের–
রত্ন–প্রদীপ যাত্রীদের।
জোর–কদমে চল্‌রে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের।।

এয়মনে রও সাঁঝ–বেলায়,
করণ–দেশে রাত পোহায়,
পথের ধূলি মূর্ছা যায়–
যুঁই হয়ে সব পায় লুটায়।
চল্‌রে চীনের হরিণ প্রায়,
জোর–কদমে চল্‌রে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের।।

চাঁদের সফর খতম প্রায়–
টিলার ধারে মুখ লুকায়,
প্রভাত হেসে ওই তাকায়–
রাতের পিরহান্ নাইকো গায়,
করছে সেবন মাঠের বায়!
জোর–কদমে চল্‌রে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের।।

আমার বীণার এই যে তান
পাগল করে সবার প্রাণ;
ঘন্টাধ্বনি এই যে গান
হয় এতে মুস্‌কিল আসান্।
কা'বার পথে তোল নিশান্–
জোর–কদমে চল্‌রে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের।।

রুমীর প্রতি

ফররুখ আহমদ

রুমীর প্রতিভা—দীপ্তি উদ্দীপিত করেছে আমারে।
রহস্যের গ্রন্থ হতে আজ আমি গেয়ে যাই গান,
আত্মা তাঁর অগ্নিকুণ্ড জ্বলন্ত উজ্জ্বল;
আমি শুধু অগ্নিকণা প্রাণ পাই মুহূর্তের তরে।
পতঙ্গের মতো মোরে গ্রাস করিয়াছে তাঁর দীপ্ত অগ্নিশিখা;
আমার পেয়ালা পূর্ণ করিয়াছে কানায় কানায়,
স্বর্ণ মহিমায় মোর মৃত্তিকারে ফেরায়েছে রুমী;
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড করেছে সে মোর বিভূতিরে।
সূর্যের ঔজ্জ্বল্য, বিভা কেড়ে নিতে
বালুকণা উঠে এল মরুভূমি থেকে!

পথিক তরঙ্গ আমি তাঁর সমুদ্রের বুকে ফিরে আসি বিশ্রাম আশায়;
ফিরে আসি তুলে নিতে মুক্তাখণ্ড তাঁর,
দীউয়ানা মাতাল আমি মত্ত তাঁর সুরের সুরায়,
জীবন সঞ্চয় করি তাঁর বাণীমূলে।

তখন অনেক রাত্রি। —বেদনায় পরিপূর্ণ হৃদয় আমার
আল্লাহর দরবার মাঝে তুলেছিল তিক্ত ফরিয়াদ;
ব্যথাতুর বিশ্বমাঝে পান–পাত্র শূন্য দেখে উঠেছিল আমার বিলাপ।
তারপর ঘুমঘোরে ক্লান্ত চক্ষু ডুবে গেল অসহ ব্যথায়।

অকস্মাৎ সত্যদ্রষ্টা সে নরের হল আবির্ভাব
সত্য উপাদানে যিনি লিখিলেন ফোরকান ইরানী ভাষায়,
মোরে বলিলেন তিনি উন্মত্ত প্রেমিক!
পান করো প্রেমের শারাব,
হৃদয়–তন্ত্রীতে হানো কঠিন আঘাত।
তোল তুমি সীমাহীন সে উদাত্ত সুর
সুরাপাত্রে ফেলে দাও মস্তক আপন,
আঁখি তব দাও অস্ত্রমুখে,

ব্যথিত শ্বাসের উৎস করো আজ মৃদু হাসি তব
তোমার অশ্রুর রঙে হোক আজ রুধিরাক্ত মানুষের বুক।

নীরব কুঁড়ির মতো কত দিন জাগিবে একাকী
সুরভি বিক্রয় কর গোলাবের মতন সহজে।
নিস্পন্দ রসনা তব জীবনের গভীর ব্যথায়!
নিজেকে নিক্ষেপ করো অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধনের মতো
নীরবতা ভঙ্গ করো ঘন্টা–ধ্বনি সম
কান্নার সহস্র সুর উচ্চারণ করো তুমি প্রতি অঙ্গ হতে।
অগ্নি তুমি লেলিহান পরিপূর্ণ করো বিশ্ব তোমার আভায়,
দগ্ধ করো পৃথিবীকে নিজের দহনে,
রহস্য জানিয়ে দাও সে প্রাচীন সুরা বিক্রেতার;
সুরার তরঙ্গ হও; স্বচ্ছ হোক তোমার বসন।
ভয়ের আরশি তুমি ভেঙে ফেলো বিপণীর মাঝে,
ভেঙ্গে ফেলো সুরার পেয়ালা,
নলের বাঁশীর মতো বাঁশী নিয়ে এস তুমি নলবন থেকে
লায়লার দ্বার থেকে আনো তুমি বার্তা মজনুর
নতুন সুরের ধারা সৃষ্টি করো তোমার সঙ্গীতে
উদ্যত উৎসাহে আজ জনতারে করো বিত্তবান।

হে আশিক ওঠো জাগো
আবার প্রেরণা দাও জীবিত আত্মারে
উচ্চারণ করো তুমি নবীন জাগৃতি;
বাণীর যাদুতে তব জাগুক জীবন আত্মা–কুল।
হে পথিক! ওঠো ওঠো
অন্যতর পথে তুমি করো পদক্ষেপ
দূর করো অতীতের একটানা ক্লান্ত ঘুমঘোর
পরিচিত হও তুমি সঙ্গীতের আনন্দের সাথে
ওগো কাফেলার ঘন্টা ওঠো জাগো তুমি।।
সে বাণীর প্রেরণায় বক্ষ মোর হল উদ্ভাসিত
সুঠাম বাঁশীর মতো স্ফীত হল সুরের জোয়ারে

সঙ্গীত তন্ত্রীর মতো অকস্মাৎ উঠিলাম জেগে
মানব শ্রুতির তরে প্রস্তুত করিতে এক জান্নাত নূতন।

তুলিয়া দিলাম সব যবণিকা আত্ম রহস্যের
গোপন সংবাদ তার বিশ্বময় দিলাম ছড়ায়ে!
অসমাপ্ত সত্তা মোর অসুন্দর ছিল মূল্যহীন,
প্রেম দিল চরম পূর্ণতা
লভিলাম পরিপূর্ণ মানুষের রূপ
বিশ্ব প্রকৃতির জ্ঞান ভিড় করে এল বক্ষ মাঝে।

দেখিয়াছি আকাশের গতিমান স্নায়ুর স্পন্দন,
চাঁদের শিরায় আমি দেখেছি শোণিত বহমান!
এ জীবন রহস্যের যবনিকা ছিঁড়ে ফেলে দিতে,
প্রকৃতির জ্ঞানাগারে জেনে নিতে জীবনের গঠন কৌশল
ক্রন্দন করেছি আমি দীর্ঘ রাত্রি মানুষের লাগি'
নিরন্ধ্র রাত্রির বক্ষে ছড়ায়েছি চাঁদের সুষমা।

ভক্তি–নত আমি শুধু এক সত্য ধর্মের নিকটে
পরিচয় আছে যার সংখ্যাহীন পর্বত প্রান্তরে
অমর সুরের অগ্নিজ্বালায় যায় যে নিত্য মানুষের হৃদয়ের মাঝে।
ক্ষুদ্র এক পরমাণু করেছিল সে কভু বপন
পরিপূর্ণ সূর্য এক তুলে নিয়ে গেল অবশেষে,
রুমী আত্তারের মতো ফসল রাখিল তার সংখ্যাহীন কবি।
আমি এক দীর্ঘশ্বাস উঠে যাবো অন্তহীন নভনীলিমায়
আমি শুধু ধূম্র তবু জ্বালাময় অগ্নি হতে আমার উত্থান!
সমুচ্চ চিন্তার স্রোতে ঊর্ধারিত লেখনী আমার
প্রকাশ করেছে সেই রহস্য বিপুল
যবনিকা অন্তরালে সংগোপনে ছিল যে লুকায়ে
যেন এক বিন্দু হয়ে সীমাহীন সমুদ্রের মতো
বালুকণা হয়ে যেন বাঁধামুক্ত সাহারা বিশাল।
মোর মস্‌নভীর দৃষ্টি নহে শুধু কবিতা সৃষ্টির,

রূপ–উপাসনা আর প্রেম সৃষ্টি লক্ষ্য নয় তার,
আমি ভারতের কবি আধেক চাঁদের মতো
মোর পাত্র অপূর্ণ আজিও.........
ভাবের দুরূহ যাদু চেয়ো না আমার কাছে
চেয়ো না আমার কাছে খানাসাব আর ইস্পাহান,
জানি ভারতীয় ভাষা সুমধুর ইক্ষুর মতন
তবুও মধুরতর ইরানের সুন্দর জবান।
উজ্জ্বল সৌন্দর্যে তার ভাবাবিষ্ট হৃদয় আমার
জ্বলন্ত কুঞ্জের মতো রূপে তার পল্লবিত হল এ লেখনী।
হে সুধী! দিও না দোষ মোর দীন সুরাপাত্র দেখে
তৃষিত অন্তর দিয়ে নাও শুধু এ সুরার পাত্র।

গজল

সৈয়দ আলী আশরাফ

করকোজ্জ্বল চুলের বিভাকে কর উজ্জ্বল দীপ্ততর,
চেতনাবুদ্ধি লক্ষ্যবিদ্ধ, হৃদয়, দৃষ্টি হরণ কর।
প্রেমের শোভাও যবনিকা–ঢাকা, সুন্দরতম নেকাব–তলে,
হয় দ্যুতিমান হওগো এবার অথবা আমারে প্রকাশ কর।
অনন্ত তুমি সৃষ্টিব্যাপ্ত আমি তো ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী,
তোমাতে মেশার শুভযোগ দাও, অথবা অকূলে ক্ষেপণ কর
আমি তো শুক্তি, তোমারই হস্তে মম মুক্তার আব্রু–মান,
আমি কঙ্কর, তুমিই আমাকে অমূল্য রাজ–রত্ন কর।
নববসন্ত সুর–ঝংকার যদি না আমার কপালে লেখা,
এ তপ্ত শ্বাসবায়ুকে এবার বসন্তসখা পক্ষী কর।
কেন দিয়েছিলে বেহেশ্‌ত্‌ বাগের বাহিরে সফর হুকুম–নামা?
দুনিয়া–কর্ম দূর–প্রশস্ত, অপেক্ষা তুমি এখন কর।
বিচারের দিনে সামনে আমার আন্‌বে যখন আমল নামা
লজ্জা তো পাবে আপনিই তুমি, লজ্জিত আরো
আমারে কর।

পায়ামে মাশরিক থেকে

অধ্যাপক সিরাজুল হক

হে বিজয়ী! হে সফল আমীর!
হে বাদশা নামদার।
যদিও যুবা তুমি; কিন্তু অভিজ্ঞ
প্রবীনের মতোই (এই ধরণীর পরে)।
জানি, তব সুতীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বয়
পর্দার অন্তরালে থেকেও
সব কিছুই দেখতে পায়।
আর তব বক্ষে লুকায়িত অন্তরতব
জামশিদের পানপাত্রের মতোই স্বচ্ছ
(যেন এক বিশ্বদর্পণ)।

তোমার ইচ্ছাগুলো শিলাময়
পার্বত্য ভূমির মতোই সুদৃঢ়
আর চির অক্ষয় অব্যয়,
তোমার প্রজ্ঞাময় সতর্কতা
সহজ করে দিচ্ছে অবিরত
তোমার সংকটময় পথ–বিশ্বময়।

আমার ভাবনাগুলোর মতোই–
উন্নত তব হিম্মত–সাহস
শতধা বিচ্ছিন্ন জাতিকে তব
যা করেছে ঐক্যবদ্ধ
সুদৃঢ় ভিত্তির উপর।
হ্যাঁ, পৃথিবীর অনেক রাজা–বাদশা থেকে
পেয়েছো অনেক অনেক
পারিতৌষিক তুমি, আর
পেয়েছো অনেক মূল্যবান মুক্তাদানা,
পেয়েছো অনেক পদ্মরাগ মণি।

হে আমীর! হে আমীর পুত্র!
হে শাহজাদা (আফগান বীর)
আমার মতো দীন–দরিদ্রের
এ উপঢৌকন গ্রহণ করো তুমি।

(হে খোদা!) তুমিতো শিখিয়েছো আমায়
জীবনের রহস্য অপার
করেছো প্রজ্বলিত দেহে আমার
(প্রেমের) দাবানল দুর্নিবার।

তাই আমি আমার
জাতির প্রতি করেছি বুলন্দ
এক হৃদয় বিদারী আওয়াজ,
আর যৌবনের এই শুভলগ্নে
উত্থিত করেছি প্রেমের বাণী আজ।

পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিত্ব
জার্মান কবি এক
ফার্সী সাহিত্যের প্রেমে জীবনকে তার
করেছে উৎসর্গ আর উজাড়!

হাস্যোজ্জ্বল উৎফুল্ল
আর যৌবনের প্রতীক সে কবিবর
সুদূর ইউরোপ থেকে প্রাচ্যবাসীকে
জানিয়েছে সালাম ভালোবাসার।

তারই উত্তরে করেছি লিপিবদ্ধ
এই 'প্রাচ্যের বাণী'
আর চন্দ্রালোক দিয়েছি ছড়িয়ে
প্রাচ্যের তমসাচ্ছন্ন
রজনীর ছায়াতলে।

আমার আত্মপরিচয়
তুলে ধরার জন্য বলতে চাই আমি

তোমাদের তরে, সে কে আর আমি কে?
তবে (জেনে রাখো) আমি নই কোন
আত্মশ্লাঘার পূজারী
অথবা কোন আত্মাভিমানী।

সেতো ইউরোপীয় যুবা পন্ডিতদেরই একজন
বিদ্যুৎ চমকের মতোই তার আবির্ভাব,
আর আমার হৃদয়-বিচ্ছুরিত
অগ্নিশিখাগুলো প্রাচ্যের মনীষীদেরই দান।

জন্মেছে সে এক (স্বাধীন) উন্মুক্ত
উদার জগতে,
সে ভূমিতেই হয়েছে প্রতিপালিত অতি স্বচ্ছন্দে
আর আমিতো জন্মেছি এক (পরাধীন)
বিশুষ্ক, মৃতপ্রায় জমিনের 'পরে।

সেতো বনভূমির সেই 'উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে'
বুলবুলের মতো সুর তুলে গাইছে
(আর জাতি তার হৃদয় দিয়ে শুনছে সে কথা),
যেমন বেহেশতের প্রহরীর কথায়
কর্ণপাত করে থাকে জান্নাতবাসী লোক,
আর আমিতো সাহারা মরুর বুকে
কাফেলার ঘন্টা ধ্বনির মতো
তুলেছি ফরিয়াদ (বিরামহীন জিহাদের)।

আল্লাহর রাজত্ব

মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

আন্দালুসের উপকূলে তারেক
যখন জাহাজ জ্বালিয়ে দিল
লোকেরা বলল, বুদ্ধির বিচারে
তোমার কাজটি বড় ভুল হল।
স্বদেশ হতে পড়ে আছি দূরে
কিভাবে ফিরব আবার
উপায় সহায় পরিত্যাগ করা
জীবনের কোন বিধান বলো
মৃদু হেসে তরবারীর তাপ স্পর্শ করলেন
আর ঘোষণা দিলেন
আটক নয় আমাদের পৃথিবী কোন দেশে
খোদার দুনিয়া জুড়েই তো আমাদের ঘর

প্রেম

মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

যে বুদ্ধির একটি নির্ভীক বালক জ্বালিয়ে দেয় পৃথিবী
প্রেমের কাছেই শিক্ষা নেয় সে বিশ্বজয়ের নিয়ম-বিধি।
প্রেমই তোমার প্রাণে যে কোন ভাবের উন্মেষ ঘটায়
রূমীর উন্মত্ততা হতে ফারাবীর বিস্ময়। সবকিছুই
প্রাণ-সঞ্জিবনী একথাটি বলছি, তাতে আমি আনন্দে উদ্বেলিত
এসব দুঃখ চিন্তা সত্ত্বেও প্রেমের মাঝেই অন্তর
শান্তির সন্ধান পায়,
সকল জটিল অর্থ ঠাঁই পায় না ভাষার বুকে
ক্ষণিকের জন্যে অন্তরের সাথে একাত্ম হও
হয়ত তুমি বুঝবে।

যবূরে আজম

زبور عجم

ঈশ্বর

অমিয় চক্রবর্তী

একই মাটিতে জলে আমি বানালাম বিশ্ব
তুমি ভিন্ন করে নাম দিলে ইরান, তাতার দেশ, জাঞ্জিবার;
মৃত্তিকার অণুকণা দিয়ে আমি বানালাম লৌহ,
তুমি তাই দিয়ে তৈরী করেছ যত তরোয়াল, তীর আর বন্দুক।
বাগানের গাছ কাটবার জন্যে তুমি বানালে কুড়োল,
আর যে পাখী গান করে তার জন্যে খাঁচা।

মানব

অমিয় চক্রবর্তী

তুমি তৈরী করেছ রাত্রি, আমি তো জ্বেলেছি আলোক।
মাটি তোমার, তাই দিয়ে রচলাম পান পাত্র।
তোমার ছিল মরুভূমি। পর্বত; অরণ্য;
আমার হ'ল তৈরী ফুলের কানন, গোলাপ, ফুলের বাগান।
আমি সে, যে 'পাথর'কে ক'রে দেয় আয়না,
বিষ হতে যে বানায় মধু।।

শেখ-ই-মজাদিদ-এর সমাধিতে

অমিয় চক্রবর্তী

গেলাম শেখ-ই-মজাদিদ্-এর সমাধিতে,
সেই স্থানে যা আকাশের তলে আলোয় ভরা।
নক্ষত্রগুলি পর্যন্ত সেখানে ধূলিকণার কাছে লজ্জিত
গুণী শুয়ে আছেন যে-ধূলিতে নিদ্রিত।

যবুর-ই-আযম

আবদুর রশীদ খান

১

মানুষের ধূলি একদা ফেরেশতার
আলোকের চেয়ে উজ্জ্বলতর হবে;
এ পৃথিবী জানি মোদের ভাগ্যপথে
তারকা-দীপ্ত আকাশের রূপ লভে।

মোদের মাথার সহস্র কল্পনা-
ঝঞ্ঝা যাহার খাদ্য যোগায় ভাই,
জানি একদিন উঠ্‌বে আকাশ-পথে,
ধরা-আবর্ত ছেড়ে পাবে রোশনাই।

কেন জিজ্ঞাসা করছো আমার কথা?
মানুষের কথা ভাবো, আর দেখো চেয়েঃ
এ হৃদয় আরো উন্নত, হলে পর
হবে যে মহান স্বর্গ-ধারায় নেয়ে।

সময় মতন মামুলি চিন্তাধারা
যদি বিকাশের মহান সুযোগ পায়,
তবে তার স্থান আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
হবে নিশ্চয় খোদার মনের ছায়।

২

কী এ জীবন? একটি মুক্তো
বইবে শুধু তোমার ঝিনুক-দিলে;
ছড়িয়ে দেবে শিখার বুকে,
নয় তো যাবে হাওয়ার সংগে মিলে।

ছিন্ন ধরার প্রভাব ছেড়ে
  তীব্রগতি ছোটা–ই ভালোবাসা;
চাঁদের উজ্জল গেলাসখানি
  স্বচ্ছ–আকাশ বক্ষে ছুঁড়ে আসা।

শক্তি?–সে তো ছুঁড়েই ফেলা
  নগদ টাকা মন আর ঈমানের;
রাজার মতন রাজ্যশাসন,
  বীরের মতো বওয়া মৃত্যু–জের।

দর্শনেরই শিক্ষা হবে
  শুধুই কেবল দীপ্ত জোশের বলে;
ধার দেওয়া এই ধরার শানে
  চিন্তাধারার ক্ষুরটিকে কৌশলে।

  জীবন্ত এই আত্মাখানির
  ঈমানটুকু বাজে স্বপ্ন নয়;
ছড়ানো এই ধূলো দিয়েই
  নক্সা গড়া অধিক শক্তিময়।

৩

আমি এক পর্যটক, প্রতি দেশে নতুন পথিক
লাগেনি আমার ভাল কোনদিন শান্ত গৃহকোণ।
প্রভাতে বলেছে ডেকে ভস্ম সেই দখিন হাওয়ায়ঃ
'আমার আতশী সত্তা মরু বায়ু দিলো যে নিভায়ে;
ধীরে বও– তোমার করের স্পর্শে ছড়ায়ো না মোরে,
কাফেলার অস্থিরতা আজো মোর হয় যে স্মরণ।
ঝরেছে আমার অশ্রু বালুকায় শিশিরের মতো;
পৃথিবীর জনপদে আমিও তো ধূলির মতন।
কাহার কোমল গান তারপর শুনেছি এ বুকে;
'সময়–নদীর উৎস খুঁজে পাবে আমার ঝর্ণায়'।

অতীত কেবল মোর শৌর্যবীর্য হারানো দিনের;
এখন আগ্রহভরে ভবিষ্যের প্রতীক্ষা আমার।
করো না স্মরণ আর তব ধূলি– করো না, করো না;
জেনে রেখোঃ জীবনের কোনদিন হয় না বিলয়।

৪

চলেছিল ধরা জুড়ে সন্ধান প্রেমের
অবশেষে জন্ম আদমের।
পানি থেকে, থেকে মৃত্তিকার
প্রকাশ তাহার।
চন্দ্র–সূর্য সুদূরের তারকার দল
প্রতিষ্ঠায় লাগেনি কৌশল।
জীবনের হাটে তাই ক্রয়ের ইচ্ছায়
দিল যে হৃদয় এক আদমের ধূলি–কণিকায়।

৫

সারা দুনিয়ার আবেগ প্রকাশ তরে
একটি ক্ষুদ্র কথা ঢের বলে মানি;
তোমাকে নিকটে দেখার খুশীতে তাই
এ বিরাট ইতিবৃত্তের জের টানি।

যারা যেতে চায় তোমার মনের কাছে
নাও তুমি কেড়ে তাদের মুখের কথা;
জান না কি তুমি, নীরব দৃষ্টি মাঝে
প্রেম এনে দেয় আবেগের মুখরতা।
জানে না এসব আলোকের সন্তান
রসূল ব্যতীত অন্য কিছুই আর;
মাটির মানুষ যদিও নীচের স্তরে,
বক্ষে ধরিছে স্বর্গের সম্ভার।

মোর প্রাণ বেঁচে যেই দেহ ভর ক'রে
তা থেকে একটি অণু যদি দিতে হয়,
তা হলে আমার অমরত্বের তরে
তা হবে বিরাট মূল্য সুনিশ্চয়।

হে সাগর, তুমি সীমাহীন, তব ঢেউয়ে
আমার খুদীকে নিক্ষেপ করি আমি;

নেই তবু মোর পরপার প্রত্যাশা,
অথবা চাইনে পেতে যে মুক্তা দামী।

এ খাঁটি মর্ম নিদাঘ শিশির সম
তুমিই চালিয়েছ এই মোর আত্মায়,
তাই এক নয়া দুনিয়া জাগিয়া উঠে
আমার নয়নে ব্যথা আর বেদনায়।

৬

দীর্ঘ শীতের দিনগুলো হলো শেষ;
শাখায় শাখায় কাঁপিছে গানের রেশ।

নদীতীর থেকে বহিছে মলয় বায়;
গোলাবে যে আরো সুন্দর হলো তায়।

মরু–বিয়াবানে রূপসী লালার কলি
বসন্ত–বায়ে হাসিতেছে উচ্ছলি।

গোলাব–কুঞ্জে বিরহী আমার মন;
মাঠ হতে দেখ মৃগ করে পলায়ন।

বিরহ ব্যথায় খানিক ভুলি যে দুখ;
আবার পাহাড়ী নদীর মতন শোক।

এই প্রাণবেগ মন্থর হয় পাছে,
জানাবো না ব্যথা বিশ্বাসী যারা আছে।

৭

আমার কোমল নিশ্বাস যেন মৃদুল চৈতী হাওয়া;
আমার আঁসুতে ঘাস হলো যেন ফুলের সুরভি ছাওয়া।

সাহারার লালা আমার ক্ষরিত রক্তে উজল হলো,
যেন পেয়ালায় মরকত–লাল সুধা আজ টলোমল।

সবচেয়ে উঁচু মন্ডল' পরে এমন গতি যে মোর
ফেরেশতাগণ তা দেখে আমায় ধরিতে লাগায় সোর।

মানুষের ধূলি নিত্য নতুন কর্মে উজল হয়;
পুরানো দিনের মতো চাঁদ–তারা এখনো আলোকময়।

বাজুবন্দের আড়ালে যেহেতু মানুষ লুকানো আনি
মুসার হাতকে, তাই জ্বালি মোর খুদীর প্রদীপখানি।

এসো গো নামাজে; শাহজাদা দ্বারে দিও না ধর্ণা আর;
তাই ছিল মোর পূর্বপুরুষ পুরাকালে এ ধরার।

যবুরে আযম

আবদুর রশীদ খান

প্রভাতী হাওয়ার মতো পুনর্বার জেগে ওঠো তুমি,
শেখো তুমি বয়ে যেতে তীব্র গতিবেগে;
সৌন্দযসুষমাদীপ্ত নার্গিস, গোলাপ
আন্দোলিত হয় দেখো সূক্ষ্ম বৃন্তমূলে–
প্রাণের আবেশ জাগে প্রতি পাপড়িতে।

যদিও তোমার চিত্তে পাশব প্রবৃত্তি জেগে আছে
সাড়া তার অবিরাম জাগে চিত্ত ঘিরে–
ইচ্ছা–অনিচ্ছায় তুমি কেঁপে উঠো শুধু,
হবে না সুফল–প্রসূ সে–চেতনা, জেনো কোনদিন।
স্রষ্টার নৈকট্যে তুমি পাঠ করো দীপ্ত ঐশী প্রেম
প্রকম্পিত প্রজ্বলিত হও তুমি তারি তীব্র দাহে।

অবিশ্বাসী তুমি, তাই পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত নিখিলে
আবার নোঙ্গর করো অস্তিত্বে খোদার
এই সব ভ্রান্তি থেকে মুক্তো করো সত্তাকে তোমার,
তোমার নিজের প্রতি অন্ধ তুমি হয়ো না কখনো,
তোমার চোখের দৃষ্টি করো তীক্ষ্ণতর
সে–আলোকে অন্বেষণ করো তুমি নৈকট্য খোদার।
শ্বাস–প্রশ্বাসের মাঝে আছে এক শব্দহীন বাণী–
এবং অশ্রুতপূর্ব সেই ধ্বনি ফেরে;

কল্পনায় সমুজ্জ্বল প্রতি ধূলিকণা
তোমার দৃষ্টিতে তবু উজ্জ্বলতা দেয় নাই ধরা,
আর একবার তুমি শেখো দৃষ্টি দিতে
এবং অর্জন করো পুনর্বার শ্রুতি তীক্ষ্মতর।
আমাদের চিত্তে নেই বাজের তীক্ষ্মতা
নেই তীক্ষ্ম ঈগলের খরপ্রভা দৃষ্টির প্রদাহ;
গৃহে বন্দী পিঞ্জরের পাখির মতন
আকাশে ওড়ার নেই আকুলতা

নেই কোনো আকাঙ্খা বিশাল।
জেগে ওঠো, পিঞ্জরের আবদ্ধ পাখিরা।
আবার প্রমুক্ত ডানা মেলে দাও উর্ধ্বাকাশ পারে।

দারিউস বাদশার রাজ–সিংহাসন
সওদা করে না কেউ পথপ্রান্ত থেকে,
পাথরের সুগঠিত বিশাল পর্বত।

বদল করে না কেউ সামান্য খড়ের বিনিময়ে।
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে শেখো
সে মহা ঐশ্বর্য কিনে নিতে।

ক্রন্দনে নিমগ্ন তুমি! ভাগ্য তবু থাকে চিরস্থির
ক্ষান্তিহীন প্রতীক্ষা তোমার,
যে বৃত্ত তোমাকে ঘিরে অবিরাম করে পরিক্রমা
সুনির্দিষ্ট, সুকঠিন তার আবর্তন।
হতাশা হয়ো না তবু পুনর্বার হও উজ্জীবিত
এবং আয়ত্ত করো প্রায়শ্চিত্তের শৈলী নতুন।

তুমি কি নিঃশেষ হয়ে গেছে?
উদ্দীপিত করো তুমি হৃদয়ের আকাঙ্খা বিশাল,
তোমার সত্তাকে ঘিরে প্রজ্বলিত হোক ফের
আকাঙ্খার শিখা,
সুরের আগুন আনো তোমার বাঁশীতে
প্রস্তর খণ্ডের স্পর্শে প্রজ্বলিত করো ফের
প্রদীপের শিখা
সে শিখায় প্রজ্বলিত হও তুমি নিজে।

জাভিদ নামা

جاوید نامه

সত্তার পরীক্ষা
তালিম হোসেন

কোন্ স্তরে আছে সত্য পার্থিব এ অস্তিত্ব তোমার?
জীবন না মৃত্যু, কিংবা জীবমৃত?—পরীক্ষায় তার
তিনটি সাক্ষীকে ডাকো, জেনে নাও সত্য অবস্থান।

প্রথমে তোমার নিজ চেতনাকে জানাও আহবান—
সে হবে প্রথম সাক্ষী; তার চোখে নিজেরি আলোকে
দেখে নাও নিজ সত্য, জেনে নাও আছো কোন্ লোকে।

অপরের চেতনাকে তারপর জানাও শমন—
সে হবে দ্বিতীয় সাক্ষী; দেখো সেই পরের অহং
কী দেখে তোমার মাঝে; তারি সেই দৃষ্টির আলোকে
দেখে নাও নিজ সত্য, জেনে নাও আছো কোন লোকে।

তৃতীয় সাক্ষীর চোখে তারপর নিরীক্ষা তোমার—
আল্লার চেতনা সেই মহাসাক্ষী, আলোকেতে তাঁর
জেনে নাও নিজ সত্য। যদি সেই আলোকের আগে
অকম্প্র দাঁড়াতে পারো, কেবল তখনি আপনাকে
জেনে প্রাণবন্ত আর চিরন্তন–আল্লারি মতন
(কেবল তখনি তুমি অনন্তে সংস্থিত একজন)!
সেই মাত্র শুদ্ধ সত্য, যে মানুষ আল্লার সম্মুখে
মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি রাখে চোখে আর বুকে।
মে'রাজের রহস্য কি? সে তো এক সাক্ষীর সন্ধানে
প্রাণবন্ত অভিযান, একমাত্র যার সাক্ষ্যদানে
তোমার অস্তিত্ব পায় পরিপূর্ণ সত্যের স্বীকৃতি—
যে সাক্ষীর সমর্থনে তুমি পাও চিরন্তন স্থিতি।

কে পারে সম্মুখে তাঁর দাঁড়াতে অকম্প দেহ–মনে!
যে পারে, সে নিকষিত হেম (শুভ্র সত্যের দহনে)।

তুমি কি শুধুই এক বিনশ্বর তুচ্ছ ধূলিকণা?
(তোমারো অতলে আছে অসীমের মহাসম্ভাবনা)।

আপন খুদীর গ্রন্থি বজ্র–দৃঢ় করো তুমি তবে।
যত ক্ষুদ্র হোক্ সত্তা, জেগে ওঠো তাহারি বৈভবে।

সে–মহাসূর্যের তেজে আপন খুদীর উজ্জ্বলতা
শানানো, পরখ করা–সে কি মহা গৌরবের কথা!
যে আদিম অবয়বে নির্জিত এ অস্তিত্ব তোমার,
নতুন সত্তার রূপে ভেঙ্গে তাকে গড়ো আরবার।
সেই সত্তা সত্যিকার–(পরম সত্তার বলে বলী);
নতুবা তোমার খুদী শুধু এক ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

নয়টি সুধী বচন

তালিম হোসেন

১

সন্ধানীর কাছে নয় এ– পৃথিবী অন্ধ যবনিকা,
ডুবুরীর কাছে নয় তরঙ্গ কোনই বিভীষিকা।

২

নতুন পৃথিবী মাঝে নতুন জীবনে জেগে ওঠা–
কী মধুর– জরা ফেলে যৌবনের মধুবনে
আবার নতুন করে ফোটা!

৩

সকল মৃত্যুর পারে সত্য আছে, আর
তারি মাঝে আছে সত্য–সার
জীবনের। যদিও মানুষ
দেখে ভয়ে পরাজয়ে মৃত্যুর অঙ্কুশ।

৪

সময় সে তিক্ততা ও মাধুর্যের এক সমন্বয়
শত অশুভের শরে বিদ্ধ এক শুভ আশীর্বাদ;
অশুভ প্রভাবে তার শূন্য হয় পূর্ণ লোকালয়,
গতির মুহূর্ত শুধু পায় তার পুণ্যের প্রসাদ।

৫

অবিশ্বাসী যারা, তারা মৃত–আত্মা, সংসর্গে তাদের
তৃপ্ত থাকা নাহি সাজে প্রাণবন্ত বীর সংগ্রামীর ;
আল্লাহতে বিশ্বাস যার, সে মানুষ জীবন্ত অধীর;

দৃপ্ত জিগীষায় নিজ প্রবৃত্তির সাথে সংগ্রামের
অবসান নাহি তার;– চিতাবাঘ যেন সে বনের,
হরিণ–শিশুর প্রতি ধাবমান– অক্লান্ত, অস্থির।

৬
অতন্দ্র–নিষ্ঠায় জাগে যে–কাফের ব্যাকুল অন্তরে
আপনার প্রতিমা–সম্মুখে,
সে অনেক শ্রেষ্ঠ জানি তার চেয়ে– মসজিদ চত্বরে
যে মোমেন নিদ্রা যায় সুখে।

৭
কেবল অন্ধই দেখে যত মন্দ ছায়া
সূর্যের দৃষ্টিতে নাই আঁধারের মায়া।

৮
মৃত্তিকায় মূল রেখে বীজ হয় বৃক্ষে পরিণত;
অথচ মানুষ থাকে মৃত্তিকার পিন্ড নির্বিকার;
মাটি থেকে শক্তি নিয়ে বীজ ওঠে ঊর্ধ্বে ক্রমাগত,
যতক্ষণ নাহি পায় সূর্য থেকে প্রাণের সম্ভার।

৯
গোলাপেরে কহিলাম, "বল মোরে বেদনা–বিধুর–
কেমনে ধূলির থেকে পাও তুমি গন্ধ সুমধুর,
মঞ্জুল বরণ আর?" কহিল সে, "সহজ এ কথা বোঝ নাকো
হে নির্বোধ বুদ্ধিজীবী নর! কথকতা
আসে নাকি বৈদ্যুতিক তরঙ্গের 'পরে? শোন তবে;
দুর্বার আবেগ এক গড়ে তোলে একান্ত নীরবে
জীবন আমার, প্রাণে সংগোপন মোর সংবেদন;
প্রগলভ, চঞ্চল আর ভাসমান তোমার বচন।

ইকবালের প্রার্থনা

মহীউদ্দীন

অনেক রঙের আর অনেক হৃদয়–গ্রাহী
আনন্দের আকর্ষণে পূর্ণ এই পৃথিবীতে,
যুগে যুগে মানুষের প্রাণ কান্নাভরা বীণার মতন
খেদা যায় ফেটে পড়তে চায়–
চিরন্তন অশান্তির রোলে,
এক আকুল বিরহে আর মর্মান্তিক দুঃখে ও ব্যথায়।
নিগূঢ় ক্ষুধার্ত বহ্নিশিখার মতন
এক অগ্নিজ্বালা রাখে জ্বেলে অন্তর নিভৃতে
একজন বন্ধুর জন্যে
একজন আত্মার সাথীর জন্যে
একজন দরদীর জন্যে
এক অন্তরতম বাসনা,–
আর এ বাসনার আবেগে জাগে যে বেদনার সঙ্গীত
তার অমৃত–মধুর সুর স্পর্শ করে হৃদয়!

কিন্তু এই মূক উদাসীন মমতাহীন মাটি আর পানির
কঠিন বাস্তব পৃথিবী কখনো দেখাতে পারে না
একটি অনুভূতিশীল হৃদয়কে
তিল মাত্র মমতা।

অসীম সমুদ্র, বিশাল সাহারা প্রান্তর,
স্তব্ধ মৌন পর্বত পাহাড়–
অনন্তে প্রসারিত আকাশ সূর্য এবং চাঁদ–
জেগে আছে নির্বাক বোবা অসাড়।
আকাশে আকাশে জ্যোতির্ময় নক্ষত্রদের ভিড়–
তবু বিচ্ছিন্ন তারা পরস্পর,
একা একা আপনাতে আপনি আত্ম–নির্বাসিত,

প্রত্যেকে রয়েছে নিজ কক্ষে,
আমার মতো সহায় সাথীহীন দুর্ভাগা,
ভ্রমণ করছে অন্তহীন আকাশ পথে!
এই যাত্রা পথে যাত্রীদলের নেই কোন পাথেয়,
তবু তারা এগিয়ে চলছে
লক্ষ্যহীন অলক্ষ্যের পানে–
সেখানে অপরিমেয় মহাশূন্য
আর আদিম রজনীর দুর্ভেদ্য অন্ধকার!
নিজেকে জিজ্ঞেস করি, পৃথিবী কি জীবনের মৃগ
আর আমি কি তার শিকারী?
অথবা আমি কি এখানে এক শৃঙ্খলিত বন্দী,
যার স্মরণ–শক্তির প্রতিটি চিহ্ন
মন থেকে গেছে নিঃশেষে মুছে?
আহা কত অজস্র তিক্ত অশ্রুতে ভিজে আমি কেঁদেছি,
কিন্তু তাতে কি পেয়েছি সার্থকতা?
এই ব্যথাতুর দীন মানব–সন্তানের জন্যে
চাই একজন বন্ধু,
কিন্তু কোথায় পাই তাঁকে?
আমি সবদিকে দেখ্‌তে পাই;
দেখ্‌তে পেয়েছি সবদিক থেকে
এই বাস্তব পৃথিবীর দিন,
আলো তার উদ্ভাসিত করে
ঐশ্বর্যপূর্ণ প্রাসাদ এবং দীনতম গলি–পথ।
একটি নক্ষত্রের গতি থেকে
সে নিয়েছে তার সত্তার স্বরূপ–
আহা না, এ কথা সত্যি নয়ঃ
এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেবল বল্‌তে পারি
এ 'গিয়েছিল' অথবা এ 'ছিল';
কেননা, এ সর্বদাই এমনি অনিত্য।
কিন্তু আমি প্রতীক্ষা করছি সেই শুভ দিনের,
এই বস্তু–ব্যাকুল পৃথিবীর

নৃত্যশীল কালের স্বভাবে সে নয় বন্দী–
সেই শুভ দিনের প্রভাত কখনো লুপ্ত হয় না মধ্যাহ্নে,
অথবা বিষাদঘন সন্ধ্যায়।
তার আলোতে উদ্ভাসিত হলে
অদৃশ্য চলমান শব্দ
পথ চল্‌তে চল্‌তে পরিগ্রহ করবে
উজ্জ্বল প্রদীপ্ত রঙ্,
প্রতীয়মান হবে দৃষ্টিলোকে।
সেদিনের আলোকে উজ্জ্বল হ'য়ে
দেখা দেয় প্রচ্ছন্ন সব বস্তু,
যেন তারা সমস্ত রূপ নিয়ে
ব্যক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল চোখের সামনেঃ
তার সেই দিনের আনন্দ কখনো
অস্তমিত হয় না অন্ধকারে–
কেননা সময়ের পদক্ষেপে
ধূসরিত নয় তার অমলিন পবিত্রতা।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্!
আমার এই মৃত্যুশীল বস্তুভারী অবসন্ন দিনকে
বিবর্তিত কর সেই মহান দিবসে,
মুক্ত কর স্বর্গীয় বহ্নি–বঞ্চিত দিবস থেকে।
হায় সেই 'তাস্‌কিরের কাব্য'
বল সে কার যোগ্য?
ঊর্ধ্বলোক নীলের প্রচ্ছদ–ছায়া
কার বিস্ময়–প্রসূত?
'আল্লামাল্ আস্‌মার'
গহন রহস্যলোকে সম্বর্ধনা করেছ কা'কে?
সেই বিহিশতি সাকির অনুরক্ত
আর সেই আশ্চর্য শারাবের মাতাল ছিল কে?
সমস্ত বিশ্বব্রহ্মান্ডের ঊর্ধ্বে
তুমি উত্তোলন করেছ কার গৌরব?

কে ছিলেন তিনি
যাকে তুমি আনন্দে গ্রহণ করেছ
তোমার অন্তরতম নিভৃতলোকে?
হায় তুমি সেই তীর
যা ভেদ করেছে আমার হৃদয়!
সেই জীবন–দাতৃ বাণী 'উদ্‌উনী'
উচ্চারিত হয়েছিল কার কণ্ঠে?
এবং কাকে আহবান করেছিল সেই বাণী?

তোমার মুখমন্ডল, হে আল্লাহ্,
আমার প্রত্যয় আমার মহান্ গ্রন্থ!
তাহলে তোমার আলোকের
তোমার জ্যোতির অভিব্যক্তি
কেন লুকিয়ে রেখেছ আমা থেকে?
সেই আলোকের দীপ্তি ছড়িয়ে
সূর্য এতটুকু হীন হলো না দীপ্তিমান সত্তায়,
ম্লানিমা এলো না তার মুখচ্ছবির প্রভায়!
আধুনিক কালের জন্যে যুক্তি গড়ে শিকল,
বেঁধে দেয় চলমান গতি
আমার ন্যায় অনুভূতিশীল, উদ্দীপ্ত, অশান্ত
আত্মা এখানে বিরল।
কালের উপরে কালের তরঙ্গমালা
গুটিয়ে নেয় নিজেদের
প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপরে স্তরে স্তরে
এবং কেবল তখনি তারা সক্ষম হয়
গড়ে তুলতে আমার ন্যায় একটি আত্মা।
তোমার স্পর্শ না পেলে এই উষর নোনা মৃত্তিকা
যোগ্য হয় না বাসনার উৎপাদনে;
এই নিরর্থক মাটি ধন্য হয়
যদি রূপায়িত করতে পারে
একটি জীবন্ত হৃদয়।

তুমি আমার আলো, আমার চাঁদ।
আমার রাত্রির পর্ণকুটির আলোকিত করঃ
একবার অনুভব কর আমার দুঃখ,
যুগ–যুগান্ত থেকে
আমার আত্মা সংগ্রাম ক'রে চল্‌ছে
আলোহীন অন্ধকারে।

কেন, আহা কেন, আগুন তার নিজেকে
সরিয়ে রাখে খড়ের স্তূপ থেকে দূরে?
এবং কেন বিহিশ্‌তের নামে
বিদ্যুৎ দ্বিধা করে ছুটে পড়তে এবং তার কাজ করতে?

এতদিন বেঁচে আছি
কেবল বিচ্ছিন্ন বিরহে জীবন–যাপন করতে।
অবশেষে আমার প্রতি তুমি সদয় হও,
ব্যক্ত কর আমার জন্যে–
আমি দেখবো এই নীলাভ আকাশের অন্তরালে কি আছে!

করুণা ক'রে আমার সামনে খুলে দাও বদ্ধ দুয়ার;
আমি নিকষ মলিন কাদার গোলক,
পরম প্রত্যয়ে আশ্বস্ত কর আমাকে,
কর ফিরিশ্‌তাদের সাথী,
পবিত্র সর্ব সত্তা।

বক্ষে জ্বালিয়ে তোলো একটি বহ্নিশিখা,
ক্ষণেক পাশে সরিয়ে রাখ জীবনের মুসব্বর্
প্রথম গ্রাস কর কাষ্ঠ–ইন্ধনঃ
তারপর প্র জ্বলিত দগ্‌দগে অঙ্গারে
নিক্ষেপ কর আমি নামক মুসব্বর্
আর তার ধোঁয়া বিস্তারিত হোক
সমস্ত পৃথিবীতে।

পাত্রে আমার নিবিড় করে তোলো আগুন
আর তার সঙ্গে আন্‌মনা
মিশে যাক কেবল এক পলকের চল্‌তি দৃষ্টি।

তোমাকে খুঁজি সর্বত্র
কিন্তু তুমি নিজেকে লুকিয়ে রাখো
আমার দৃষ্টি থেকে।
কিন্তু না, এ আমি কি বল্‌ছি?
না, নাঃ তুমি রয়েছ চিরদিন প্রত্যক্ষ,
চিরদিন আছ দৃশ্যে, সর্বদা জাগ্রতঃ
কেবল আমিই অন্ধ!

তবে ছিন্ন কর রহস্যের সব বিভ্রান্ত পর্দা,
অথবা দৃষ্টিশক্তিহীন এই জীবন নিয়ে যাও ছিন্ন ক'রে।
আমার চিন্তা এবং স্বপ্নের বৃক্ষ
হারিয়েছি তার পত্রপল্লব ফলের আশাঃ
এবার তাকে হানো তবে কুড়লের আঘাতে—
অথবা তার জন্যে পাঠাও
সুমধুর প্রাণদায়িনী ভোরের বাতাস।
আমাকে দিয়েছ তুমি প্রজ্ঞা;
এখন আমাকে দাও
সেই উন্মত্ততার একটুখানি ছোঁয়া;
আমাকে শেখাও অন্তর্নিহিত সেই অন্তর্লীন
ভাবকে লাভ করবার মন্ত্র।

গভীর অনুধ্যানে অধিষ্ঠান করে জ্ঞান
ব্যথাতুর চিন্তায়ঃ
কিন্তু ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষিত আসন
হৃদয়–পিন্ড,
সে কখনো যায় না নিদ্রা।
ঈসার সুবিনীত সুশৃঙ্খল আদর্শ ব্যতীত

জ্ঞান কেবল বিচ্ছিন্ন অব্যবস্থিত
দ্রব্যের যাদুঘর মাত্র–
খুব জোর একটি যাদুঘর
যার পরিণতি বিপুল প্রতারণায়–
প্রবঞ্চনা, 'সামেরির' মতো প্রবঞ্চনা।
পবিত্র আত্মার সঙ্গ ব্যতীত
জ্ঞান আর কিছুই নয়, এক যাদুবিদ্যা।
তাঁর আলো ছাড়া কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি
কখনো পৌঁছতে পারেনি আলোর পথেঃ
এই আলো থেকে বঞ্চিত মানুষ
আপন চিন্তার দুরন্ত পদাঘাতে
লাভ করে মৃত্যু।
আলোহীন জীবন কিছুই নয়–
কেবল এক গভীর পীড়া, এক দুঃখময় বেদনা;
প্রজ্ঞা কেবল এক ব্যাধি; এবং
ধর্ম কেবল এক সংরোধ।
এই পর্বত–প্রান্তর–অরণ্য–সমুদ্র–শোভিত পৃথিবী
আমার কোনো কাজে এলো না;
আপন চোখের আলো দিয়ে দেখ্তে চাই এক নজর
এক অনিরুদ্ধ উন্মুক্ত দৃশ্যরূপ;
অথচ তারা দিয়েছে আমাকে
নিছক একটুখানি খবর।
হায় আল্লাহ্,
এখন আমার এই ভ্রাম্যমান হৃদয়কে
নিয়ে চল তার আকাঙ্ক্ষিত তীর্থে;
চাঁদ থেকে বিচ্ছিন্ন এই চাঁদের টুক্‌রা,
অবশেষে ফিরিয়ে নিয়ে যাও চাঁদের বুকে।
যদিও আমার অকেজো ধূলিকণায়
কথা ছাড়া দানা বাঁধেনি অন্য কিছু,
যদিও দীর্ঘ–আবৃত্ত আমার দুঃখের কাহিনী,
তবু তা র'য়ে গেলো অসম্পূর্ণ।

আকাশের তলায় অনন্ত বিস্তৃতির মাঝখানে,
দেখ্‌ছি, শোকার্ত বেদনায় তলিয়ে গেছি অতলেঃ
অতএব আকাশে আকাশে
তোমার আশ্বাসবাণী ছড়িয়ে দাও।
আসি অতি নিবিড় নিকটে।

চাঁদ সূরুজের অস্তের মতো
দিগন্তে অদৃশ্য হবে
এই উত্তর দক্ষিণঃ
আজ এবং কালের যাদুকরী সীমা ছাড়িয়ে
আমাকে নিয়ে যাবে বহু উর্ধ্বে
চাঁদ–সূরুজের উপরে।

উজ্জ্বল এবং মহিমাময় অবিনশ্বর তুমি;
আমি একটি উড়ন্ত বহ্নিকণা মাত্র,
কেবল একটি বা দু'টি মুহূর্তের চমক—
তা–ও তো পেয়েছি তোমার কাছে।
হায়, তুমি জানো না জীবন–মৃত্যুর দুঃসহ বেদনা।
কি এবং কে এই অকিঞ্চিৎকর জীব
যে আল্লার সাথে করে ঈর্ষা?
এই দুঃসাহসী জীবের আকাঙ্ক্ষা
সুদূর দিগন্তকে সংহত করতে চায় আপন কোলে;
তার সত্তার মূল স্বভাব এমনি অধীনরা—
যা দেখা যায় না এমন সব প্রচ্ছন্ন এবং গোপন বস্তু নিয়ে।
নয় সে সন্তুষ্ট,
সুখী নয় যা দেখ্‌তে পায় না তাই নিয়ে।
হে আল্লাহ্‌, তুমি কেবল একটি মুহূর্তের জন্যেঃ
আমাকে কর অবিনশ্বর;
নিম্নতল পৃথিবী থেকে তুলে নাও আমাকেঃ
আমাকে কর জ্যোতির্ময়।
আমার ভাষা এবং কর্মে দাও সুসংযত নিরোধ,
দাও সুষ্ঠু সংযম।

সামনে বিস্তৃত পথে চল্‌বার গতি কর দুর্নিবার!
লক্ষ্য কর প্রিয় পাঠকঃ
আমি যা বলেছি এখানে,
সে সম্পূর্ণ এক আলাদা জগতের কথাঃ
আমার এই গ্রন্থ নেমেছে
সম্পূর্ণ এক ভিন্ন আকাশ থেকে।

সত্যের সমুদ্র আমি;
বিপদ-সংকুল ঝঞ্ঝাছাড়া আমার কাছে আমি মিথ্যাঃ
এই সমুদ্রের গভীর অতলে যে ডুব দেবে
সেই ডুবুরি মানুষ কোথায়?
সমস্ত বিশ্বলোক স্তব্ধ দাঁড়িয়ে ক্ষণিকের জন্যে
এই সমুদ্র তীরে—
এর অনন্ত বিস্তৃতির মাঝে দেখ্‌ছে শুধু তরঙ্গের উঠানামা!
পুরাতন কালের উপর দিয়ে চলে এসেছি
নৈরাশ্যের গহন গহবরেঃ

তবু আশা আছে আজ কিম্বা কাল
অবশেষে আমার বাণী হবে সার্থক;
নতুন কালের মানুষের জন্যে
আমার বাণী কর সহজ-বোধ্য;
এবং সুগম কর তাদের জন্যে
এই তরঙ্গসংকুল সমুদ্রের অতল তলা।

নর্তকীর আত্মগ্লানি

মহীউদ্দীন

পুরানো শারাব কিছুই নয়; নবনীত সৌন্দর্য
কিছুই নয়;
এমন কি দৃষ্টিমানের জন্যে বিহিশ্‌তের হুরীও
কিছুই নয়
যা–কিছু ভাবছ্‌ নিয়ত স্থায়ী সব চলে যাচ্ছে,
মরে যাচ্ছে;
সমুদ্র মরুভূমি পাহাড় উপত্যকা কিছুই নয়।
পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান আর প্রাচ্যের জ্ঞান তারা উভয়ে
প্রাণহীন প্রতীক মাত্র–
জীবনে আন্‌বে না কোনো সার্থকতা।

এই দুর্গম পথে চল্‌তে ভয়ে কেঁপো না,
দৃষ্টি রাখো অন্তরের পানে;
তোমার জন্যে রয়েছে যে পৃথিবী আর আকাশ
সে কিছুই নয়।
সেই পথে চল্‌তে চল্‌তে বেঁকে এলো
আমার চোখের ভুরু
অর্থহীন আমার লক্ষ্যস্থল, তীর্থযাত্রা কিছুই নয়।

অজানাকে একাকী ফেলে রাখো, কেননা, সে কিছুই নয়,
এই জগতে থাকা, আবার মুক্ত হয়ে যাওয়া,
এতে অর্থ আছে কিছু।
বিহিশ্‌ত যদি হয় আল্লার দান, তবে সে কিছুই নয়;
যদি হয়ে থাকে কর্মের দান, তবে অবশ্য কিছু
আছে তাতে।
আরামের আকাঙ্খায় অধীর হয়েছ?
আরাম কিছুই নয়,
দুঃখ–পীড়িত মানুষের জন্যে কান্না,

এতে আছে কিছু মর্ম।
স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ, চঞ্চলা দৃষ্টি, নাচ আর গান
কিছু মন্দ নয়— কিন্তু, তার চেয়ে উঁচু পর্দায় আছে
কিছু সার্থক।
এই মুখের সৌন্দর্য এখন আছে, এখন নেই;
আর মনের সৌন্দর্য , সে যথার্থ কিছু।

নর্তকী

কাজের ঘোরে জড়িয়ে পড়া হৃদয়কে দিয়ো না অবকাশ;
হ্যাঁ, এ তোমার সুন্দর কালো চুলের পাকে আরো
ক'টি পাক মাত্র।
তোমার সাথে মিলনের আকাঙ্খা হৃদয়কে পূর্ণ করে
সেই মহত্ত্ব দিয়ে, চাঁদ সূরুজের বুকে আঁকে যে
তার সাক্ষর।
কাছে পাওয়ার বাসনা থেকে জাগে মূর্তি
উপাসনার ইচ্ছা,
ভালোবাসা মনে জাগায় মিথ্যা আশা,
আর আত্মা করে অনধিকার প্রবেশ।
গানের পাখি ফিরে আসুক সবুজ বনভূমিতে,
যেন শান্তির ছায়াতলে আনন্দে গাইতে পারে
নতুন সঙ্গীত।
আত্মাকে আমার উর্ধ্বে তুলেছে, এবার ছিঁড়ে ফেলো
পায়ের শিকল,
দরিদ্রের ছেঁড়া কাপড়ের জন্যে যেন ছাড়তে পারি
রাজার পোশাক।
গাইতি দিয়ে পাহাড়কে আঘাত হানলে কি সে
কথা বলে?
সমস্ত পাহাড়কে কাঁধে তুলে নিয়ে ভালোবাসা
তাকে আদর করে।

জরোষ্টারের প্রতি আরিম্যানের লোভ প্রদর্শন

মহীউদ্দীন

আরিম্যান

আমার সৃষ্টির বুকে তুমি ভরে দিয়েছ যেন নলের
বাঁশির মতো কান্না;
শীত—আকাশের কুয়াশা দিয়ে ঢেকেছ আমার বসন্ত।
আমার গৌরব টেনে ফেলেছ কাদায়;
আমার রক্ত দিয়ে লিখেছ তোমার ইতিহাস।
তুমি দাঁড়িয়ে আছ যেখানে সত্যের ছটায় উজ্জ্বল সিনাই,
তোমার প্রদীপ্ত ছাতের তলায় গুপ্ত আমার মৃত্যু।
মূর্খজনেরা বিশ্বাস করে আল্লার প্রতিশ্রুতিতে,
তার পথের যাত্রিগণ হয় অবশেষে পথভ্রষ্ট।
বিষে ভরা সুরার পেয়ালা ধরে সে মুখের কাছে তুলে;
ভক্তকে সে দেয় শূল, আর করাত, আর গলিত ক্রিমি।
সে পারে কেবল ফিরে ধরতে প্রার্থনার সুর,
কিন্তু হতভাগ্য বৃদ্ধ নূহের কান্না তো কোনো কাজে
এলো না।
নগর ছেড়ে চলে যাও কোনো অরণ্য—গুহায়,
ফিরিশ্‌তাগণের সঙ্গে কাটাও সমস্ত জীবন—কাল।
তোমার দৃষ্টির রহস্য দিয়ে তবে লোহাকে সোনায়
পরিবর্তিত কর
প্রার্থনা সঙ্গীত দিয়ে আগুন ধরিয়ে দাও আকাশে
কিম্বা মুক্ত গতি মূসার মতো ঘুরে বেড়াও পাহাড় পর্বতে
আর দেখ, যাঁকে দেখ্‌লে মানুষ পুড়ে হয় ছাই।
বর্জন কর পয়গম্বরী, আর যা কিছু কর,
ত্যাগ কর শূন্যগর্ভ পূজারীর পেশা।
পতিতের দূষিত করে, এই তো নিয়ম,
আগুনের শিখা ধাবমান শুক্‌নো খড়কুটার পানে।
পয়গম্বরগণ লিপ্ত হয় নিরঙ্কুশ সাধুত্ব লাভের তপস্যায়,
কেননা ভালোবাসায় আহত পয়গম্বরী তার ক্লান্ত।

জরোষ্টার
আলো এক সমুদ্র, অন্ধকার তার তীর,
এবং আমি ঝড়, বয়ে চলেছি সে সমুদ্রের বুকে।
মহাতরঙ্গ প্লাবন আবর্তে গর্জন করছে অন্তর–লোকে,
কূলভাঙা মুক্তি ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে?
এখনো অস্পষ্ট রয়েছে না– দেখা চিত্রের আকার,
আরিম্যানের রক্তে কেবল রূপ পেতে পারে সেই ছবি।
যে জীবন উদ্‌ঘাটিত করা হয় সে–ই তো প্রকৃত জীবন,
সংঘাতের মাঝে আপন শক্তির পরীক্ষা,
দুঃখের পথে যে আত্মার অভিযাত্রা তার গতি চলে
অপ্রতিহত–
যতক্ষণ না আল্লার মুখ থেকে সরিয়ে ফেলে পর্দা।
নিঃস্বার্থ সন্ধানীর একমাত্র কামনা সত্য,
আগুনে জ্বলন্ত রক্ত তার হেঁকে বলে, "লা–ইলাহা"।
রক্তের আগুনে জীবনের অবগাহন এক পরম সম্মান,
কেননা, শূলদণ্ডে প্রাণ বিসর্জন আল্লা–প্রেমিকের
জন্যে ঈদের উৎসব।
সত্যের পথে যা কিছু আসে সব আশিস্,
প্রিয়তমের কাছে থেকে আসে না কিছুই অপ্রিয়।
কেবল সৌন্দর্য দেখার জন্যে পিপাসিত নয় আমার নয়ন;
সমস্ত দৃশ্যের সাথে অংশ নেওয়া আমাদের ধর্ম।
অন্তর্জীবনের তাৎপর্য কি? আলোর জন্যে আকুল
আগ্রহ।
আর বাহ্যিক জীবন হচ্ছে প্রকাশ্য দৃশ্যের অনুসন্ধান,
অন্তর্জীবন এক অনুসন্ধান বাহ্যিক–জীবন এক দৃশ্য।
অন্তর্জীবনের ভালোবাসা মূসার মতো কথা বলে
আল্লার সঙ্গে।
সামনে চলতে চলতে আপন শক্তির মাঝে সংহত
করে নেয় সব কিছু।
অন্তর্জীবন আর বাহ্যিক জীবন, আবেগ আর আনন্দ,
একেকটি স্তর; ভালোবাসা এর থেকে বেরিয়ে এসে
এতে হয় লীন।
সেই এক কি? সমস্ত ধর্মের অস্বীকৃতি,
আর অন্যটি হচ্ছে, একাকীর জন্যে বিহিশতলোকের
অধিকার বর্জন। *(জাবিদনামা)*

শাশ্বতের গান

শঙ্খ ঘোষ

চন্দ্রমণ্ডল

ঈশ্বরের রাজ্য এই মর্ত্য আর এই স্বর্গলোক,
পিতৃসূত্র আমাদের এই চাঁদ, গ্রহতারাদল;
এই পথে হেঁটে যেতে যতকিছু সামনে চোখে পড়ে
সেসব দেখার জন্য তোমার নিবিড় দৃষ্টি হোক।
তোমারই আপনঘরে কেন যাবে অতিথির মতো—
যে তুমি আপনহারা কিছু-বা নির্ভয় হয়ে ওঠো !
তোমারই নির্দেশ বুকে তুলে নেয় এও, কিংবা সেও
'এভাবে না, ওইভাবে করো' বললে তাই করে তারা।
জগৎ তো শুধুমাত্র দৃষ্টি কিংবা শ্রুতির প্রতিমা
বিগত কালের মতো ঝরে যাবে প্রতিটি আগামী।
সন্ধানের মরুবুকে ঝাঁপ দাও উন্মাদের মতো
এমন প্রতিমাঘরে হয়ে যাও অ্যাব্রাহাম তুমি।
যখন তোমার চলা সাঙ্গ হবে দ্যুলোকে ভূলোকে
এ-জগতে ও-জগতে পরিক্রমা হয়ে যাবে শেষ,
তখন আরেক সপ্তস্বর্গ চাও ঈশ্বরের কাছে
চাও আরো শত শত অন্য কাল, শত অন্য দেশ।
স্বর্গনদীতীরে যদি মগ্ন হয়ে থাকো আত্মহারা
সদসৎ লড়াইয়ের থেকে যদি চলে যাও দূরে–
যদি ভাবো মুক্তি পাবে সব খোঁজ শেষ হয়ে গেলে
তবে তো কবরই ভালো, কী হবে রঙের স্বর্গপুরে !
মনে রেখ হে পথিক, আত্মা ঝরে যায় স্থানুতায়,
ততই সে জেগে ওঠে যত তার নিরন্ত উড়াল।
আনন্দ কেবল এই তারাদের সঙ্গে ছুটে চলা
আনন্দ চলার পথে বিরতি না নেওয়া ক্ষণকাল।

ব্যাপ্ত এই শূন্যতলে যখন চলেছি আমি ছুটে
যা ছিল উপরে, দেখি এখন তা নিচে আছে প'ড়ে
নিশাপ্রদীপের চেয়ে উঁচু এক তামসী পৃথিবী,
আশ্চর্য, আমারই ছায়া উড়ে যায় আমার উপরে;
যতই চলেছি দেখি কাছে আরো কাছে হয়ে আসে
দেখা দিতে থাকে যেন সামনে ওই চাঁদের পাহাড়।
বললেন রুমি, 'এসো, সমস্ত সংশয় ধুয়ে ফেলে
নিজেকে সুযোগ্য করো এইসব মন্ডলধারার।
চাঁদ আমাদের থেকে বহুদূরে, তবুও সে চেনা ;
আমাদের যাত্রাপথে এই হলো আদিতম স্তর ;
দেখে নিতে হবে এর সব কাল, দ্রুত কিংবা ধীর
দেখে নিতে হবে এর পাহাড়ের সমস্ত গহ্বর।'

ওই নীরবতা, ওই ভয়ংকর পর্বতের মালা
ভিতরে আগুন, বাইরে দ্বিধাচ্ছিন্ন কত গিরিদরি !
শয়ে শয়ে চূড়া তার, যেমন খাফ্‌তিন, ইল্‌দিরিম,
হুতাশন পেটে, আর মুখে শুধু ধোঁয়ার লহরী ;
একটি ঘাসের কণা, ওঠে না মাটির বুক থেকে,
অবাধ শূন্যের বুকে নেই কোনো পাখির ঝাপটও ;
কেবলই নির্জলা মেঘ, অসিতীক্ষ্ণ দুরন্ত বাতাস
মরা এ মাটির সঙ্গে যুদ্ধ করে যায় অবিরত।
রংহারা শব্দহারা ক্ষয়-হয়ে-আসা এ জগৎ
কোথাও প্রাণের চিহ্ন মরণেরও চিহ্ন নেই কোনো,
নাভিতটে নেই তার জীবনতরুর কোনো মূল,
সময়ের উরুমূলে নেই কোনো ঘটনা লুকোনো ;
যদিও বিশাল সৌরপরিবারে এও একজন–
এর ভোর, সন্ধ্যা এর, জানে না কোনোই আবর্তন।

বললেন রুমি, 'ওঠো, এক পা এগিয়ে সামনে যাও,
এমন জাগর ভাগ্য দেখো যেন বিফলে না যায়।
বাইরের চেয়েও এর ভিতরে অনেক রমণীয়,
আরেক জগৎ এর গহ্বরে গোপন প্রতীক্ষায়।
বোধময় হে মানুষ, যাকিছু তোমার সামনে আসে,
শ্রুতি আর দৃষ্টি দুই বৃত্ত দিয়ে তাকে বেঁধে নাও।
চোখে যদি প্রজ্ঞা থাকে দর্শনীয় হতে পারে সবই,
যোগ্য পরিমাপে তাকে নিতে পারে দৃষ্টির সীমাও।
যেখানেই নিয়ে যেতে চান রুমি, যাও সেইখানে ;
দুএক মুহূর্ত ভোলো তাঁকে ছাড়া সমস্ত কিছুকে ।
এই বলে মৃদু টানে আমার দুহাত ধরে তিনি
ঝটিতি এগিয়ে যান আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে।

ভারতীয় এক ঋষি, ভারতে যাঁর বিশ্বমিত্র নাম, আর
চাঁদের গুহায় আছেন যিনি সন্ন্যাসীর মতো

আমার সঙ্গীর কাঁধে হাত রেখে যেন অন্ধবৎ
দুই পা রেখেছি কোনো গভীর গুহার অবতলে ;
অন্ধকারে ছন্ন করা চাঁদের হৃদয় ভারাতুর,
এমনকী সূর্যেরও চাই প্রদীপ সেখানে যেতে হলে।
বোধবুদ্ধি যত ছিল, ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে তখন
সংশয় কল্পনা এসে ঘিরে নিল চেতনা আমার।
সত্যের বা স্থিরতার তৃপ্তি থেকে দূরে এই মন
চলেছে সে-পথে যার কোণে কোণে ওৎ পাতে মার ;
খোলা এ দৃষ্টির সামনে হঠাৎ দেখেছি আবির্ভাব,
উদ্ভাসিত ভোর এক- যদিও তা সূর্যোদয় নয়-
দেখি এক উপত্যকা, প্রতিশিলা যেখানে পূজক
দীর্ঘ তালবীথি ঘেরা যেন কোনো দানব-আলয়।

একি কোনো সত্য ভূমি ক্ষিতি অপ তেজ দিয়ে গড়া ?
নাকি এ ঘুমন্ত চোখে কল্পনায় আঁকা কোনো ছবি ?
বাতাস ভরাট ছিল মদিরার আনন্দ আবেশে
ধুলোয় চুম্বিত ছায়া-আলোর নির্যাস তারা সবই।
কোনো নীলাকাশ তার দিগন্ত ঘেরেনি কোনোখানে
সোনালি বা লালে তাকে রাঙায়নি কোনোই গোধূলি ;
সেখানে কখনো আলো তামসবন্ধনে বাঁধা নয়,
কখনো কুহেলি এসে জড়ায় না সন্ধ্যাভোরগুলি।
তারই তালবীথিতলে বসে এক ভারতীয় ঋষি
তাঁর দুই চক্ষুতারা ধুয়ে আছে উজ্জ্বল শিশিরে,
চূড়া করে বাঁধা চুল, অনাবৃত সমস্ত শরীর,
কুন্ডলী পাকিয়ে আছে শাদা এক সাপ তাকে ঘিরে,
ক্ষিতি ও অপের চেয়ে বহু উর্ধ্বতর এ মানুষ,
কল্পনামন্দিরে তাঁর জগৎ তো প্রতিমা কেবল,
দিনরাত্রি আবর্তনে বাঁধা পড়ে না তো তাঁর কাল
কিংবা ওই নীলাকাশে নেই তাঁর কোনো চলাচল।
রুমিকে বললেন তিনি 'সহযাত্রী কে ওই তোমার ?
চাহনিতে যেন ওর জীবনের বাসনা অপার !'

রুমি

পথে পথে ভ্রাম্যমাণ ও এক মানুষ, খোঁজে কী যে—
গ্রহের গড়ন নিয়ে স্থির কোনো নক্ষত্রের মতো।
মন পরিণত নয়, উদ্যম যদিও পরিণত,
ওর অপূর্ণতা জালে শহীদ হয়েছি আমি নিজে।
ওর কাঁচপাত্র দিয়ে বানিয়েছে স্বর্গের বলয়,
চিন্তা ওর হতে চায় গ্যাবরিয়েলের ধন্য সাথী !
ঈগলের মতো ঝুঁকে চন্দ্রকে সূর্যকে করে জয়।

আর ওর ঘূর্ণ্যতাল ছোঁয় নবমন্ডলের মাটি।
পৃথিবীর মানুষকে বলেছে ও মাতালের স্বরে
পরীরা প্রতিমা আর স্বর্গ হলো প্রতিমামন্দির।
দেখেছি জ্বলন্ত শিখা ওর ধূম্র ঢেউয়ের ভিতরে
দেখেছি কীভাবে ওর প্রণিপাতও মর্যাদাগভীর।
ওর চিরব্যাকুলতা যেন- বা বাঁশির আর্তিভরা,
বিচ্ছেদমিলন ওকে একইভাবে ধ্বংস করে যায়।
জানি না শরীর ওর মাটিজল কী দিয়ে বা গড়া,
জানি না প্রতিষ্ঠা আর স্থিতি ওর আছে বা কোথায়।

বিশ্বামিত্র বা জাহানদোস্ত

ঈশ্বরের বর্ণ নেই, জগৎ যদিও বর্ণধর।
কী সেই জগৎ বলো। মানুষ কী ? কীই বা ঈশ্বর ?

রুমি

মানুষ যেন-বা অসি এবং ঈশ্বর অসিধারী ;
শাণিত করার জন্য জগৎ পাষাণ যেন তারই।
প্রাচ্য জানে ভগবান, জানে না সে জগৎ কখনো,
প্রতীচী জগৎই জানে, তার নেই ভগবান কোনো।
সত্য সেবাধর্ম হলো ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি হানা
আর জীবনের সত্য নিজেকে উন্মুক্ত করে জানা।
এ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে যায় সাধক যখন
ঈশ্বরই আপন হাতে আশীর্বাদে ভরে দেন মন।
নিজের নিয়তি নিয়ে নেই যার কোনোই চেতনা
আত্মার আগুনে নয় ধাবমান তার ধূলিকণা।

জাহানদোস্ত
সত্তা-সত্তাহীনতার আবর্তে আবদ্ধ থেকে থেকে
এসব রহস্য প্রাচী অল্পই জেনেছে এতদিন।
আমরা অন্তরীক্ষজন, আমাদের কাজ শুধু দেখা–
প্রাচী-র ভবিষ্য নিয়ে আমার হৃদয়ে ক্ষোভ নেই।
কাল আমি দেখেছি যে কাশ্‌মারুদ চূড়ার উপরে
স্বর্গ থেকে নামলেন কোনো এক দিব্য দেবদূত ;
তাকিয়ে দেখলেন তিনি আমাদের ওই ধূলিস্তূপ
দৃষ্টি থেকে যেন তাঁর দেখার আনন্দ এল বয়ে।
'বিশ্বাসীর কাছে কিছু গোপন কোরো না' বললাম,
'কী তুমি দেখছ চেয়ে দূরে ওই নীরব ধূলোয় ?
কোনো ভেনাসের রূপে মুগ্ধ হয়ে গলে গিয়েছ কি ?
হৃদয় দিয়েছ ছুঁড়ে শক্ত ব্যাবিলনের কুয়োতে ?
বললেন তিনি, 'আজ দিন এল প্রাচ্য উত্থানের ;
দেখেছি প্রাচী-র বুকে নতুন সূর্যের ঝলকানি।
পথের পাথর থেকে যেন-বা প্রবাল ছুটে আসে
এবং কুয়োর থেকে জেগে ওঠে কত-না জোসেফ !
স্ফুরিত দেখেছি ওর চার দিকে পুনরুত্থান
দেখেছি পাহাড়পুঞ্জ থরোথরো কাঁপে আলোড়নে ;
আজারের সীমাকে সে ছেড়ে চলে যাবে এইবার
চিরসময়ের জন্য ছেড়ে যাবে বিগ্রহের টান।
সুখী সেই জাতি যার হৃদয়ে জেগেছে চঞ্চলতা,
নিজেরই মাটিকে ছেনে নিজেকে যে নতুন করেছে।
সিংহাসনে দেবদূত জানে সেই উৎসবের ভোর
যখন সমগ্র জাতি জেগে ওঠে দুই চোখ মেলে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ ভারতীয় ঋষি ; তারপর
আবার আমার দিকে তাকালেন কিছু-বা অধীর।

প্রশ্ন করে উঠলেন, 'বুদ্ধির মৃত্যু কী'? আমি বলি,
'চিন্তার বিলয়।' 'আর হৃদয়ের মৃত্যু ?' 'জপনাশ।'
'শরীর কী ? 'আমি বলি, 'জাগে যা পথের ধুলো থেকে।'
'কাকে বলে আত্মা ?' বলি, 'ঈশ্বরের গোপন কথা সে।'
'আর এ জগৎ ?' বলি, 'মুখোমুখি স্থির হয়ে আছে।'
'এই যে বিজ্ঞান, শিল্প, এরা ?' বলি, 'এ কেবল তুষ।'
'প্রমাণ বলবে কাকে ?' 'পরম প্রেয়র মুখখানি।'
'সামান্য লোকের ধর্ম ?' সে কেমন ?' 'সত্যাবলোকন।'
এইসব কথা তাঁর হৃদয়ে প্রসাদ এনে দিল,

আমাকে বললেন খুলে তাঁর যত সূক্ষ্ম সুভাষণ।

ভারতীয় ঋষির নটি বাণী

১

সত্য-ঢেকে-রাখা কোনো আবরণ নয় এ জগৎ ;
জলে প্রতিবিম্ব কবে রুদ্ধ করে ঝাঁপাবার পথ ?

২

আনন্দ আনন্দ শুধু আরেক জগতে জন্মলাভ,
পেয়ে যেতে পারি যাতে আরো এক যৌবনস্বভাব।

৩

ঈশ্বরের মৃত্যু নেই, তিনি শুধু জীবনেরই ধারা ;
জানেনই না কবে তাঁর সাধকের ঘটে প্রাণহানি।
আমরা যদিও পাখি পালকবিহীন ডানাহারা-
ঈশ্বরের চেয়ে বেশি মৃত্যুর বিজ্ঞান আমরা জানি।

৪

সময় ? সে হলো এক বিষ দিয়ে মাখানো মাধুরী,
আক্রোশে মিশিয়ে দেওয়া যেন কোনো করুণার মতো ;
সে-আক্রোশ থেকে মুক্ত নয় কোনো প্রান্তর বা পুরী-

করুণা-যখন শুধু বলতে পারো 'হয়েছে সে গত'।

৫

হে প্রবুদ্ধ বন্ধু, জেনো অবিশ্বাসই মৃত্যুর সমান ;
মৃতের উপরে কোনো বীরের জেহাদ-সাজে কি তা ?
বিশ্বাসী-সে চিরজীবী, নিজের সঙ্গেই যুধ্যমান,
নিজেকে সে গ্রাস করে, যেমন হরিণ ধরে চিতা।
ধর্মপীঠে নিদ্রাতুর ধার্মিকের চেয়ে ভালো ঢের
বিগ্রহের স্তরে মগ্ন জাগ্রত হৃদয় কাফেরের।

৭

যে কেবল ভুল আর পাপই দেখে, অন্ধ সেই চোখ ;
সূর্য তো কখনো তার আলোয় দেখে না রাত্রিলোক।

৮

যে বীজ পাঁকের মধ্যে, তারই থেকে হয়ে ওঠে গাছ ;
একই-সে পাঁকের টানে মানুষের কিন্তু অপমান।
বীজ সেই পাঁক থেকে পায় কত বাঁকাচোরা নাচ
তার সব গ্রাস নিয়ে সূর্যের কিরণ করে পান।

৯

গোলাপকে বললাম, 'বলো তো তোমার দীর্ণবুকে
বাতাস বা ধুলো থেকে কীভাবে ধরেছ গন্ধ রং ?'
উত্তরে গোলাপ বলে, 'বুদ্ধিহারা ওহে বুদ্ধিমান
কীভাবে-বা বাণী পাও নীরব তড়িৎ শিখা থেকে ?
এর ওর টানে জাগে আমার শরীরে ভরা প্রাণ–
তোমার প্রকাশ্য সবই, আমি যে গোপনে দিই টান।'

সারোশের উদ্দীপন

এই বলে এতক্ষণে প্রাজ্ঞ তাঁর কথা থামালেন,
আত্মবিভোরতা নিয়ে, গেলেন জগৎ ছেড়ে চ'লে
নিজেকে নিজের থেকে ছাড়ালেন উদ্‌ভাস-আকুল।

তার পরে ঐশ্বরিক দৃষ্টির জাদুতে সত্তা ধ'রে
শুভংকর রাত্রিবেলা এল এক সুকুমার প্রাণী,
সেই তারাহীন রাতে যেন কোনো উদ্দীপিত তারা
যা এলে ধুলোরও কণা হয়ে ওঠে সিনাই পাহাড়
যেনো এলে কোনোখানে আলো নেই আবির্ভাবও নেই।
দুধারে কুঞ্চিত চল নেমে এসে ছোঁয় তার জানু
তারই মুখ থেকে সব জ্যোতি পায় পাহাড় বা সানু।
আপাদমস্তক যেন মত্ত জপে হয়ে মজ্জমান
অমদ্যপ সে-মাতাল ছড়ায় মধুর স্তবগান।
সামনে তার কল্পনার আলোর প্রদীপ আলোড়িত
আদি স্বর্গমন্ডলের প্রাচীন খেয়াল দিয়ে ধৃত ;
সে-দীপের সামনে কেউ বহুবর্ণ অবয়ব পায়–
শকুন চড়ুই খায়, হরিণকে ধরে এসে চিতা।
রুমিকে বললাম ডেকে,'সবই তো হেঁয়ালি জানো তুমি,
ক্ষীণদৃষ্টি এ-আমাকে সমস্ত বুঝিয়ে বলো মিতা।'
বললেন তিনি, 'এই অবয়ব রূপোর ঝলকে
উদ্‌ভাবিত হয়েছিল পূত ঈশ্বরের চিত্তলোকে ;
আত্মপ্রকাশের এক অধীর আনন্দে তার প্রাণ
নেমে এসেছিল এই আমাদেরই সত্তার আবাসে
ভাগ্য তার নির্বাসন, আমাদেরই মতো ভ্রাম্যমাণ,
তুমি নির্বাসিত আমি নির্বাসিত, নির্বাসিত সেও।
সারোশ, এ নাম নিয়ে গ্যাব্‌রিয়েলের পাশে স্থান-
বোধ থেকে উড়ে এসে বোধকে সে জন্ম দিয়ে যায়।
তারই তো শিশিরে খোলে আমাদের ঘুমন্ত মুকুল,

শ্বাসের আগুনে তার জ্বলে ওঠে নিভন্ত অঙ্গার
হৃদয়ে তন্ত্রে কবি সুর তোলে তারই মেজরাপে
সে-ই এসে ছিঁড়ে ফেলে কাবা-র সমস্ত আবরণ।

সুরের আগুনে তার দেখি আমি গোটা বিশ্বলোক
মুহূর্তের জন্য সেই গান থেকে অগ্নিশিখা হোক।'

সারোশের গান

ভয় হয় যে মরীচিকার লক্ষ্যে যেন যাচ্ছ জাহাজ বেয়ে
আচ্ছাদনের মধ্যে জাত, আচ্ছাদনের মধ্যে হবে মরণ।
রজি-র দেওয়া অঞ্জন এই চোখের থেকে সরিয়ে নিয়ে দেখি
শাস্ত্রবুকে লুকিয়ে আছে সবজাতিরই ভাগ্যলেখার গড়ন।
মাঠবীথিতে ঘূর্ণি নাচো, ঘূর্ণি নাচো মরু বা পর্বতে
নিজের ওপর ঘূর্ণিঘাতে মেঘের ভিতর তড়িৎ ধসে যায়।
পশ্চিমিদের সঙ্গে থেকে অনেক খুঁজে দেখেছি অল্পই
তেমন মানুষ, সুরের টান যে শেষ অবধি মেলায় না সংখ্যায়।
লড়াই করার আর্তি ছাড়া কোথাও তো সেই সামীপ্য নেই আর
'গোলাপজলে সুবাস' তুমি বলছ, যাও, মাতাও গোলাপঝাড়।
হে অগভীর সন্ন্যাসীজন, আত্মতা যে ক্ষণিক, মানছি বটে,
কেবল, তুমি দেখতে পাও না ঘূর্ণিকে সেই বুদবুদেরও পটে।
এই-যে মধুর গান শোনা যায়, এ নয় কোনো চারণসুরলহরী–
বাঁশির মধ্যে উঠছে কেঁদে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত পরী।

দেবদূতেরা বলেন যাকে জ্যোতি-উপত্যকা,
সেই যর্ঘমিদ উপত্যকার ধারে
প্রেমের বা আকুতির পথ নির্দেশক রুমি–যাঁর
মুখের সমস্ত কথা আমাদের তৃষার্ত গলার
ঝর্নাজল- বললেন,'আগুন আছে যে কবিতায়
"তিনিই ঈশ্বর" এই বোধ থেকে জন্ম হয় তার।
সেই মন্ত্রে ঝোপঝাড়ও হয়ে ওঠে গোলাপ বাগান
সেই মন্ত্রে মিশে যায় সত্য কাকে বলে সে-প্রমাণ,
সেই মন্ত্রে ভিখারিও হয়ে ওঠে রাজার সমান।

শরীরের রক্ত আরো দ্রুত বয় সেই মন্ত্রবলে
সত্তার চেতনা আরো তীব্র হয় হৃদয়ের তলে।
এমন তো কত কবি আছেন যাঁদের শিল্পজাদু
কটাক্ষের দস্যু হয়ে হৃদয় লুণ্ঠন করে যায়;
এই ভারতেরই কবি-(ঈশ্বর বাঁচান যেন তাঁকে
কথার বিলাস থেকে চিত্ত তাঁর মুক্তি পেয়ে যাক)–
দীক্ষা দিয়েছেন যেন প্রেমই কারণ হয়ে ঘোরে
অজারের শিল্প যেন শিখে নেয় ঈশ্বরসখারা।
তাপকাতরহীন তাঁর যেন চড়ুইয়ের গান,
বাসনামথিত লোকে জানে তাঁকে–মানুষ না-শব।
যে-গান মানে না কিছু-মধুরের চেয়েও মধুর–
তেমন প্রলাপ, সে তো স্বপ্নের ভিতরে কলরব !
কবি, তাঁর ধর্ম হলো খোঁজা শুধু, খুঁজে খুঁজে ফেরা,
আকাঙক্ষা জাগিয়ে তোলা, দিনে দিনে রুদ্ধ করা তাকে ;
নিজেরই হৃদয় বলে কবিকে জেনেছে সব জাতি
যে-জাতির কবি নেই সে কেবল স্তূপাকার মাটি।
জগতের নকশা বুনে দিতে পারে মত্ততা বা তাপ
নেই যার মদ-তাপ সে-কবিতা নিছক বিলাপ।
মানুষকে গড়ে দেওয়া লক্ষ্য যদি হয় কবিতার
ভাবীকথনের জন্য কবিতাই উত্তরাধিকার।'

বললাম আমি, 'সেই ভাবীকথনেরও কথা বলো,
তোমার আশ্রিতজনে বলো সব রহস্য আবার।'
তিনি বললেন, 'তাঁরই চিহ্ন হলো জাতি আর জন
তাঁরই সৃষ্টি থেকে জাত, সব স্রোত শতাব্দীধারার।
তাঁরই তো নিশ্বাস লেগে ইট বা পাথরও বলে কথা;
তিনি বীজ বোনা মাঠ, আমরা সব শস্য যেন তার।
গ্যাব্রিয়েলের পাখা জুড়ে দেন সব ভাবনায়

শুদ্ধ করে দেন তিনি আমাদের তন্তু আর হাড় ;
যে-গুঞ্জন জেগে ওঠে আমাদের হৃদয় কুহরে
তাঁর ঠোঁটে লেগে তা-ই হয়ে ওঠে তারা আলো সার,
তাঁর সূর্যে নেই কোনো অস্তাচল, অন্ত নেই কোনো,
তাঁকে না মানলে কেউ পরমতা পাবে না কখনো।
তাঁর মুক্ত মানুষেরই সঙ্গ হলো ঈশ্বরকরুণা
ঈশ্বরের রোষ হলো তাঁরই হাতে অধীর আঘাত
হয়ে ওঠো বিশ্বচিৎ , পালিয়ো না তাঁর কাছ থেকে
তিনিই একত্র বেঁধে রেখেছেন শরীর ও মন।
ঝটিতি এগোও তবে যর্ঘমিদ-দিশাপথ ধরে
যেন তুমি দেখতে পাও যা কিছু খোদারই যোগ্য, সব–
স্ফটিকদেয়ালগায়ে যা কিছু খোদাই করা আছে
গাঁথা দেখো সেইখানে ভাবীকথনের চার স্তব।'

যে চেয়েছে উড়ে যেতে গ্যাব্রিয়েলের পাখা ধরে
সেই আকুলতা জানে পথ, কোনো নির্দেশ ছাড়াই;
সেই আকুলতা জানে দীর্ঘপথও দুপা মাত্র দূরে
সে-পথিক জানে শুধু দাঁড়িয়ে থাকাই ক্লান্তিকর।
যর্ঘমিদ লক্ষ কর মাতালের মতো আমি ধাই
যেতে যেতে দেখা দিতে থাকে তার দিব্য চূড়াগুলি।
কী আর বলব সেই জগতের মহিমার কথা–
সাতটি নক্ষত্র তাকে ঘিরে ঘিরে ঘোরে অবিরাম।
তারই আলো দিয়ে সব দেবদূত ভিতরে ভাস্বর
তারই ধুলো থেকে জেগে দৃষ্টি তাঁর ধুয়েছে প্রভায়।
ঈশ্বর আমাকে আজ দিয়েছেন দৃষ্টি মন কথা
দিয়েছেন গূঢ়লোকে খুঁজে দেখবার আকুলতা ;
বিশ্বরহস্যের সেই যবনিকা খুলে পাকে পাকে
ধর্মগুরুদের সব জ্যোতিস্তব শোনাব তোমাকে।

গৌতমের জ্যোতি

লীলাচপল নর্তকীটির অনুশোচন

গৌতম

পুরনো মদ বা যুবতী প্রেয়সী কিছুই নয় ;
দ্রষ্টার কাছে স্বর্গের পরী কিছুই নয়।
স্থির ভাবো যাকে স্থায়ী ভাবো যাকে, নশ্বর সব,
মরুপর্বত স্থলজলতট কিছুই নয়।
প্রতীচীর জড় বিজ্ঞান আর প্রাচী-র জ্ঞান
সে শুধু প্রতিমা। কী দেবে প্রতিমা ? কিছুই নয়।
ভাবো আত্মন্, মরুপথে যেতে করো না ভয়
তুমিই জীবন, ও-দুই জগৎ কিছুই নয়।
আমারই চোখের পদ্মে গড়েছি যে পথ, তাতে
ঝরাবালি আর ক্যারাভান—সে তো কিছুই নয়।

যত সংশয় যত অনুমান, কিছুই নয়;
পৃথিবীতে আসা পৃথিবীকে ছাড়া, সেটাই সব !
হাতে ঈশ্বর দেন যে স্বর্গ, কিছুই নয়
তোমার শ্রম যে স্বর্গকে দেয় সেটাই সব।
আত্মার খোঁজো আশ্রয় ? সে তো কিছুই নয়
বন্ধুজনের দুঃখে অশ্রু, সেটাই সব।
মদালস চোখ, লীলাকটাক্ষ, গানের রব
সবই তো সুচারু, এরও চেয়ে আছে চারুতাময়—
কপোলমাধুরী পলকের, সে তো পলকে ক্ষয়,
আদর্শ আর কাজের মাধুরী—সেটাই সব।

নর্তকী

যন্ত্রণার দিয়ো না ভার এ চঞ্চল বুকে
এ কুঞ্চিত চিকুরে দাও আরো দুএক গুছি

আমার বুকে তড়িৎ প্রভা তোমারই উদ্‌ভাসে
সূর্যে চাঁদে দিয়েছি ঢেলে তীব্র আশারুচি।
ঈশ্বরের অস্তিসুখে প্রতিমা গড়ি ক্ষেম
আশায় ভরা মনকে শুধু ছলনা করে প্রেম।
আলসভরে নতুন সুর গাইতে পারি যাতে–
মাঠের মূল পাখিকে ফের ফিরিয়ে দাও মাঠে।
মহিমা তুমি দিয়েছ, দাও শিকল খুলে পা-র
এ রাজসিক পোশাক খুলে পরাব চীরবাস–
পাহাড়ে যদি কুঠার হানি, এমন কীসে আর
প্রেমই পিঠে বইতে পারে গোটা পাহাড়ভার !

জরথুস্ত্রের জ্যোতি
জরথুস্ত্রকে অহ্রিমনের প্রলোভন
অহ্রিমন
তোমারই কারণে কাঁদে আমার প্রাণীরা যন্ত্রতানে
তোমারই কারণে সব বৈশাখীও হয়ে গেছে মাঘ
হেনেছ আমাকে তুমি পরাভবে আর অপমানে
আমারই রক্ততে মেখে ধরেছ এ কলঙ্কের দাগ।
সত্য শুধু বেঁচে থাকে তোমার সিনাই মন্ত্র-পাঠে
আমার বিনাশঘর তোমারই ধবল দুই হাতে।
ঈশ্বরের চুক্তিনামা মেনে চলা নিছক বোকামি,
তাঁরই ইচ্ছাপথে চলা, সে-কেবল ভুলপথে ঘোরা ;
ওৎ পেতে আছে বিষ গোলাপরাঙানো তাঁর মদে।
পতঙ্গ করাত ক্রুশ, এই হলো উপহার তাঁর।
স্তব ছাড়া নোয়ার তো অন্য কোনো পাথেয় ছিল না
কিন্তু সেই অভাগার কথাতে কীইবা কাজ হলো।
তাই, ছেড়ে যাও পুরী, লুকোও নিজেকে গুহাতলে
কিংবা সঙ্গ নাও ওই আলোর প্রাণীর যাত্রাপথে

ধুলোকে পলকপাতে করে নাও পরশপাথর
মাত্র এক স্তব দিয়ে আগুন জ্বালাও স্বর্গলোকে ;
মোজেজের মতো ধাও পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রাম্যমাণ,
প্রজ্ঞার শিখার তাপে অর্ধ-অবসিত হয়ে যাও ;
নিশ্চিতই ছেড়ে দিতে হবে সব ভাবীকথা, আর
ছেড়ে দিতে হবে এই মোল্লাদের নিয়ে মেতে থাকা।
তুচ্ছের ছোঁয়ায় থেকে মহৎও তো তুচ্ছ হয়ে যায়
শিখাই চরিত্র যার সেও হয়ে যায় টুকরো কাঠ।
সন্তদের চেয়ে নিচে যতদিন পয়গম্বর
প্রেমপথে ভাবীকথা ততদিন শুধু বিড়ম্বনা।
জেগে ওঠো, আর এসো, একতার নীড়ে হও জড়ো
ছেড়ে যাও স্ব-প্রকাশ, অগোচরে দিনপাত করো।

জরথুস্ত্র
আলো হলো পারাবার, তটভূমি শুধু অন্ধকার
আমার মতন স্রোত কখনো জাগেনি বুকে তার।
অস্থির ঢেউয়ের তালে হৃদয় আমার আত্মহারা
কী করবে এই স্রোত তটতল ছিঁড়ে ফেলা ছাড়া ?
রংহারা ছবি, যাকে মানুষ দেখেনি কোনোদিনও
অত্রিমনের রক্ত তাকে শুধু দিতে পারে রং।
জীবন, সে হলো শুধু শুক্তিকে পরখ করে দেখা
জীবনরহস্য হলো একমাত্র আত্মবিকিরণ।
আত্ম পরিণত হয় দিনে দিনে বেদনার টানে
তার পরে একদিন খোলে ঈশ্বরের আবরণ।
নিজেকে ঈশ্বরদ্রষ্টা ঈশ্বরেরই মধ্য দিয়ে জানে
'একেশ্বর' ডাক তার রক্তে তোলে গভীর রণন।
রক্তের রণন সে তো প্রেমেরই প্রগাঢ়তম মান
প্রেমেরই উৎসব এই করাত বা ফাঁস, কেঠো ঘের।
প্রেমের চলার পথে যা-কিছুই আসে তা-ই ভালো;
স্বাগত, স্বাগত তবে নির্দয়করুণা প্রেমিকের।

আমার একারই চোখ ঈশ্বরপ্রকাশ চায়নি তো ;
পাপ বলে মনে হয় সুন্দরের একা দেখাশোনা।
কাকে বলে নির্জনতা ? বেদনা, যন্ত্রণা আকুলিত ;
সজনতা প্রজ্ঞা দেয়, নির্জনতা কেবলই এষণা।
নির্জনের প্রেম হলো ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপন
রাজা হয়ে ওঠে প্রেম খোলাপথে চলে সে যখন।
প্রকাশ বা নির্জনতা আবেগেরই পরম মহিমা
সেই একইসঙ্গে তারা আমাদের দীনতারও সীমা।
নির্জনতা কাকে বলে ? গীর্জা বা অলিন্দ ছেড়ে যাওয়া ;
প্রকাশ কী ? কখনোই যাওয়া নয় একা স্বর্গধামে।
নির্জনে বা প্রকাশনে উভয়ত আছেন ঈশ্বর–
নির্জনে সূচনা তার, প্রকাশ পায় সে পরিণামে।
তুমি তো বলেছ এই ভাবীকথা কত বিড়ম্বনা;
মানুষকে গড়ে প্রেম, যখন সে প্রেম পরিণত।
আনন্দ, পৃথিবীপথে চলা মুক্ত হৃদয়ের মতো।

খ্রিস্টের জ্যোতি

ঋষি টলস্টয়ের প্রজ্ঞাদৃষ্টি

সপ্তমৃত্যুর পাহাড়শ্রেণী ওই, উপত্যকা মাঝখানে
কোথাও শাখা নেই কোথাও পাতা নেই পাখিরও নেই কোনা সাড়া;
ধোঁয়ার জালে ঘিরে চাঁদের প্রভাকেও অন্ধকার করে আনে
সূর্য যেন তার ব্যাপ্ত আকাশেও তৃষ্ণা নিয়ে দিশেহারা।
উপত্যকাটির মধ্য দিয়ে যেন বইছে পারদের নদী
তার সে আঁকাবাঁকা স্রোত কে মনে হয় ঝাপসা ছায়াপথ মতো
ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ে পাকের পরে পাকে তীব্র স্রোতে নিরবধি
ছুটছে, যেন পথে চূড়া বা গর কিছুই বাধা নয় তত।
সেখানে একজন পারদে ভরা স্রোতে প্রোথিত দাঁড়িয়েছে, আর
জপছে মুখে মুখে লক্ষ নিষ্ফল আর্ত বিলাপের ভার।
ভাগ্যে নেই তার বৃষ্টি, জল নেই, বাতাসও নেই কক্ষনো

তৃষ্ণালাঞ্ছিত, পারদ ছাড়া তবু অন্য জল নেই কোনো।
তখন নদীতটে তাকিয়ে দিতে পারে একশো ক্যারাভান বাওয়া
কিংবা অনায়াসে নষ্ট করে দেয় চার্চে সাধকের মন
শ্রী থেকে কুশ্রীতে, কু থেকে সুশ্রীতে পালটে যায় তার চাওয়া।
প্রশ্ন করি তাকে, 'কে তুমি? নাম বলো। কী চাও তুমি এইখানে?
কেন–বা এ–বিলাপ? আর্তনাদ কেন এমন চোখ সামিরি– মন্ত্রকে জানে,
আমার পেশা হলো জাদুর মায়াখেলা, নাম তো ইফ্রানজিন।'

হঠাৎ দেখি চেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে রুপোলি ধারাটির টান
আর সে মজ্জিত যুবার শরীরের অস্থিপঞ্জর ভাঙা।
চেঁচিয়ে বলছে সে, 'হায় রে হায় একী ভাগ্য হলো খান্ খান্
হায় রে হায় আজ অর্থহীন এই বিলাপে কেন আমি কাঙাল!'
'স্পষ্ট দেখবার চক্ষু থাকে যদি' বলল ইফ্রানজিন
'একটু অন্তত তাকিয়ে দেখো তবে নিজেরও কীর্তির দিকে।
মেরীর সন্তান, সেই যে সৃষ্টি সর্ব- আলোকের ঋণ।
যে আলো গড়েছিল সীমা ও অসীমের বিশ্ব আর পৃথিবীকে
সেই- যে বধভূমি সেই- যে ক্রুশকাঠ সেই যে পাণ্ডুর মুখ
কীভাবে মেতেছিলে কীভাবে মেতেছিল এমন আকাশের তলে
সেই- যে তুমি, যার হৃদয়ে কখনোই মেলেনি বিশ্বাসসুখ
কেবলই রুপো দিয়ে মূর্তি গড়ে দিন যেপেছ অর্চনাছলে
জানোনি তুমি কিছু জানোনি তুমি সেই পুণ্য–আত্মার প্রভা
বিকিয়ে দিয়েছিলে আত্মা, কিনেছিলে কেবলই শরীরের শোভা!

রূপসী মেয়েটির মাতাল ছলাভরা এই যে ভর্ৎসনারেশ
ছুরির মত এসে বিঁধল যেন সেই আর্ত যুবকের বুকে।
বলল সে তখন, 'দেখাও গম আর বিলাও যব বেশ সুখে,
তোমারই জন্য তো শেখ ও ব্রাহ্মণ বিকিয়ে দিল নিজদেশ।
অবিশ্বাস দিয়ে করেছ তুমি সব ধর্মযুক্তিকে দীন
লাভের লোভে আজ প্রেমকে করে দিলে এমন তুচ্ছতালীন।
তোমার প্রেম হলো কেবলই যন্ত্রণা, গোপন যন্ত্রণাভার
তোমার ঘৃণা হলো মৃত্যু, এনে দেয় হঠাৎ- মৃত্যুর পার।

মাটির পৃথিবীতে জলের পৃথিবীতে নিজেকে জড়িয়েছ নিজে
ইশ্বরের থেকে নিয়েছ কেড়ে তাঁর আপন সেবকের মন।
যে- জ্ঞান খুলে দেয় বন্ধু পৃথিবীর যেখানে যত বন্ধন
তোমার মনকে তা কেবলই ভরে দেয় ধ্বংসচিন্তার বীজে।
সত্তা যার কাছে সত্য, সে মানুষ ভালোই জানে মনে মনে
তুমি যে এতদিন করেছ পাপ সেটা আমারও চেয়ে গুরুতর।
গমিত আত্মাকে ফিরিয়ে দেন তিনি আবার শরীরের কোণে
তুমি সে শরীরের সমাধি গড়ে তার ভিতরে আত্মাকে ভরো।
আমরা যে আঘাতে হেনেছি একদিন পুর্ণ মানবতা তাঁর
দৈবতাকে তাঁর হানছে সে আঘাতে তাঁরই তো অনুগত জন–
তোমারই ধ্বংসতে জীবন পাবে জেনো বিশ্বজনসংসার
দাঁড়িয়ে দেখো তুমি কীভাবে আসে আজ তোমারও অন্তিম ক্ষণ।'

কবি ইকবালের শেষ কবিতা

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

ধার্মিকজন মোমিন মানুষ তাঁহার কাহিনী শোন,
বলিতেছি শোন তাঁর পরিশ্রম লিপিঃ
মরণ যেদিন তাঁহার দুয়ারে বাজাবে রুদ্র বাঁশী
মোমিন তাহারে হাসিমুখে নিবে করি'।

অতীতের সুর আবার বাজিবে,
হয়তো বাজিবে নাকো !
হেজাজের বায়ু তুলিবে শিহর।
হয়তো তুলিবে নাকো !
এই যে ফকির দূর-দরবেশ তাঁহার জীবন-দিন,
আজিকে তাঁহার চির–অবসান হল।
তারপরে এই জীবন-ধেয়ানী রহস্যজ্ঞানী জন
হয়তো আসিবে এই ধরণীর ঘরে;
কে জানে সে কথা বল ?
চলে-যাওয়া-জন হয়তো আসিবে না কো !

জাবিদ নামা
আমিনুল ইসলাম

এক

জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং চিরস্থায়ী উভয়ই,
সৃষ্টি–প্রতিভা আর ঔৎসুক্যই এর সব কিছু।

তুমি জীবন্ত? তবে উৎসুক হও, সৃষ্টিধর্মী হও;–
আমার মতো সারা জগতকে জয় করো।

যা প্রতিকূল তা ধ্বংস করে দাও,
তোমার অন্তর থেকে জগৎ সৃষ্টি করো।

অপরের গড়া পৃথিবীতে জীবনযাপন–
স্বাধীনচেতা মানুষের কাছে তা অতীব দুরূহ।

দুই

আন্তরিকতার নীতিকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করো,
সুলতান ও আমীরের ভয় থেকে নিজেকে পবিত্র করো।

ক্রোধে বা আনন্দে কখনো ত্যাগ করো না বিচারবোধ,–
দারিদ্র্যে অথবা সম্পদে কখনো ভুলে যেয়ো না তাকে।
দেহ মনের পরিপূর্ণ সংরক্ষণ বিনা
পরম ক্ষমতা লাভ সম্ভব হয় না।
ওড়ার আনন্দ বিনা জীবন কিছুই নয়,–
নীড় নয় তার প্রকৃতির অনুকূল।

ধর্মের পথে হীরকের মতো কঠোর হয়ে বেঁচে থাকো –
দিলকে আল্লার দিকে রাখো,
সন্দেহ বর্জন করে বেঁচে থাকো।

হেজাযের সওগাত

ارمغان حجاز

ইব্‌লীসের পরামর্শ সভা

মনির উদ্‌দীন ইউসুফ

ইব্‌লীস

পঞ্চভূতের লীলাভূমি এই মোহ-সুন্দর প্রাচীন ধরা,
আরশবাসীর বাসনার খুন শুষিয়াছে যার ধূলির খরা।
এরি ধ্বংসের আয়োজনে আজ লিপ্ত হয়েছে তাঁহার হাত;
যিনি এর নাম রেখেছেন সুখে 'কুন্‌ফায়াকূন' সৃষ্টি-রাত।
আমি দেখায়েছি য়ুরোপবাসীরে রাজ্যলাভের স্বপন এক,
আমি ভাঙিয়াছি মস্‌জিদ আর গীর্জা ঘরের যত না ভেক।
সঙ্গতিহীনে আমি শিখায়েছি ভাগ্যের কথা যতন করি,
ধনীর চক্ষে পুঁজির স্বপন লোভন-শোভন দিয়েছি ধরি।
কে পারিবে আজ করিতে ঠাণ্ডা দৃপ্ত সে শিখা বহ্নিমান?
লেলিহ জিভেতে লুকায়ে যাহার শয়তানী তাপ অণু সমান।
যে-তরু তুলেছে আকাশেতে শির আমারি জলের সেচনে আজ,
কে পারিবে তার নোয়াইতে মাথা? লাজে ফিরে যাবে দৃপ্ত বাজ!

প্রথম পারিষদ

সন্দেহ নেই, আছে মজবুত শয়তানী রাজ দুনিয়া 'পর,
জনগণ যার অমিত প্রভাবে গোলামির মাঝে মত্ততর।
অনাদি হইতে মানব-ভাগ্যে রয়েছে প্রণতি আমরা জানি,
'কেয়াম' তাহার নাহিক নমাজে 'সিজদাই' শুধু নিয়াছে মানি।
এমন হৃদয়ে রহে না বাসনা,–যদি বা কখনো জন্ম লয়,
অকাল-মৃত্যু সাথী হয় তার, অথবা পঙ্গ হয়ে সে রয়।
বিপুল যত্নে ধর্মে এমন ধরাতে পেরেছি আমরা চিড়.
সূফী ও মোল্লা দুই-ই আছে আজ শক্তির কাছে নোয়ায়ে শির।
প্রাচ্যের তরে এমনি আফিম প্রয়োজন ছিল. তাই তো জানি–
'কাওয়ালী'র চেয়ে বেশী কিছু আর হয়নি 'ইলমে কালাম' বাণী।
কা'বারে ঘিরিয়া 'তওয়াফে'র ধুম যদি বা রয়েছে, কিসের ভয়?
মুসলমানের তলোয়ারে আজ ধার নেই, ভোঁতা পড়িয়া রয়।
বলিতে পার কি কাহার হতাশা গড়িয়াছে এই যুক্তিবাদ?
'মুসলিম তরে হারাম জেনো গো, এযুগে সকল যুদ্ধ-স্বাদ'।

দ্বিতীয় পারিষদ
তবু বল দেখি গণতন্ত্রের বুলি সে কেমন মোদের লাগি?
দেখিতেছি আমি, বিপদ যেন গো গণরাজ নামে উঠিছে জাগি।
প্রথম পারিষদ
জানি তাহা সখা; কিন্তু আমার বিশ্ব-জ্ঞানের বিজ্ঞতাতে,
বলিতেছি, এটি বহু পুরাতন, বিপদ কিছুই নাহিক তাতে।
আমরাই আজ বাদশাহীকে যে সাজায়েছি গণ-পোশাক সাজে,
যখন দেখেছি আত্ম-বোধ কিছুটা জেগেছে মানুষ মাঝে।
রাজ্য-শাসনরীতির তত্ত্ব গুরুতর এক হেঁয়ালি যার–
রাজা ও নেতার সংজ্ঞার মাঝে খুঁজে পাবে নাকো অর্থ তার।
গণপরিষদ কিংবা তখ্‌ত একই চিত্রের দুইটি দিক,
অপরের জমি প্রতি যার চোখ, সেই রাজা, নাম যাহাই নিক।
তুমি কি দেখনি কি রূপ ধরেছে পশ্চিমে গণতন্ত্র রাজে?
মুখেতে সদাই স্ফুরিছে হাস্য, অন্তরে তার চেঙ্গিস রাজে!
তৃতীয় পারিষদ
ভাল; যদি হয় মূলে তাহা সাম্রাজ্যবাদেরি নূতন রূপ,
কিন্তু বল তো জবাব দিবে ওই য়িহুদীর ?–থেকো না চুপ।
জ্যোতিহীন এক মূসা সে যেন গো, ক্রুশহীন যেন ঈসা সে নবী,
রসূল যদিও নহে, তবু তার কেতাবে যে আছে প্রতীতি-ছবি।
কি বলিব সেই অবিশ্বাসীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন সে তীর,–
পূর্বে পশ্চিমে আনিয়াছে আজ কেয়ামত এক চিরস্থির।
মানব-স্বভাবে আর কিবা তুমি গভীর ওলট-পালট চাও?
গোলামেরা মিলি কাটিয়া দিতেছে মনিবের তাঁবু-তন্ত্রী, তাও।

চতুর্থ পারিষদ
জবাব ইহার হতেছে তৈরী রোমক-প্রাসাদে দেখ না কেন?
সীজারের খাব মোরা দেখায়েছি সীজার-বংশ ধরের জেনো।
ওই দেখ কারা রোম-সাগরের উর্মি লইয়া খেলিছে আজি,
কোথাও মেলিছে দেবদারু পাতা, কোথাও বাজনা উঠিছে বাজি।

তৃতীয় পারিষদ

আমি তো তাহার   বাণীর মর্ম কিছুই বন্ধু বুঝিতে নারি,
কেন সে য়ুরোপ-রাজ্যনীতির বক্ষ এমন দিতেছে ফাঁড়ি?

পঞ্চম পারিষদ

(ইব্‌লীসের প্রতি)

হে, তোমার প্রাণ-নিঃশ্বাস-বায়ু জিন্দা রাখিছে বিশ্ব-প্রাণ,
যখনি চেয়েছ, খুলিয়াছ তুমি প্রতি বস্তুর তত্ত্ব-জ্ঞান।
তোমার প্রাণের উষ্ণতা নিয়ে মাটি জলে এল প্রাণের সাড়া.
তব শিক্ষায় জ্ঞান পেয়ে গেল স্বর্গে যে ছিল অবোধ-পারা।
মানব-স্বভাব জান তুমি ভাল তারো চেয়ে যারে স্রষ্টা কয়,
সকল সরল বান্দারা মিলি নিশিদিন গাহে যাহার জয়।
যারা ছিল সদা জপমালা আর শুদ্ধাচারের মন্ত্র নিয়ে,
আত্মবোধের সমুখে তোমার নতমুখী তারা লজ্জা পেয়ে।
যদিও তোমার শিষ্যের দলে আছে যাদুকর য়ুরোপে শত,
বিশ্বাস আমি হারাতে বসেছি তাদের যাদুর উপরে যত।
ওই যে য়িহুদী মজদকী   প্রাণ দিয়েছে যাহাতে নূতন সুর,
মত্ততা তার কাঁপায়ে তুলিছে প্রতিটি মানব-বক্ষপুর।
তুচ্ছ বায়স সম পদ চায় লভিতে দারুণ শ্যেনের সাথে,
কি ত্বরিতে দেখ, বদল হতেছে বিশ্ব-বিধান সেই সে খাতে।
উপেক্ষাভরে যার দিকে মোরা চাইনি কখনো চক্ষু তুলে,
সেই দেখি আজ ছাইছে আকাশ, এক মুঠি ধূলি ছিল যে মূলে।
আগামী দিনের বিপদ ইহার সম্ভাবনার নাহিক শেষ,
দাপটে ইহার কাঁপিতেছে গিরি, কান্তার দরী সকল দেশ।
হে প্রভু মোদের, সে-দুনিয়া আজ বুঝিবা ওলট পালট হয়,
চিরদিন তব পরিচালনার অধীনে যাহার ঘুচিত ভয়।

ইব্‌লীস
আমার হাতের ক্ষমতায় ধৃত গন্ধ-রঙের জগৎ এই,
এ পৃথিবী, এই চন্দ্র-সূর্য, সপ্ত তলার আকাশ এই।
অচিরেই সব দুনিয়ার লোক অবাক দেখিবে তামাশা এক,
ফিরিঙ্গি-প্রাণে বহায়েছি ওই তপ্ত লহুর দরিয়া দেখ।
রাজনীতিকের বুদ্ধি কিংবা গীর্জার যত পুরানোমন,
আমার ডাকেতে পাগল সবাই, চঞ্চল যত জগৎজন।
আমার রচিত এ ঘরকে যারা ভঙ্গুর ভাবে কাঁচের মত
ভেঙে একবার দেখুক না এই সভ্যতা-ভিত শক্ত কত!
প্রকৃতি আপনি জামার বক্ষ দীর্ণ করিয়া রেখেছে যার,
এই মজদকী দর্শন--সূচি পারিবে কি দিতে জোড়াটি তার।
কি ভয় আমারে দেখাইতে পারে ভবঘুরে এই সাম্যবাদী,-
জীবিকা-ব্যাকল অথির-চিত্ত বাস্ত-স্বভাব প্রলয়নাদী?
যদি কারে ডরি দুনিয়াতে আমি তবে তাহা সেই জাতিটি যার,-
ভস্মে আজিও প্রেমের অগ্নি প্রকাশে ক্ষণিক দীপ্তি তার।
কদাপি এমন চোখে পড়ে যায় মুসলিম তাতে ভাবিত হই,
জালেম আজিও ভোরের অশ্রু দিয়া রচিতেছে জীবন-বই।
অজানা জগৎ ফেলিতেছে ছায়া তাহার আঁখির তারকা 'পরম
বলিতেছি তাই, তারই ভয় করি, সাম্যবাদীর নাহিক ডর।

২
জানি এই জাতি কোরান লইয়া করেনাক আর জীবনে রণ,
তারো জীবনের লক্ষ্য হয়েছে সঞ্চয় করা পুঁজির ধন।
জানি, প্রাচ্যের আঁধার রাত্রে কা'বার পূজারী করিয়া সাজ,
দীপ্ত হাতের উজ্জ্বল আলোতে পথ নির্দেশ করে না আজ।
আধুনিক যুগ-তাগিদ তবুও সমস্যা এই তুলেছে ধরে,
মুহম্মদের প্রণালী বুঝি বা প্রকাশ হইয়া আজিকে পড়ে।
সাবধান করি, বেঁচে রও তার নীতির দারুণ আঘাত থেকে,
নারীকে সে করে রক্ষা এবং পৌরুষ আসে যাহারে দেখে।
সকল গোলামি তরে তার বাণী মৃত্যুর যেন রুদ্র ডাক,

রাজা ভিখারীর দেখা পাবেনাক যেথায় এ বাণী ছেড়েছে হাঁক।
সে করে সকল অর্থকে পূত-পবিত্র যত কলুষ হতে,
ধনী যে ধনের রক্ষক শুধু, মালিক নহেকো সে কোনমতে।
কর্মের আর চিন্তার বল, এই চেয়ে বড় কি বিপ্লব–
ভূমির মালিক রাষ্ট্র নহেকো, খোদারি মাত্র দুনিয়া সব।
জগতের কানে চাপা যতদিন থাকে এর বাণী, ততই ভালো,
আশার কথা যে মুসলিম খোদ ভুলেছে জ্বালাতে নিজের আলো।
উত্তম, তারা ধর্ম মাঝেই থাক চিরদিন হইয়া লীন,
ব্যস্ত থাকুক কালামুল্লার ব্যাখ্যা লইয়া রজনীদিন।

৩
তকবীর যার ভাঙিয়াছে কভু দশটি দিকের জাদুর ঘোর,
হোক তাহাদের মোহ-তমিসা-ঘেরা এ রাত্রি কভু না ভোর।
মেরীর তনয় ক্রুশেতে মরেছে, অথবা গিয়াছে গগন-পার?
খোদার গুণ কি সত্তায় আছে, অথবা বাহিরে প্রকাশ তার?
যে মহাপুরুষ আসিবেন তিনি খ্রীষ্ট, ঈসা না অন্য জন?
'মুজাদিদ' তিনি?–রয়েছে যাঁহাতে ঈসার গুণের সকল ধন?
কোরান বচন অমর না তারা যওগের বারতা বহিছে শুধু?–
কেবলা যাহার বিশ্বাসে আছে হাশর দিনের নাজাত-মধু!
–যুক্তি জালের এই বুতেদের এ যুগে তাহারা শরণ নিক,
এমনি সকল প্রশ্নের ধাঁধাঁ প্রতিভা তাদেরে বাছিয়া দিক!
কর্ম-জগৎ হতে আরো দূরে তোমরা এদেরে ভুলিয়ে নাও,
কিস্তি এদের প্রথম চালেই হয় যেন মাৎ দেখিয়ো তাও।
ভাল আমাদের, এই মুসলিম থাকে যদি দাস চিরটি কাল,
নশ্বর ধরা ফরকে দিয়া গোলামিরে যদি জানে সে ভাল।
এমনি কবিতা মরমী তত্ত্ব শোভন তাদের, জানিয়া লও,–
জীবনকে যাহা রাখে সুগোপন, সে-গীতি তাদের শ্রবণে কও।
সাবধান থেকে খুব সাবধান, এ জাতি যেন না জাগর হয়,–
ধর্ম যাহার নিতি নিতি এই ধরার সকল হিসাব লয়।
মত্ত করিয়া রাখ ইহাদের উপাসনা আর জপের মাঝে,
'খানকা-মেজাজ' দৃঢ়তর কর, উদাসীন রাখ সকল কাজে।

সহগামীদের খেদমতে

গোলাম সামদানী কোরায়শী

এসো, আবার সবাই মিলে
কাজ করি এই জাতির তরে,
এই জীবনের জুয়ার বাজি
ধরি আবার সাহস করে।
লও শহরের মসজিদেতে
এমন করে কাঁদবো সবাই,
মুল্লাদের ওই পাষাণ হৃদয়
বিগলে যেনো অশ্রু ঝরে।

এক

বে–পরওয়া যে বাজের রাজা,
সেই তো ঘুরে সকল আকাশ,
কাঁপায় সকল মীনার চূড়া
ঝড় যেনো ওর পাখার বাতাস।
দূর নীলিমার উদার বুকে,
শিকার করে মনের সুখে,
আগলে সেতো রয় না শুধু
বনের শাখায় নিজের আবাস।

ছড়ায় আমার প্রাণের বীণা
'আল্লাহু'র ঐ সুরের রতন,
যেমন ধরার ওড়না আকাশ
ঝরায় ধূলি আলোর মতন।
গ্রহণ করো মোর সে বীণা,
তার ভরে যার করুণ সুরে,
হৃদয়জ্বালায় আমার চোখে
ঘনায় যবে আঁসুর পতন।

আঁসুর মতোই ধরার বুকে
গলছি আমি দারুণ জ্বালায় ;
গলছি বলেই বাইরে এসে
ঠাঁই নিলাম ওর চোখের কোণায়।
চাও যদিতো দেখতে পাবে
ওর চোখেতে আমার স্বরূপ,
কারণ আমি শিশির সম
ঝরিনি ওর ঘাসের পাতায়।

তোমাদের এই যুক্তি ন্যায়ের
অনেকখানি নিসটে কাঁচা ;
ওর থেকে যা প্রমাণ হবে,
অনেকটা তার নয় যে সাঁচা।
হয়তো জামীর, নয়তো রোমীর
দু' একটি পদ দেয় খুলে মোর,
সম্মুখে সব দ্বারের আগল,
সফল করে আমার বাঁচা।

এসো, আমার কাছ থেকে নাও
সেই পুরানো শরাব যারে,
ঢাললে মাটির পান–পিয়ালা
প্রাণের দাহে ভরতে পারে।
যদি আমার সোরাই থেকে
দাও পানি এই ফুল বাগিচায়,
লালার শাখা পড়বে নুয়ে
মানুষরূপী ফলের ভারে।

অনেক দিনের এমনি সে এক
পুরান বীণা আমার হাতে,
গুমরে ফিরে রং বেরঙের
করুণ সুরের কান্না যাতে।

কিন্তু যখন বাজাই ওরে,
বাজাই সিংহ নখর দিয়ে,
কারণ, কঠিন পাষাণ শিরা,
তারগুলি ওর তৈরী তাতে।

এই জামানার পারভেজ, এদের
দাও জানিয়ে আমার বচন,
ফরহাদ আমি নই বলে তো
কুড়োল হাতে নিই নি কখন!
কারণ আমার হৃদয় মূলে
বিঁধলো এসে যে বিষকাঁটা,
ওই তো পারে একশ' পাহাড়
করতে গুঁড়ো ধূলির মতন।

ফকির আমি আমার যে ধন,
তা এই চোখের এক চাহনি,
বন্ধুদের ওই সোনার পাহাড়
ঘাসের পাতার মতোই গণি।
আমার কথা নাও মেনে তো
কবরখানার কাকই ভালো,
তেমন কোনো বাজ থেকে, যার
গলায় বাদ্‌শা পরায় মণি।

সদাই আমার দিলের দুয়ার
সামনে সবার রাখছি খুলে,
আপনজন আর বন্ধুজনার
কারোর কাছে যাইনি ভুলে।
ঘর বেঁধেছি আমার বুকের
দূর নিরালার একটি কোণে,
থাকতে পেলাম শান্তিতে তাই
বিশাল ভব নদীর কূলে।

এই বাগিচায় নেই যে আমার
জাঁকজমকের চিহ্ন কোথাও,
নেই কপালে জরির পোশাক,
শিরের মুকুট, পাই নি যে তাও।
বাগের মালি বলছে তবু
বিগ্‌ড়ে দিলাম বাগানটাকে,
দোষ বুঝিই এই—নার্গিসেরে
কইনু 'তুমি চোখ মেলে চাও'!

হাজার জ্ঞানী এই মফিলে
অনেক কথা বললো, জানি,
ফুল–চামেলীর পাপড়ি থেকেও
নরম কথা বললো, মানি।
কিন্তু আমায় বলতে পারো,
দেখলো কী আর বললো বা কী ;
দেখলো কাঁটা, ফুলের কথা
কেমন করে বললো জ্ঞানী!

জ্ঞান আর গুণের গালভরা সব
ভেদের কথা জানিনে ভাই ;
ভিন্ন সে এক জগৎ থেকে
নতুন কথা বলে বেড়াই।
এই কাফেলার মাঝখানে মোর
কান্না হাসির সুরের টানে,
আদ্দিকালের বুড়োর হাড়ও
চলার বেগে দোদুল নাচাই।

বলছো কেনো আমার গানে
আমিও এক ভোরের পাখী ;
নালিশ আর এই কান্না ছাড়া
আমার বলার আছেই বা কী!

তবু যা পাও আমার কাছে,
তায় ভুলোনা, তাইলে পাবে
এই বাগানের কুঞ্জি, যা মোর
নীড়ের ছায়ায় রাখনু ঢাকি!

আমার চোখে লাগছে বিপুল
এই ধরা এক পথের রেখা ;
হাজার হাজার পথিক চলে
কেউ কারো নয়, সবাই একা।
তাইতো আমি আপন জনের
গোলকধাঁধাঁয় এমনি ডরাই,
কারণ যারে বলছি আপন,
তার চেয়ে পর যায়নি দেখা।

ধরার বুকে সবহারাদের
নতুন করে বাঁচতে শিখাও ;
জীবনপুঁজি কেমন করে
বাড়াবে সে পথ যাঁচতে শিখাও।
আমার গানের সুরের মোহে
বেহুশ হয়ে পড়বে ওরা,
ঝিনুক সম মোতির লাগি
আমার ডেউয়ে নাচতে শিখাও।

বুঝতে পারি এই ধরা মোর
পুরানো সব মণির খনি,
বলবো তবু নিজের নেশায়,
সবার বাড়া দিলের মণি!
যদিও মোর দেহের সীমা
বাড়ছে মাটির স্নেহের রসে,
তবুও তায় আমার ধ্যানের
আকাশ বলে নিইনি গণি।

জানতে পাবে সব কিছু ঠিক,
চিনবে যবে মানুষ-রতন,
ওর পরশে আঁধার দেহে
হৃদয় জ্বলে দীপের মতন।
নালিশ আর এই কান্না থেকে
নিজকে দূরে আগলে রাখে,
ওর মতো ওর ব্যথাও লুকায়
নিজকে করে অনেক যতন।

চোখ মেলে চাও, দেহের মাঝে
প্রাণের অরূপ রতন দেখো ;
শিকড়হীন এই শাখার পরে
জুঁই ফুটানোর যতন দেখো।
নয়তো কোন ধনুর ছিলায়
তীরের মতো বসতে পেয়ে,
তীরান্দাজের চোখে তোমার
কোন্ নিশানায় পতন দেখো।
বুদ্ধি যদি নেয় সরিয়ে
ঈমান থেকে নিজকে দূরে,
তাইলে সেতো জ্ঞানজুয়াড়ী,
গুণাগুণী ভুবন জুড়ে।
দুইশ' রাজী ও গাজ্জালী
করতে কিছুই পারবে না যে
সেই নাদানের চোখ দুটি যার
নিত্ কুকাজের রাস্তা টুঁড়ে।

দামী পোশাক চাকতি রূপার,
লাল আর মোতি কেমন সে ধন ;
দেখছো সোনার তক্‌মা আটা
খুশ চেহারার গোলাম কেমন।
খোদাই যদি দুই জাহানের,

ধনের গরব চায় না তবে
বুদ্ধিমানের কোন্ সে পুঁজি
খোদার লাগি রাখছে গোপন!

বেহুশ হয়ে মোর থাকাতো
খুদির তরে জাগার পালা ;
তাইতো আমার শরাবখানা
এমনি নিঝুম রয় নিরালা।
শরাব, আমার বগল তলে
হয়তো দেখো রং ঘোলাটে,
কারণ এযে অনেক দিনের
পুরানো সব সোরাই–ঢালা!

খিরকা আর এই পাগড়ি দুটি
হয়তো তোমার কাজের কাজী ;
বুঝতে পারি আমার তরে
প্রিয়া এ সব ছাড়াই রাজী!
কারণ আমার ধন বলে তো
আছে এ এক বাঁশের বাঁশী,
চাইনি আমি তখ্‌তেতাউস,
বেদীর পরেও হইনি গাজী!

দেখনু যবে আয়নাতে মোর
নিজের খাঁটি স্বরূপ খানি ;
বুকের গহীন নির্জনেতে
নিজকে আমি নিলাম টানি।
এই খানের এই আন্ধা নিরাশ
হট্টগোলের অনেক দূরে–
টানৃছি একা আপন মনে
মোর পুরানো ব্যথার ঘানি!

তল্পি বেঁধে চলছি যবে
ত্যাগ করে এই ধরার মাটি,
বলছে সবাই, চললে বুঝি
মোদের মায়ার বাঁধন কাটি'!
কিন্তু কেহো জানলো না তো
যখন ছিলো এই মুসাফির,
বললো কী সে, বললো কারে,
আগলে ছিলো কোন সে ভাঁটি।

দুই

হৃদয় যদি হয় জ্ঞানী আর
চক্ষে থাকে দৃষ্টি উদার,
তাইলে কড়ার ফকির হয়েও
পারবে হতে বাদ্‌শা ধরার।
মূর্খ বেদীন ধনীর দেহে
চাপায় যতো জরির পোশাক,
সবই গাধার রেশমী বোঝা,
ওর তরে তা নয় যে শোভার।

তিন

তোর মতো এই মানুষরূপী
বাদ্‌শাদেরে সেজদা করে,
হায় বেখবর অপমান আর
করিস্‌নে তুই খোদার ঘরে।
ফিরিংগীদের সামনে নিজের
আরজি পেশ আর করিস নে তুই,
এই পুতুল আর রাখিস্‌নে তুই
নিজের দিলের তাকের পরে।

শুনেছিলাম একটি কথা
বলছিলো এক প্রবীণ জ্ঞানী,

অনেক কালের উদারমনা,
অনেক গুণে বিরাট মানী।
কড়ার ফকির হয়েও যদি
রাখতে পারো নিজকে ঢেকে,
তাইলে দেবে দুই ধরারে
পথের দিশা তোমার বাণী!

এই জগতের ভেদের কথা
লুকানো এই দুই হরফে,
'মিম্বরেতে হয় না তো প্রেম
প্রেম জমে ঠিক নিজ তরফে'।
নমরূদেরা যতোই শাসায়
ইব্রাহিমের ভয় কি তাতে,
লাকড়ি যদি হয় কাঁচা তো
আগুন জমে যায় বরফে!

নিজের ব্যথা পর কি বোঝে,
বৃথাই তুমি খুঁজছো লালা,
আমার মতো নিজেই তুমি
নাও নিজেরে দেখার পালা।
আসবে যতোই বায়ুর লহর
খুলবে তোমার বুকের দুয়ার,
আগলে রেখো তোমার বুকের
সেই পুরানো হৃদয়জ্বালা।

স্মরণ আছে বলছিলো এক
প্রবীণজ্ঞানী এই দু'কথা,
বাঁচতে হলে নিজের প্রাণে
আঁকড়ে ধরো, নয় অন্যথা।
প্রাণ দিলো যে পরকে বাঁধা,
বইছে শুধু দেহের বোঝা ;

দেখতে পেলে তেমন লোকে
থেকো না এক পলক তথা।

বলছে মাতাল ঢেউয়ের সারি
উছলে পড়ে সাগর বেলায়,
ফের যদি পাই ফেরআউনে
মাততে পারি মরণ খেলায়।
তাই কখনো সাপের মতো
নিজকে প্যাচাই নিজের দেহে,
নাচতে গিয়ে দেখছি কভু
আসলো কি কেউ আমার মেলায়।

তোমার এ জাঁকজমক যদি
ফিরিংগীদের কৃপার ফলে
তাইলে ওদের দোরেই সদা
কপাল ঠোকো নয়ন জলে।
পুচ্ছটিও দাও ওদেরে
কারণ গাধার সবটুকু যে
সেই মালিকের যে ওর পিঠে
চাপায় বোঝা ; কথায় বলে।

ফিরিংগীদের বাদশাপনায়
নেই যে কোথাও দিলের নিশান,
ধন যা ওদের বাদশাহিতেই
দীনের বেলায় নিসটে নাদান।
খোদার কসম দেখছে সবাই
ওদের ঘরের চারদিকেতে
নেচে বেড়ায় শয়তানেরা।
জিব্রাইলের নেই সেথা স্থান!

চার

সে তুমি আর আমি সবাই
দীন আর দিলের কথায় নিরাশ ;
ছিন্ন বাসি ফুলের মতো
একটুকু আর নেই যে সুবাস।
দিল মরেছে তাইতো মোদের
দীনের মরণ ঘটলো শেষে,
এক মরণের বদলা এলো
দুই মরণের এ সর্বনাশ।

মুসলমান যে বুঝতে পারে
দীনের আসল তত্ত্বকথা,
আল্লা ছাড়া যতো দোর,
ঘষড়ে না তার কপাল তথা।
আকাশ যদি থমকে থাকে,
ওর কাজেতে দেয় না সাড়া ;
জমিন কে সে নিজের কাজে
ঘুরায় আকাশ ঘুরছে যথা।

বে–পরওয়া দিল রয় না কভু
এই দুনিয়ার ধূলায় ঢাকা,
রাত্রিদিন ওর হয়না তেমন,
আকাশ যেমন ঘুরায় চাকা।
নিজেই তুমি নাও জেনে ঠিক
কখন তোমায় উঠতে হবে,
মাতলামিতে যাদের নামাজ,
যাদের কভু হয় না ডাকা।

নিজের খাঁটি ঈমান ছাড়া
নেই যে কোথাও আশার ভাঁটি ;
আর সে ঈমান জিব্রাইলের

নিকট থেকেই পাচ্ছো খাঁটি।
তাই তো বলি নিজের বুকে
ঈমান যদি পোক্ত থাকে,
বাড়াও কদম, সামনে তোমার
থাকবে না কেউ আগলে ঘাঁটি।

সত্যিকারের মুসলমানেই
জানতে পারে, বুঝতে পারে ;
বুঝতে পারে তার লাগিতো
গড়লে খোদা এই ধরারে।
খোদার স্বরূপ ভাবতে গিয়ে
কল্পনা তার হারায় যে খেই,
তাই সে বলে, 'বুঝতে গিয়ে
খোদায় আমার বুদ্ধি হারে'।

ফিরিংগী সব প্রিয়ার হাতে
এমনি দিলে নিজকে তুলে,
হায়রে ভীরু, বাহুর ফাঁসে
মরলে ওদের গলায় ঝুলে।
বুদ্ধিযে তোর দিলকে এড়ায়,
নাই বুকেতে একটু জ্বালা,
বাপদাদাদের মদের হাড়ির
এক চুমুকও খাস্‌নি ভুলে!

সবাই কি আর নিজকে গড়ে
ভাঙ্গে আবার নিজের হাতে,
সবাই কি আর হাসতে থাকে
ব্যথায় আসে কান্না যাতে!
লা-ইলাহার খিরকা সে তো

দিলের খুনে টুকটুকে লাল,
তাইতো এটি মানায় না ঠিক
এমনি বেকুফ ভীরুর গা'তে!
মোমেন নিজের প্রাণের জ্বালায়
জ্বলতে থাকে শিখার মতো,
তাইতো পারে খুলতে দেদার ;
বদ্ধ দিলের দুয়ার যতো।
ওর চলনে খোদার মহান
জাঁকজমকের চিহ্ন বহে,
ওর বিনয়ে তেমনি দেখায়
বান্দা হওয়ার যোগ্য কতো!

জিগাও কেনো আশেকদের এই
মাতালপনার নামাজ কি তা,
ওদের, 'রুকু', যেমনি, তেমন
'সেজদা' ওদের প্রাণের মিতা।
একটি বারের 'আল্লা' রবে
উঠছে জ্বলে যেমন জ্বালা,
তেমন জ্বালা পাঞ্জেগানার
নামাজগুলায় খোঁজাই বৃথা!

ওদের 'কেরাত' দেয় যে দোলা
দুই ধরাতে সবার প্রাণে ;
ওদের 'রাকাত' এই ধরাতে
দানছে জীবন মুসলমানে।
হৃদয়হীন এই যুগের শিকার
নাদান সবে জানবে কিসে,
ওদের 'একামতে'র ডাকে
এই ধরাতে প্রলয় আনে!

পাঁচ

ফিরিংগীরা ভালোই জানে
ভাত কাপড়ের উপায় করা,
এরই টানে সবাই ওদের
শিকারজালে পড়লো ধরা।
এমন করে শয়তানেরে
যোগায় রুজি, তাইনা দেখে,
খোদ্ খোদা তাঁর আসর পরে
রইলো হয়ে জ্যান্তর মরা।

রুবাই

([illegible])

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

১

তোমার সাগরে কেন গো তুফান নাই ?
কেন খুদী তব নহে গো মুসলমাঁ-ই ?
বৃথাই নালিশ আল্লার ভাগ্যের,
খোদা-তক্‌দীর নহ কেন আপনাই ?

২

তোমার পাত্রে সুরা আর নাই বাকি,
বল বল তুমি নহ কি গো মোর সাকী ?
পিপাসিত যদি সাগরে শিশির পায়
দয়া নয়, বল, কৃপণতা তাহা নাকি ?

আদি তুমি-অন্ত তুমি

আহ্‌সান হাবীব

সন্দেহ দ্বন্দ্বের মাঝে মুহ্যমান হে অলস,
হে কর্মবিমুখ!
বিভ্রান্ত আত্মাকে করো জাগ্রত এবং বাঁধো বুক
নতুন বিশ্বাসে
জেনো অন্তহীন সত্তা সেই আল্লার শক্তির
তুমিই বাহন, তুমিই ভাষা তার, বাণী তার আর
তুমিই প্রতীক মূর্ত আল্লার অনন্ত মহিমার।
তুমি সেই মুসলিম, তোমার মঞ্জিল
অনেক দূরে নীল
আকাশের ওপারে। ছাড়িয়ে সমুদ্র–মেখলা
মুক্ত আরণ্য নিখিল
তুমি সে কাফেলা যার চলার উদ্দাম বেগে
উত্থিত ধূলির
লক্ষ কণা আকাশের তারা হলো
সময়ের তীর
হেনে যাবে এ পৃথিবী—পৃথিবী নশ্বর
অশেষ সম্পদ তার লুপ্ত হবে, কালের মর্মর
তোমাতে জাগ্রত রবে, আদি তুমি অন্ত তুমি আর
সৃষ্টির বিধৃতি তুমি, শেষ বাণী তুমিই আল্লার।
তোমারই হৃদয়–রক্ত উৎসারিত মেহেদী রঙিন
বিকশিত পুষ্প বাগে।
এ পৃথিবী এই রাত্রি–দিন
কারু–শিল্পী তুমি এর, তুমি ইব্রাহিমের সন্তান
সমগ্র সৃষ্টিতে তাই উদ্ভাসিত তব শিল্পী প্রাণ।
জীবন–যৌবন এই পৃথিবীতে যা চেয়েছ,
যা পেয়েছ—তার
সবটুকু সংগ্রহের গুরুভার নিয়েছিলো

প্রতিভা তোমার—
তোমারই প্রতিভা তাকে এখনো লালন করে;
যা আছে অজানা
তারো গুপ্ত দ্বার–দেশে একদিন
তোমার শক্তিই দেবে হানা।
মাটির পৃথিবী থেকে অনন্তলোকের দ্বারে নবী
যে উপঢৌকন নিয়ে পৌছেছেন,
সে তুমি— তোমারই এই ছবি।
অতএব সত্য ন্যায় বীরত্বের অনুশীলনের
প্রতিজ্ঞায়
নতুন দিনের
দিগন্তে আবার এসো
পৃথিবীর নেতৃত্বের ভার
দেয়া হবে তোমাকে আবার।

[বাঙ্গে দারা]

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
LIBRARY,
Acc. No. 21,215
LAHORE.

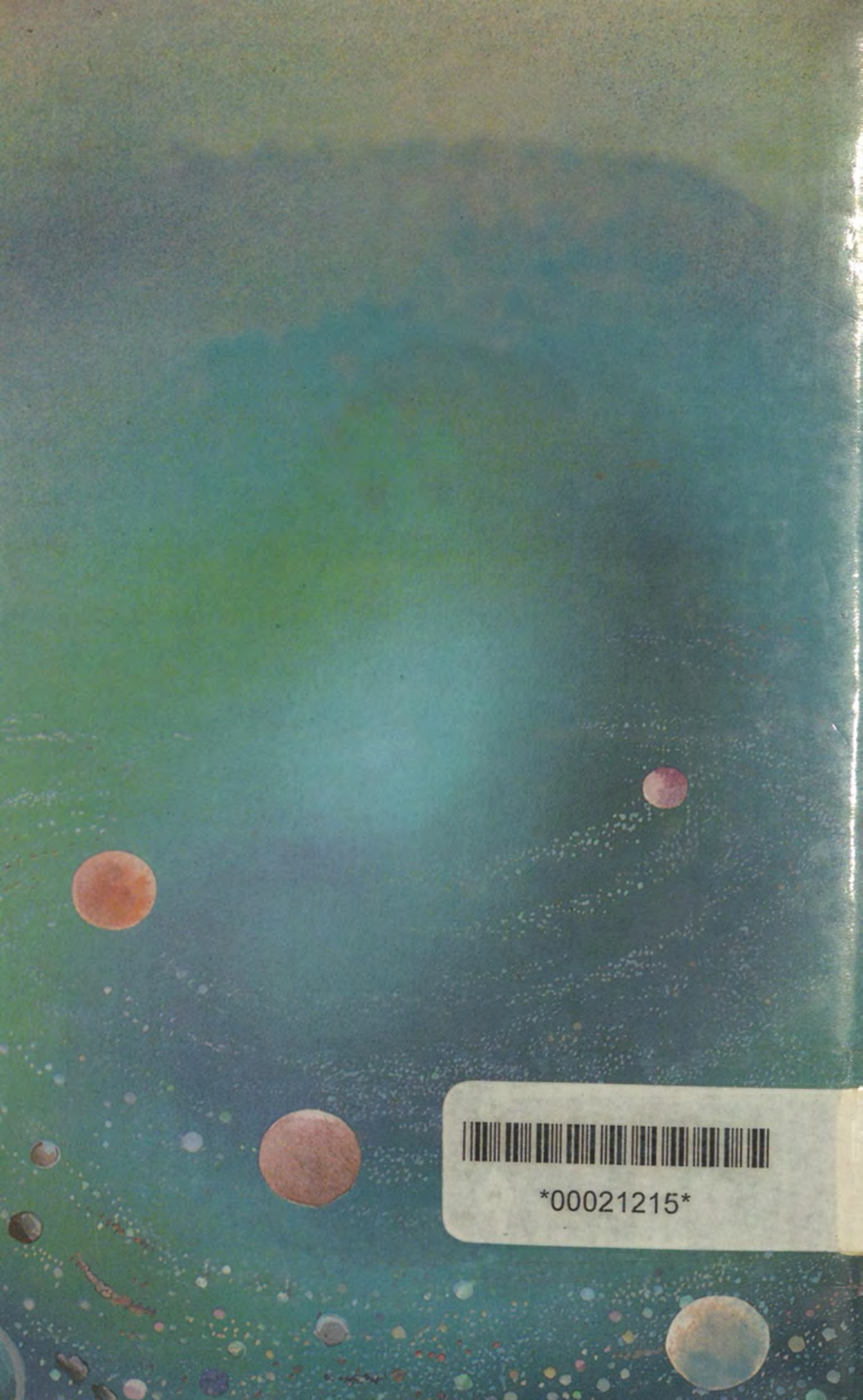

00021215